রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়

শচীন সেন

এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি

তৃতীয় সংস্করণ

পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত

রীডার্স কর্ণার

৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

তৃতীয় সংস্করণ—২৫শে বৈশাখ, ১৩৬২

দাম সাত টাকা

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বোধি প্রেস ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

পিতা ও মাতার পুণ্য-স্মৃতির

উদ্দেশ্যে—

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়েষু

আমার বিষয় রচনা সম্বন্ধে আলোচনা পড়তে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হই। অথচ যখন দেখি কোনো সাহিত্যরসজ্ঞ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আমার কাব্যের মর্ম ভেদ করেছেন তখন কেবল যে আনন্দ পাই তা নয় নিজের পরিচয়েরও সুযোগ পাই। কবি আপনার যে শক্তি প্রকাশ করে সে তার নিজের কাছে সম্পূর্ণ অগোচর নয় — কিন্তু সেই সঙ্গে সে যে আপনার মর্ম উদ্ঘাটন করে, সেটা অনেক সময়ে সচেতনভাবে করে না বলেই সে তার নিজের চোখের সামনে থাকে না — এই জিনিসটাই অলঙ্কারশাস্ত্র যাকে বলে সহৃদয়হৃদয়বেদ্য। কবির কাব্যের মধ্যে তুমি কবিকে দেখেছ, তোমার সেই দেখার ভিতর দিয়ে কবির যে স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে সে আমার কাছে আমার প্রতিরূপ হয়ে দেখা দিল, যেন দেখি অন্য কবিকে। তোমার এই গ্রন্থে কবিকে বহু যত্নে ও সম্মানে বিচিত্র করে দেখেছ সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্যের বিশিষ্টতা তোমার মনে প্রতিফলিত হয়েছে সে আমার কাছে ঔৎসুক্য জনক। তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ১৮।১০।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

"রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়" কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে ভাল লাগিয়াছিল, এই তথ্য লেখক এবং গ্রন্থের সবচেয়ে বড় পরিচয়। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া কবিগুরু লেখকের নিকট যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা এই সংস্করণের ভূমিকারূপে ছাপা হইল। রবীন্দ্রনাথের পত্রে যে স্বীকৃতি আছে, তাহা গ্রন্থের পরম বিত্ত। অযাচিতভাবে তিনি যেই আশীর্বাদ ও প্রশস্তি জানাইয়াছিলেন, তাহা শুধু এই কথাই প্রমাণ করে যে, এই গ্রন্থের আলোচনার ভঙ্গি ও ইশারা তাঁহার কাছে যথার্থ ও সার্থক বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, এই গর্ব বহন করিয়া গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য "রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-প্রবাহ" পরিচ্ছেদটি নূতন করিয়া লেখা হইয়াছিল।

নানা কাজের চাপে তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশের চেষ্টা করিতে পারি নাই। অথচ রবীন্দ্রনাথ-প্রশংসিত রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনা গ্রন্থখানি সহজলভ্য হইবে না, এই ক্ষোভও মনকে খোঁচা দিতেছিল। সাহিত্য আলোচনায় আমি দৃষ্টিভঙ্গিকে দাম দেই বেশী। ভঙ্গিহীন আলোচনা এবং প্রাণহীন ব্যাখ্যানের সাহায্যে গ্রন্থের আয়তনকে দীর্ঘতর করিবার দিকে ঝোঁক দেই নাই। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয় দিবার লোভে আলোচনাকে ভারাক্রান্ত করিবার কৌশল প্রয়োগ করি নাই। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া পাঠক-পাঠিকাকে বিভ্রান্ত করিয়া দিবার চেষ্টা বর্জন করিয়াছি। কিন্তু গ্রন্থখানির অসম্পূর্ণতা আমাকে আঘাত দিত। কারণ, নাটকের মধ্যে শুধু "ডাকঘর" ও "ফাল্গুনী"র আলোচনা প্রথম সংস্করণে ছিল। রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্য একটি অমূল্য সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের বহু ভাব ও ভাবনা এই নাট্যসাহিত্যের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। তাহার অনুসন্ধান না দিলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই, এই তৃতীয় সংস্করণে নাটক পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমগ্র বিয়োগান্ত ও সাংকেতিক নাটকের আলোচনা দেওয়া হইল। "সাহিত্য-জিজ্ঞাসা" নামে আর একটি নূতন অংশে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসম্বন্ধীয় চিন্তন ও দর্শনের আলোচনা সন্নিবেশিত হইল। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-দর্শন বুঝিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে

সঠিক মতের যথার্থ আলোচনার প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে হইলে যে-দিকটার সঙ্গে পরিচিতি হওয়া দরকার, এই পরিচ্ছেদে সেই ভাবনার বিশদ আলোচনা আছে। আশা করি, এই তৃতীয় সংস্করণের নূতন সংযোজনা রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্মোদ্ঘাটনে পূর্ণতরভাবে সাহায্য করিবে।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমনে নানা বর্ণ ও নানা রূপ আছে। এবং সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আছে। আমি গ্রন্থে সেই ঐকতানের অনুসন্ধান দিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই তৃতীয় সংস্করণ রসিক সমাজে দাগ কাটিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের জোরে বন্ধুবর শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলাম। বন্ধুবর স্বেচ্ছায় সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুসাহিত্যিক প্রিয়বন্ধু শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল প্রুফ দেখিবার হাঙ্গামা হাসিমুখে বরণ করিয়াছিলেন। এবং বন্ধুবরের সৌজন্যেই শিল্পী শ্রীশৈল চক্রবর্তী ও শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের চিত্র দুইটী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই বন্ধুদ্বয়ের চেষ্টায় তৃতীয় সংস্করণ আত্ম-প্রকাশ করিল।

নববর্ষ ১৩৬২
ইণ্ডিয়ান নেশন,
পাটনা

শচীন সেন

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা এবং তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া বাঙালী পাঠক-পাঠিকার কাছে উপস্থাপন করিবার জন্য কোন কৈফিয়ত দিবার প্রয়োজন আছে, তাহা আমি মনে করি না। রবীন্দ্র-সাহিত্য আমাদের বিশেষ সম্পদ—তার অপূর্বতায় আমরা বিমোহিত, তার ঐশ্বর্যে আমরা গর্বিত। রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার কতকগুলি মূলসূত্র আছে. তাঁহার দৃষ্টির বিশেষ ভঙ্গি আছে এবং সুরের বিশিষ্ট ঢং আছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের নিগূঢ় মধুকোষের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সেই পথের সন্ধান জানা আবশ্যক। এই গ্রন্থ সেই সন্ধানই দিতে চাহিয়াছে। এখানে বিশ্লেষণ ও আলোচনার সাহায্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্মোদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টা আছে—কোন তুলনামূলক বিচারের ভান নাই। একখণ্ড গ্রন্থের সীমাবদ্ধ পরিধির ভিতর রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যের আলোচনা সম্ভব নহে—তাই সে-চেষ্টা আমি করি নাই। নিন্দুকের মুখর ভাষণ স্তব্ধ হইবে না, আমি জানি; কিন্তু রসিক সমাজে এই গ্রন্থ সমাদর লাভ করিলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

এই গ্রন্থ-রচনার ইতিহাস একান্ত ব্যক্তিগত। আমার স্ত্রী শ্রীমতী স্মৃতি সেন, এম্. এ, আমাকে এই কার্যে ব্রতী করিয়াছেন। তাঁহারই অনুরোধে এবং তাগাদায় এই গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত। তিনি স্বেচ্ছায় এই পুস্তকের প্রুফ দেখিবার ভার গ্রহণ না করিলে মুদ্রণ-কার্য এত শীঘ্র সম্পন্ন হইত না। ইহার মালমসলা সংগ্রহ করিতেও তিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। আর যাঁহারা এই বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রিয়বন্ধু শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপঙ্কজ দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রন্থে আমি নূতন বানান-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছি—অনবধানবশতঃ স্থানে স্থানে পুরাতন বজায় রহিয়া গিয়াছে।

আশ্বিন, ১৩৪৬
বালিগঞ্জ, কলিকাতা

শচীন সেন

সূচীপত্র

"মানুষ সামনের দিকে যেমন অগ্রসরণ করে তেমনি অনুসরণ করে পিছনের, নইলে তার চলাই হয় না। পিছনহারা সাহিত্য বলে যদি কিছু থাকে সে কবন্ধ, সে অস্বাভাবিক।"

—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-প্রবাহ

রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বুঝিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-প্রবাহের উৎপত্তি, গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা থাকা আবশ্যক। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ১৮৬১ সনে, অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের পরে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বিদেশী-শাসনের নানাবিধ ত্রুটি থাকিলেও শাসক ও শাসিতের ভিতর পারস্পরিক বিরুদ্ধতা ক্ষীণতর হইতেছিল। ওহাবি আন্দোলনের সাহায্যে মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাইয়াছিল। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় পশ্চিমের নূতন সভ্যতার সংস্পর্শে বিমুগ্ধ হইয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহ সেই বিমূঢ়তাকে আঘাত করিল—কারণ সিপাহী বিদ্রোহ দমন করিবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ যে-সব অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজা-প্রজার সম্বন্ধ বিকৃত হইয়া গেল। শাসকের সঙ্গে যে আমাদের জাতিগত পার্থক্য ও বর্ণগত বৈষম্য আছে, তাহা উৎকটভাবে দেখা দিল। মোট কথা, রাজা-প্রজার সহজ সম্বন্ধ ব্যাহত হইল। এমন সময় রবীন্দ্রনাথের জন্ম, এবং তিনি যখন সাহিত্যের আসরে পদার্পণ করিলেন, তখন রাজনৈতিক আন্দোলন, ধর্মসংস্কার আন্দোলন এবং সাহিত্য-আন্দোলন বাঙালীকে নূতন আবিষ্কারের পথে বাহির করিয়াছে। এই নবজাগরণের মাদকতা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে মাতাল করিয়াছিল। ভারতীয় সাধনার ও পশ্চিমের ভাবনার সমন্বয় সাধনের প্রধান হোতা রাজা রামমোহন রায়ের অধিনায়কত্ব রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি নিজে এই সমন্বয়-সাধনের উপাসক। রবীন্দ্রনাথের মনন-ধারার মূলসূত্রগুলি সংক্ষেপে পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য দেওয়া হইল :

(ক) "মানুষের সেই প্রকাশই শ্রেষ্ঠ যা একান্ত ব্যক্তিগত মনের নয়, যাকে সকল কালের সকল মানুষের মন স্বীকার করতে পারে। মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ হয়ে উঠেছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎমানুষের সাধনা। এই বৃহৎমানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।.....মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই।"

(খ) "মানবধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি প্রকৃতির প্রয়োজন সে পেরিয়ে, সে আসছে অতিরিক্ততা থেকে। জীবজগতে মানুষ বাড়তির ভাগ। প্রকৃতির

বেড়ার মধ্যে তাকে কুলোলনা।......মানুষের সাধনাও এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা। ব্যক্তিগত সংস্কার ছাড়িয়ে যাবে তার জিজ্ঞাসা, তবেই বিশ্বগত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে তার বিজ্ঞান। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জড়প্রথাগত অভ্যাস কাটিয়ে যাবে তার প্রয়াস, তবেই বিশ্বগত কর্মের দ্বারা সে হবে বিশ্বকর্মা। অহংকারকে ভোগাশক্তিকে উত্তীর্ণ হবে তার প্রেম, তবেই বিশ্বগত আত্মীয়তায় মানুষ হবে মহাত্মা। মানুষের একটা স্বভাবে আবরণ, অন্য স্বভাবে মুক্তি।" নিখিলের সঙ্গে সচেতন সচেষ্ট যোগসাধনের দ্বারাই মানুষ আপনাকে সত্য করিয়া জানিতে থাকে।

(গ) "মানুষের দুইটি জগৎ আছে—একটি অহং, আর একটি আত্মা। মানুষের আলো জ্বালায় তার আত্মা, তখন ছোট হয়ে যায় তার সঞ্চয়ের অহংকার। জ্ঞানে প্রেমে ভাবে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্তি দ্বারাই সার্থক হয় সেই আত্মা। সেই যোগের বাধাতেই তার অপকর্ষ। জ্ঞানের যোগে বিকার ঘটায় মোহ, ভাবের যোগে অহংকার, কর্মের যোগে লোভ স্বার্থপরতা।" তাই "আমাদের প্রার্থনা হবে, য একঃ, যিনি এক, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, শুভবুদ্ধিদ্বারা তিনি আমাদের সকলকে এক করে দিন।" বাহিরের যোগে তার সমৃদ্ধি, ভিতরের যোগে তার সার্থকতা। "একলা আমির কর্মই বন্ধন, সকল আমির কর্ম মুক্তি।"

(ঘ) "জন্তুরা পেয়েছে বাসা, মানুষ পেয়েছে পথ। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরা পথনির্মাতা, পথপ্রদর্শক।......মানুষ অশ্রান্ত যাত্রা করেছে অন্নবস্ত্রের জন্যে নয়, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে, আপনার জটিল বাধার থেকে আপনার অন্তরতম সত্যকে উদ্ধার করবার জন্য। মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে, এই যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—

"মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা
মৃত্যুরে না করি' শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রু জলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি', তারি মাঝে যাব অভিসারে
তারি কাছে জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি'।

কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে।
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে,

ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে,
সংকট-আবর্ত-মাঝে দিয়েছে সে সব বিসর্জন।
নির্যাতন সয়েছে সে বক্ষপাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্বপ্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোমহুতাশন।
শুনিয়াছি তারি লাগি'
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর।
তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ।"

(ঙ) রবীন্দ্রনাথ কবি রজ্জবের বাণী বিশ্বাস করেন :

"সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝুঁঠ।
জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ।

সব সত্যের সঙ্গে যা মিলে তাই সত্য, যা মিলে না তা মিথ্যে, রজ্জব বলছে, এই কথাই খাঁটি, এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই কর।"

(চ) "বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়, জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তার পীঠস্থান সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ। ......আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান; আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত ভূমা। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা-না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন।"

(ছ) "যদি বলি মানুষ মুক্তি চায় তবে মিথ্যা কথা বলা হয়। মানুষ মুক্তির চেয়ে ঢের বেশি চায় মানুষের অধীন হতে।......পরম আমির কাছে সমস্ত আমিত্বর অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে একেবারে অনন্ত পরিপূর্ণ অধীনতার

পরমানন্দ।" রবীন্দ্রনাথের মতে, অসত্য হইল এই সংসারকে আমার বলিয়া জানা। এই সংসারকেই মানুষের স্বর্গ করিতে হইবে। আমির মধ্যে কিছু নাই, আমার মধ্যে সবই আছে। তাই মানুষ এত সত্য, সংসার এত যথার্থ।

(জ) "মানুষ একসঙ্গে সমস্তকে দেখবার চেষ্টা করলে সমস্তকেই ঝাপসা দেখে বলেই প্রথমে খণ্ড খণ্ড করে তার পরে সমস্তের মধ্যে সেটা মিলিয়ে দেয়। এইজন্য কেবল খণ্ডকে দেখে সমগ্রকে যদি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তবে তার ভয়ঙ্কর জবাবদিহি আছে; আবার কেবল সমগ্রকে লক্ষ্য করে খণ্ডকে যদি বিলুপ্ত করে দেখে তবে সেই শূন্যতা তার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়। ...... ভারতবর্ষ যে পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে প্রকৃতির দিকে ওজন হারিয়েছে, সেই পরিমাণে তাকে আজ পর্যন্ত জরিমানার টাকা গুণে দিয়ে আসতে হচ্ছে। এমন কি, তার যথাসর্বস্ব বিকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। প্রাকৃতিক দিকে সে নিশ্চিন্তভাবে কানা ছিল—প্রকৃতি তাকে মৃত্যুবাণ মেরেছে।"

(ঝ) অহং আপনার মৃত্যুর দ্বারাই আত্মার অমরত্ব প্রকাশ করে। "যেখানে অহং সেইখানেই কেবল মৃত্যুর হাত পড়ে, আর কোথাওনা। জগৎ কিছুই হারায়না, যা হারাবার সে কেবল অহং হারায়। অতএব আমাদের যা কিছু দেবার সে কাকে দেব? সংসারকেই দেব, অহংকে দেবনা। কারণ, সংসারকে দিলেই সত্যকে দেওয়া হবে, অহংকে দিলেই মৃত্যুকে দেওয়া হবে। সংসারকে যা দেব সংসার তা রাখবে, অহংকে যা দেব অহং তা শত চেষ্টাতেও রাখতে পারবেনা।·· এই দানের দ্বারা আত্মার ঐশ্বর্য প্রকাশ হবে, ত্যাগের দ্বারা নয়; আত্মা নিজে কিছু নিতে চায়না সে দিতে চায়, এতেই তার মহত্ত্ব। সংসার তার দানের ক্ষেত্র, এবং অহং তার দানের সামগ্রী।"

(ঞ) "মানুষের মহত্ত্ব হচ্ছে এইখানে; সে আপনার বিশেষত্বকে বিশ্বের সামগ্রী করে তুলতে পারে—এবং তাতেই তার সকলের চেয়ে বড় আনন্দ। মানুষের আমির সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে মেলবার পথ বড় রকম করে আছে বলেই মানুষের দুঃখ এবং তাতেই মানুষের আনন্দ। মানুষের সঙ্গে পশুর একটা মস্ত প্রভেদ হচ্ছে এই, মানুষ যেমন বিশ্বের কাছ থেকে নানা রকম করে নেয়, তেমনি মানুষ আপনাকে বিশ্বের কাছে নানা রকম করে দেয়। তার সৌন্দর্য-বোধ, তার কল্যাণচেষ্টা কেবলই সৃষ্টি করতে চায়—তা না করতে পারলেই সে পঙ্গু হয়ে খর্ব হয়ে যায়। নিতে গেলেও তার নেবার ক্ষেত্র বিশ্ব, দিতে গেলেও তার দেবার ক্ষেত্র বিশ্ব।"

(ট) "নামের পূজা হইতে দলের পূজা হইতে মানুষকে বাঁচাইতে হইবে।" রবীন্দ্রনাথ মানুষকে সত্য বলিয়া ধরিয়াছেন, এবং তাই সংস্কারের বন্ধন এড়াইয়া মনুষ্যত্বের দীক্ষা প্রচার করিয়াছেন। "যে সত্যের আঘাতে আমরা কারাগারের প্রাচীর ভাঙি, তারই সাহায্যে তাকে নতুন নাম দিয়া পুনরায় প্রাচীর গড়ি এবং সেই নামের পূজা শুরু করিয়া দেই। চারিদিকের জড় সংস্কারের আবরণ হইতে তিনি মুক্তি চাহিয়াছেন।"

(ঠ) মনুষ্যত্বের মূলে একটি প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব আছে—প্রকৃতি এবং আত্মার দ্বন্দ্ব। স্বার্থের দিক এবং পরমার্থের দিক, বন্ধনের দিক এবং মুক্তির দিক, সীমার দিক এবং অনন্তের দিক—এই দুইকে মিলাইয়া চলিতে হইবে। পশুদের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের দুঃখ নাই। "মানুষকে একই সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হয়। সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য আছে যে, তাহারই সামঞ্জস্য সংঘটনের দুরূহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকিতে হয়। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতির ভিতর দিয়া মানুষের উন্নতির ইতিহাস হইতেছে এই সামঞ্জস্যসাধনেরই ইতিহাস। যত কিছু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান শিক্ষা-দীক্ষা-সাহিত্য-শিল্প সমস্তই হইতেছে মানুষের দ্বন্দ্বসমন্বয়-চেষ্টার বিচিত্র ফল। দ্বন্দ্বের মধ্যেই যত দুঃখ, এবং এই দুঃখই হইতেছে উন্নতির মূলে।" তাই মানুষের সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা এই দ্বন্দ্ব-সমাধানের প্রার্থনা—অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

(ড) ধর্মসাধনার দুই দিক—একটা শক্তির দিক, একটা রসের দিক। শক্তির দিক হইল কঠোরতার দিক, সে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখে। রসের দিক হইল আনন্দের দিক—আনন্দ সহজেই নিজেকে দান করে। আনন্দ যখন জাগে তখন সকলকে সে আহ্বান করে। শাক্তধর্ম রবীন্দ্রনাথের মনের উপর দাগ কাটিতে পারে নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন—"শক্তি পূজায় নীচকে উচ্চে তুলিতে পারে, কিন্তু উচ্চ-নীচের ব্যবধান সমানই রাখিয়া দেয়—সক্ষম-অক্ষমের প্রভেদকে সুদৃঢ় করে। বৈষ্ণবধর্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি—সে-বলরূপিণী নহে, প্রেমরূপিণী। তাহাতে ভগবানের সহিত জগতের যে দ্বৈতবিভাগ স্বীকার করে, তাহা প্রেমের বিভাগ, আনন্দের বিভাগ। তিনি বল ও ঐশ্বর্য বিস্তার করিবার জন্য শক্তিপ্রয়োগ করেন নাই, তাঁহার শক্তি সৃষ্টির মধ্যে, তাঁহার আনন্দ নিয়ত মিলনরূপে প্রতিষ্ঠিত। শাক্তধর্মে অনুগ্রহের অনিশ্চিত সম্বন্ধ, বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের নিশ্চিত সম্বন্ধ। শক্তির লীলায় কে দয়া পায়, তাহার ঠিকানা

নাই ; কিন্তু বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের সম্বন্ধ যেখানে সেখানে সকলেরই নিত্য দাবি। শাক্তধর্মে ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে—বৈষ্ণবধর্মে এই ভেদকে নিত্যমিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথের মতে, "বাংলাদেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণবযুগে।" তাই বাউল-সাধনা বাংলার বিশিষ্ট সাধনা।

রবীন্দ্র-সাধনা ও ভাবনা সম্বন্ধে Prof. V. Lesny-র সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য—

"The process of his development is in harmony with the tradition of Indian philosophy : from insight into the beauty of nature he arrived at a feeling of confidence in the destiny of mankind ; from a conviction of the nobility of man's mission in the world he derives a wise philosophy, which culminates in his unhesitatingly positive attitude towards life and in his later conception of the divine nature of mankind. He is not interested in heaven or celestial deities. It is in this world that man's progress towards perfection must take place, and therefore life in this world is the object of his pre-occupations······Tagore's universal humanitarianism is the corner-stone of the collaboration between East and West. If it is true, as Tagore believes that the day which is to bring a fuller exchange between Asia and Europe in art, religion and literature is already dawning, then Rabindranath Tagore may be said to be the bright daystar which announces this new morn."

Dr. Edward Thompson-এর ভাষায়, "He faces both East and West, filial to both, deeply indebted to both. He has been both of his nation, and not of it ; his genius has been born of Indian thought, not of poets and philosophers alone but of the common people, yet it has been fosterd by Western thought and by English literature ; he has been the mightiest of national voices,yet has stood aside from his own folk in more than one angry controversy. His poetry presents the most varied in the history of Indian achievement······It will be seen that Rabindranath saved Bengali poetry, choked in its own tangles and convolutions, and enabled it to flower in sunlight and a sweeter air, beside that highway which is the whole world's way."

মানুষ যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে পাইয়াছে তাহার দেহ ও মন এবং তাহার নিজের পরিবেষ্টন। দেহের ক্ষুধা তাহার মিটাইতে হয়, পরিবেষ্টনের মধ্যে তাহার কর্মপদ্ধতি রচনা করিতে হয় এবং মনের সাহায্যে জগৎটাকে জানিতে হয়। জ্ঞানের সাহায্যে জানা যায় বিষয়কে এবং ভাবে জানা যায় আপনাকে তথা বিশ্বকে। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তাই প্রকৃত জানা হয় আপনার উপলব্ধিতে। এই উপলব্ধির ক্ষেত্র সাহিত্যের ক্ষেত্র। সাহিত্যের মধ্যে আমরা প্রধানত রস-বস্তুকেই সন্ধান করি। এই রস-বিচারে ব্যক্তিগত রুচি ও কলাগত রুচি বদলায়, তবুও রস-বোধের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। তাই সাহিত্য-বিচারে বাস্তব বা অবাস্তব, লোকশিক্ষা বা দেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয়বস্তু প্রধান নয়।

মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে, এবং এই প্রকাশ-তত্ত্ব সাহিত্যের প্রধান উপাদান। সাহিত্যে সুন্দর ও অসুন্দর বড় জিনিস নয়। এই প্রকাশের নিবিড়তা ও ঐশ্বর্য হইল সাহিত্যের মাপকাঠি। তাই সাহিত্য হইল মানুষের ভিতরের একটা তাগিদ। এই প্রকাশ-চেষ্টা দুই জাতের হইতে পারে—তথ্য-প্রধান ও সত্য প্রধান। মানুষ নিজের প্রয়োজনকে মানে, মানুষ প্রয়োজনের অতীত আনন্দকে মানে। রস-সাহিত্য এই বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করে। এই প্রকাশ-চেষ্টায় প্রকাশ-পদ্ধতি অবহেলার বস্তু নয়। আদর্শ, বিষয় ও পদ্ধতি এই ত্রিধারার বিচার সাহিত্য-আলেচনার অপেক্ষা রাখে। দেহের পিপাসা ব্যতীত, প্রয়োজনের তাগিদ ব্যতীত, অন্য পিপাসা ও তাগিদ আছে। সেই কারণেই, রস-সাহিত্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে এত বড় স্থান অধিকার করিয়াছে। যাহারা ভাবের চেয়ে জ্ঞানকে প্রধান স্থান দেন, তাঁহারা রস-সাহিত্যকে গৌণ বলিয়া উপেক্ষা করেন। সাহিত্যের কাজ যখন প্রকাশ, তখন ব্যক্তিগত স্বাদ ও রুচিকে বাদ দেওয়া যায় না। এই স্বাদ ও রুচি কালের তাগিদে পরিবর্তিত হয়। তাই ভাবের সাহায্যে রস-সাহিত্য প্রকাশে যে নিত্যতা ও অনির্বচনীয়তার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, জ্ঞানের সাহায্যে বাস্তব-সাহিত্য প্রকাশে এই চিরকালের অখণ্ড মাপকাঠি দাঁড় করানো সম্ভব নয়। তথ্যবাগীশ সাহিত্য ও সত্যধর্মী সাহিত্য এক নয়, এবং এক দণ্ডে বিচার্য নয়। তথ্যবাগীশ সাহিত্যে ইশারা, কৌশল ও ভঙ্গির প্রয়োজন স্বল্প।

রবীন্দ্রনাথ তথ্যের সংকীর্ণতাকে মুখ্য স্থান দেন নাই, এবং মানুষ যে সত্যের স্রষ্টিকর্তা, তাই তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়; তাঁহার মতে, সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত,

শ্রেণীগত নয়। অবশ্য, সাহিত্যের ব্যক্তি কেবল মানুষ নয়, বিশ্বের যে-কোনো পদার্থই সাহিত্যে সুস্পষ্ট। তাই ব্যক্তি, জীবজন্তু গাছপালা নদী পর্বত সমুদ্র ভালো জিনিস মন্দ জিনিস বস্তুর জিনিস ভাবের জিনিস সমস্তই ব্যক্তি,—নিজের ঐকান্তিকতায় সে যদি ব্যক্ত না হইল, তাহা হইলে সাহিত্যে সে লজ্জিত। সাহিত্য-রচয়িতার কল্পনা-শক্তির ও রচনা-শক্তির গুণ বিচার্য। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"সাহিত্যের বিচার হচ্ছে, সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্য বিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিংবা তাত্ত্বিক বিচার হোতে পারে। সে রকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নাই।"

(সাহিত্য-বিচার, ১৩৩৬)

রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রয়োজনের দাবি প্রবল এবং তা অসংখ্য, কিন্তু তাঁহার মতে, "বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়, তার যে রস সে অহেতুক।" মানুষ নিজে আছে এবং বাইরে জগৎ আছে, এই দু'য়ের মিলন, এবং এই মিলনের উপলব্ধি অনুভূতির সাহায্যে তাহা একাগ্রভাবে প্রকাশ—ইহাই সাহিত্য এবং তাহার তত্ত্ব। "প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে বহু মানুষ, আর সেই সঙ্গেই জড়িত হয়ে আছে সেই এক মানুষ, যে বিশেষ।" তাই সাহিত্যে মানুষের সমগ্রতা প্রকাশ না হইলে তাহাকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলা যাইবে না। তিনি মানেন যে, "জগতের উপর মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপর বিশ্বমনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।" রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন যে, চিরকালের মানুষ বাস্তব নয়, চিরকালের মানুষ ভাবুক; চিরকালের মানুষের মনে যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কাজ করিয়াছে তাহা অভ্রভেদী, স্বর্গাভিমুখী, তাহা অপরাহত পৌরুষের তেজে জ্যোতির্ময়। সাহিত্যে সেই পরিচয়ের ক্ষীণতা যদি কোনো ইতিহাসে দেখা যায়, তাহা হইলে লজ্জা পাইতে হইবে, কেননা সাহিত্যে মানুষ নিজেরই অন্তরতম পরিচয় দেয় নিজের অগোচরে, যেমন পরিচয় দেয় ফুল তার গন্ধে, নক্ষত্র তার আলোকে। এই কারণে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সর্বমানবের এবং সর্বকালের। ভাষা সাহিত্যের বাহন, নিজের উপলব্ধি সাহিত্যের সত্য। ভাষার সংযম, ধ্বনির সংগীত, বাণীর বিন্যাস—এসব বাহন সাহিত্য-রচয়িতার অনুভূতি প্রকাশকে সার্থক করিলে যথার্থ বা সার্থক সাহিত্য রচিত হইবে। সাধারণ সাহিত্য ও সার্থক সাহিত্য এক পংক্তির বস্তু নয়।

কাব্যের মূল কথা রসে, ছন্দে নয়। তাই কাব্যকে দুই কোঠায় ফেলা হইয়াছে —গদ্যকাব্য ও ছন্দোবদ্ধ কাব্য। রবীন্দ্রনাথ এই দুই বিভাগেই গুণী। ছন্দের মধ্যে বেগ আছে, তাই হৃদয়কে নাড়া দেয় সহজে। রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভিতরও একটা সমতা ও মিলের সন্ধান পাওয়া যায়, যদিচ মিলবর্জিত কবিতাও তিনি লিখিয়াছেন। ছন্দের একটা সুবিধা এই যে, ছন্দের স্বতঃই একটা মাধুর্য আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, "বাস্তব জগৎ ও রসের জগতের সমন্বয়সাধনে গদ্য কাজে লাগবে।" তিনি গদ্যকাব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা—পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক, আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে হবে। হার হলেই হার, তা সে ঘোড়ায় চড়েই হোক আর পায়ে হেঁটেই হোক।…গদ্যই হোক, পদ্যই হোক, রস-রচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্য-ছন্দবোধের চর্চা বাঁধা-নিয়মের পথে চলতে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণ-বোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকারশাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না।" গদ্যকাব্য কী—এই প্রশ্নের সহজ উত্তর এড়াইয়া রবীন্দ্রনাথ বলেন: "যা আমাকে রচনাতীতের আস্বাদ দেয় তা গদ্য বা পদ্যরূপেই আসুক তাকে কাব্য বলে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হবনা।"

রবীন্দ্রনাথের মতে, গদ্যের ছন্দ হইল ভাবের ছন্দ। গদ্যকবিতাতেও ধ্বনিচ্ছন্দ বা ধ্বনি-স্পন্দন আছে। অর্থাৎ সুস্পষ্ট ছন্দ না থাকিলেও ছন্দের সংকেত আছে। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে, রবীন্দ্রনাথের ছন্দাভাসযুক্ত গদ্য কবিতাকে "ছন্দোগন্ধি" "পদ্যগন্ধি" কবিতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা সম্বন্ধে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন—"ছন্দাভাসযুক্ত গদ্য-রচনার বৈশিষ্ট্য প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও অজ্ঞাত ছিল না। অংশত ছন্দোগুণযুক্ত গদ্য-রচনাকে শাস্ত্রকার "বৃত্তগন্ধি" নামে অভিহিত করেছেন। অবশ্য সংস্কৃত বৃত্তগন্ধি গদ্য-রচনা এবং আধুনিক ছন্দোগন্ধি গদ্য কবিতার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। বস্তুত আধুনিককালের ছন্দাভাস সমুজ্জ্বল গদ্য-কবিতা তৎকালে অজ্ঞাত ছিল। প্রাচীন গদ্য-কাব্য ছিল মূলত ভাবরসময়, সুসমঞ্জস ভাবে ধ্বনিরূপের আভা-যুক্ত গদ্য-রচনার রীতি তখন ছিল না; তখনকার দিনে তা আশাও করা যায় না।"

কাব্য-সাহিত্যের আধুনিকতা সময়ের বেড়া-জালে আবদ্ধ নয়—তাহার বিশিষ্টতা নূতন মর্জি লইয়া। সাধারণত কবির রচনার ভিতর তাহার দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিচয় পাই। তাই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতার অভিধা পরিবর্তিত হয়। সাধারণত কালের গণ্ডীদ্বারা আমরা কাব্যের আধুনিকতা বিচার করি। সেই কারণেই আমাদের দেশে আধুনিকতার উপাসক সমালোচকবৃন্দ রবীন্দ্র-কাব্যকে "সেকেলে" বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহারা রবীন্দ্র-কাব্যের মর্মকোষে প্রবেশ করেন নাই—শুধু রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার আত্মলীন ভাববিভোরতাকে ঊনবিংশ শতকের রোমাণ্টিক পর্যায়ে ফেলিয়া এবং ঐকান্তিক আদর্শপ্রধান ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময় মনোজগৎকে বস্তুতন্ত্রহীন ভাবিয়া রবীন্দ্র-কাব্যে আধুনিকতার মাল-মশলার অভাব অনুভব করেন। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্য যে চিরকালের আধুনিক—সে কথা আমাদের জানা ও মানা উচিত।

রাজনীতি বা অর্থনীতিক্ষেত্রে আধুনিকতার বিশেষ অর্থ আছে—সেখানে বিরুদ্ধ মতবাদের সংঘর্ষে নবদর্শন উপস্থাপিত হয় এবং তাহা আবার কালক্রমে "সেকেলে" হইয়া যায়। এই পরিবর্তনশীল জগৎ নানা সমন্বয় সাধন করিয়া অগ্রসর হয়—সমাজ বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে নূতন চিন্তাধারা প্রাধান্য লাভ করে এবং নূতন ব্যবস্থা সংস্থাপিত হয়। আবার তাহা পরিবর্তিত হয়। কাব্য সাহিত্য যতখানি আধুনিক বিধি ব্যবস্থার গণ্ডীদ্বারা পিষ্ট এবং কোন বিশিষ্ট চিন্তাধারার পরিপোষক—ততখানি সে কালের দরবারে অমর নয়। এই 'dialectical' ভঙ্গিকে মানিয়া লইলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা কোন বিশেষ ভাবধারা প্রচারণে বা ব্যাখ্যানে আবদ্ধ, বর্তমান সমাজে বা রাষ্ট্রে উক্ত ভাবধারা গৃহীত বা জনপ্রিয় হইলেও, তাঁহাদের সাহিত্যই আধুনিক এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধ চিন্তাবহনকারী সাহিত্য "সেকেলে"—এবংবিধ চিন্তন কাব্য-সাহিত্য-বিচারে অনুকূল নয়। অর্থাৎ কাব্য-সাহিত্যের আধুনিকতা বিচার করিতে হইলে মতের আশ্রয় গ্রহণ করা অসঙ্গত। তাই কে কোন্ মতবাদ প্রচার করিলেন, তাহা বিচার্য নয়—প্রশ্ন হইল, যে-সাহিত্য আধুনিক, তাহার ভিতর গতি আছে কি না। এই গতি যাঁহার থাকে, তিনি নানা বাঁক ফেরেন এবং নানা মর্জির পরিচয় দেন। কাব্য-সাধনের পক্ষে এই গতিই হইল শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এবং যে-সাহিত্যে গতি আছে এবং যে-সাহিত্য কোন বিশিষ্ট নীতি বা ধর্ম প্রচার করিতে চায় না, সে-সাহিত্য চিরকালের আধুনিক। গতি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি নয়—গতি সাহিত্যকে সজীব ও সজাগ রাখে। তার মানে, কাব্য সাহিত্যে আধুনিকতার মাপকাঠি কোনো রাষ্ট্র বা সমাজ-বিধানের আধুনিক-

তম প্রচেষ্টা নয়; যে-সাহিত্য কালকে জয় করিয়া কালের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে, সে-সাহিত্যই হইল প্রকৃত আধুনিক। রবীন্দ্র-কাব্যে আধুনিকতার অভাব অভিযোগ করিবার পূর্বে কাব্য-সাহিত্যে আধুনিকতার প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রয়োজন।

রবীন্দ্র-কাব্যের গতিধর্মের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা হইলে দেখা যায় যে, তিনি কোন বিশিষ্ট রীতি বা নীতি বা সাধনের পরিপোষক হন নাই। উপনিষদের প্রভাব তাঁহার কাব্যে সুস্পষ্ট, কিন্তু তিনি তাঁর কাব্যে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যান করিবার নির্দেশ দেন নাই—তিনি বৈষ্ণব লীলাতত্ত্বের মাধুর্য ও তন্ময়তা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণবিক মহামিলনের জন্য ব্যাকুলতা দেখান নাই। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-সঙ্গীত তত্ত্বজ্ঞানের দিকে ধাবিত হয় নাই—তাহা রূপ-রসের দাবিকে স্বীকার করিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যে তত্ত্বের চেয়ে জীবন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—তাই তাঁহার কাব্য-সাধনা ধর্ম-সাধনার বিরতি দ্বারা ব্যাহত হয় নাই। তিনি যুগ-ধর্মের প্রভাবকে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু পথের প্রভাবকে মানিয়া লইয়াছেন—সমস্ত সাধনাকে এড়াইয়া গতির সাধনাকে গ্রহণ করিয়াছেন।

যেমন প্রবাহমান নদীসমূহ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অদৃষ্ট হয়, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্যপুরুষে প্রবেশ করেন—উপনিষদের এই শিক্ষা এবং বৈষ্ণবের এই মহামিলন রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই। ঔপনিষদ দর্শনের প্রধান কথা হইল—বাক্‌কে জানিতে চেষ্টা করিবে না, বক্তাকে জানিতে চেষ্টা করিবে; গন্ধকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, আঘ্রাতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে; শব্দকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, শ্রোতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে; অন্নরসকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, অন্নরসের বিজ্ঞাতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে; কর্মকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, কর্তাকে জানিতে চেষ্টা করিবে; সুখ-দুঃখকে জানিতে চেষ্টা করিবেনা, সুখ-দুঃখের বিজ্ঞাতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে; আনন্দ, রতি বা প্রজাতিকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, তাহাদের বিজ্ঞাতাকে জানিতে চেষ্টা করিবে; মনকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, মন্তাকে জানিতে চেষ্টা করিবে; গতিকে জানিতে চেষ্টা করিবে না, গন্তাকে জানিতে চেষ্টা করিবে। সমস্ত ধর্ম-সাধনার ইহাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার রূপ আলাদা। তিনি অবসর চাহেন না—গানের পর গান শুনাইতে চাহেন। রবীন্দ্রনাথ শিল্প-সাধক—ধর্ম-সাধক নন। তিনি সুখ-দুঃখকে এড়াইতে চাহেন নাই, রূপ রস-গন্ধকে অস্বীকার করিতে চাহেন নাই, আনন্দ ও রতিকে বরণ করিয়াছেন,

পথ-চলার বিরাম প্রার্থনা করেন নাই, তাঁহার সন্ধানের শেষ কামনা করেন নাই। তাই তাঁহার নিঃশেষে আত্মদান নাই, কেবলই আত্মগ্রহণ আছে।

গতিধর্মে বিশ্বাসী হওয়াতে রবীন্দ্রনাথের মনন-জমিতে নানাবিধ ফসল ফলিয়াছে—কোথাও জমাট বাঁধিয়া নাই। রবীন্দ্রনাথের যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাইয়াছি, তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার চিন্তায় স্রোত থাকার দরুণ কোথাও মলিনতা ও রুদ্ধতা আসে নাই এবং পথ-চলার আনন্দ আছে বলিয়া কোন ঘাটে তাহা বাঁধা পড়ে নাই। রবীন্দ্র-কাব্যের ধর্মবোধে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নাই, কারণ মানবজীবনকে তিনি প্রাধান্য দিয়াছেন এবং বিশ্বমানবতাকে তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

রবীন্দ্র-কাব্যে যে চিন্তার মুক্তধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা সন্ধান করিলে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বিশিষ্টতা ধরা পড়ে। স্রোতের বেগ তাঁর চিন্তাকে নানাঘাটে বহন করিয়া লইয়াছে—যুগমনের খোরাক জুটাইয়াছে এবং মানবজাতির অগ্রসরণকে সাহায্য করিয়াছে।

প্রথম—রবীন্দ্র-কাব্যে বিশ্বানুভূতির সন্ধান না জানিলে তাঁহার কাব্যের প্রকৃত সুর ধরা যাইবে না। ক্ষুদ্রের ভিতর বৃহৎকে পাইবার আকুলতা, অবিচ্ছিন্ন ঘটনার ভিতর অনন্তের সুর অনুভব করা—রবীন্দ্র-কাব্যের বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথ জানেন যে, যে-আমি নিজের ভিতর থাকে, সে মুক্তও নয়, সে তৃপ্তও নয়।

দ্বিতীয়—জীবনের অনন্ত অনাদি প্রবাহ-বোধ তিনি স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে ও মৃত্যুকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন নাই। বৃষ্টি মেঘের অবসান নয়, মেঘের পূর্ণ প্রকাশ। তাই মৃত্যু জীবনের অবসান নয়, জীবনের প্রকৃত পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ জানেন যে, জীবনের পিছনে মরণ, আশার পিছনে ভয়, দিবসের পিছনে রজনী, আলোকের পিছনে ছায়া আছে। কোথাও বিনাশ নাই; যাহা দেখি, তাহা পরিবর্তন মাত্র।

তৃতীয়—রবীন্দ্র-কাব্যের প্রেমসাধনা দেহের দেউড়ি পার হইয়া নর-নারীর অন্তর স্পর্শ করে এবং সেই আন্তর ভেলার সাহায্যে দেহহীন প্রেম এবং মূর্তিহীন মানস-সুন্দরীকে অবলম্বন করিয়া নিত্যকালীন ও বিশ্বজনীন প্রেমের স্রোতে যুক্ত হইয়াছে।

চতুর্থ—রবীন্দ্র-কাব্যে স্বাদেশিকতা সর্বমানবের সর্বকালের ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের কৃপায় আজ বাহুবল নিদারুণ দুর্জয়—তাই দুর্বল অতি ভয়ংকর দুর্বল। দুর্বলের কান্নায় তিনি আতঙ্কিত হইয়াছেন, শক্তির বীভৎসতাকে

তিনি নিন্দা করিয়াছেন, দুর্গতদের মঙ্গল তিনি কামনা করিয়াছেন, স্বার্থোদ্ধত অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, কিন্তু তিনি অন্যায়কে অন্যায় বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, স্বার্থের লোভে মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করিতে সমর্থন করেন নাই এবং দেশের দুর্দশা লইয়া ব্যবসা করিতে ঘৃণা বোধ করিয়াছেন।

উক্ত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে একথা সহজেই বলা যায় যে, রবীন্দ্র-কাব্য অনাধুনিক অপবাদে দুষ্ট হইতে পারে না। যে কাব্য-সাহিত্যের ঘোষণাপত্রে মানব-জীবন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, বিশ্বানুভূতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে, জীবন-মৃত্যুর বিবাহ-বন্ধন প্রখ্যাত হইয়াছে এবং জাগ্রত চিত্তের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সাহিত্য চিরকালের আধুনিক। কাব্য-সাহিত্যের অধুনিকতার প্রমাণ নূতন ছন্দে নয় অথবা ছন্দহীনতায় নয়; নূতন মতবাদে নয় অথবা রাজনৈতিক প্রচারণে নয়। নূতন কাব্য-কৌশল বা নূতন বিষয় নির্বাচন কাব্য-সাহিতের আধুনিকতার একমাত্র মাপকাঠি নয়। কাব্যে যদি কাব্যত্ব থাকে এবং তাহার দৃষ্টিভঙ্গি যদি জাতির ও জগতের গতি বা প্রগতিকে বাধা না দেয়, তাহা হইলেই তাহা আধুনিক কাব্য সাহিত্য। যুগে যুগে সমস্যার রূপ বদলায় এবং সমাধান নূতন পথ অনুসরণ করে এবং কাব্য-সাহিত্যের আধুনিকতার বিচারে সে-সমস্যা উক্ত কাব্যে কতখানি স্থান পাইল এবং সে সমাধান কতখানি সমর্থিত হইল, তাহা বড় কথা নয়। নূতন সমস্যা-সমাধানে আমাদের যে নূতন দৃষ্টি বা মর্জির প্রয়োজন, তাহার পথে যদি কাব্য-সাহিত্য অন্তরায় সৃষ্টি করে, তাহাকে "সেকেলে" বলিয়া বর্জন করিলে অন্যায় হইবে না। রবীন্দ্র-কাব্য মানুষের দৃষ্টিকে সজাগ রাখে এবং চিত্তকে জাগ্রত করে, মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ায় এবং বিশ্বের প্রতি দরদ সৃষ্টি করে। রবীন্দ্র-কাব্যে অতীতের মহৎ স্মৃতি, বর্তমানের দুর্নিবার কামনা ও ভাবনা এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা ঝংকৃত হইয়া ওঠে। 'সৃষ্টি শক্তিমতী কল্পনা ও কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা,' রবীন্দ্র কাব্যকে ধনী করিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্য মনের দৃষ্টি প্রসারিত করে, চিন্তার সংকীর্ণতা দূর করে, মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা জাগায়। রাজনীতিক্ষেত্রে কোন বিশেষ মতবাদকে "সেকেলে" বলিয়া আমরা পরিহাস করিতে পারি, কিন্তু কাব্য-সাহিত্যে মোহমুক্ত দৃষ্টি আধুনিকতার প্রথম লক্ষণ। কারণ, জাতি বা জগতের প্রগতির পথে যত সব বাঁক আছে, তাহাকে অতিক্রম করিতে হইলে এই মোহমুক্ত দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। এই দৃষ্টির সাহায্যেই গতির তালের সঙ্গে পা ফেলিয়া অগ্রসর হওয়া যায়। রাজনৈতিক প্রোগ্রামের বিচারনীতি লইয়া কাব্য-সাহিত্য বিচার অসঙ্গত। রবীন্দ্র-কাব্যে সমাজ-বোধ বা সমাজ-চেতনার অভাব নেই—অভাব আছে শুধু

কোন বিশিষ্ট নীতি, দর্শন বা ব্যবস্থার পরিপোষণ। এবং সেই অভাব আছে বলিয়াই রবীন্দ্র-কাব্য চিরকালের আধুনিক। অর্থাৎ রবীন্দ্র-কাব্যে অমরতার দাবি আছে।

রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীর কবি। তিনি মানুষকে, ধরণীকে ভালবাসিয়াছেন। "অবজ্ঞা করিনি তোমার মাটির দান, আমি যে মাটির কাছে ঋণী—জানায়েছি বারম্বার"—রবীন্দ্রনাথের এই ঘোষণা মিথ্যা নহে। কিন্তু তিনি প্রচার করিয়াছেন যে, "তব প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত যে মানুষ, তারে দিতে হবে চরম সম্মান তব শেষ নমস্কারে।" যাহারা ক্ষুব্ধ, যাহারা লুব্ধ, যাহারা মাংসগন্ধে মুগ্ধ, যাহারা নির্লজ্জ হিংসায় হানাহানি করে, ধরণীর ভালবাসা তাহাদের জন্য নয়। ধরিত্রী ইন্দ্রের ঐশ্বর্য লইয়া জাগিয়া আছে "ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান, দুর্গমের পথিকের আতিথ্য করিতে তব দান বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে।"

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি"—

অবশ্য কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁর স্বরসাধনায় বহু ডাক পৌঁছায় নাই, এবং বহু ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন—

চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল,—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্ম্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিলনা একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার স্বরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।"

কিন্তু সর্বত্রগামী না হইলেও রবীন্দ্রনাথ মানুষকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং মনুষ্যত্বের জয়যাত্রা ঘোষণা করিয়াছেন। দানবতাকে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন—

"শুনি তাই আজি
মানুষ জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে।
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তার হাস্য হেনে যাব, বলে যাব—এ প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।"

এই বিশ্বাসের জোরে রবীন্দ্রনাথ প্রণামের সঙ্গে জানাইয়া গিয়াছেন—

"আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসিনি তোমার সম্মুখে ;
এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে,
তার জন্যে অমরতার দাবি করব না তোমার দ্বারে।
তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো-একটি আসনের
সত্য মূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে—
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে,
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে॥
হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে

" তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।"

রবীন্দ্রনাথ যুগ-কবি ; যুগ-সাহিত্যের নিদর্শন নয় যে, তাঁহার কাব্যে ধর্ম বা দর্শন আছে। প্রধান কথা যে, রবীন্দ্র-কাব্যে মানবের অবিনশ্বর অনুভূতির প্রকাশ আছে। মহৎ কবি ও কাব্যের লক্ষণ সম্বন্ধে T. S. Elliot বলিয়াছেন—"The essential is that each (poem) expresses, in perfect language, some permanent human impulse. What every poet starts from is his own emotions. He is occupied with the struggle which alone constitutes life for poet—to transmute his personal and private agonies into something rich and strange, something universal and impersonal. The great poet, in writing himself, writes his time. (Points of View, P. 38). রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে উক্ত লক্ষণ প্রযোজ্য।

রবীন্দ্র-চিন্তন বা দর্শন বা সাহিত্যে কোন ব্যবহারিক "রাজনীতি" নাই। তিনি কোন বিশেষ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেন নাই—দেশবাসীকে কোন বিশেষ রাজনীতি গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান নাই। তিনি তাঁহার স্বদেশকে ভালবাসিয়াছিলেন, স্বদেশবাসীকে জাগ্রৎ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা ও কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা বিশ্বের প্রীতিরসে ও মানবতার আদর্শে অভিষিক্ত ছিল। তাই তাঁহার রাজনীতিতে রীতি নাই—কিন্তু নীতি আছে, তাঁহার রাজতন্ত্রে যন্ত্র নাই—কিন্তু সেবা আছে। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি রাজনীতি প্রসূত নয়, তাহা মানব-নীতির আদর্শে গঠিত। যাঁহারা নীতিকে রীতির মানদণ্ডে বিচার করেন, তন্ত্রের ভিতর মন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করেন, আত্ম প্রবঞ্চনাকে স্বাদেশিকতার সহজ পথ বলিয়া গ্রহণ করেন, দেশসেবায় প্রেমের পথ বর্জন করেন, জাতীয় আন্দোলনে মানবতাকে অস্বীকার করেন, তাঁহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি বা স্বাদেশিকতা শুধু মূল্যহীন নয়, অর্থহীন বটে। রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁহারা কলরব করেন, রাজনীতির প্রাঙ্গণে যাঁহারা ভীড় করেন, রাজনীতির আন্দোলনকে যাঁহারা গতি দেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাবনাকে যথার্থ মূল্য দিতে পারেন না, কারণ তাঁহারা খণ্ডকে অখণ্ডের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, ক্ষুদ্রকে বৃহতের তালে যুক্ত করেন, বিরোধকে শ্রেষ্ঠ গর্ব বলিয়া অনুভব করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ খণ্ডের ভিতর অখণ্ডকে পাইতে চাহিয়াছেন, ক্ষুদ্রের ভিতর বৃহতের সন্ধান করিয়াছেন এবং বিরোধের ভিতর মিলন কামনা

করিয়াছেন। তাঁহার ভাবধারা দেশের ও সময়ের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া মহাকালের অন্তরে অমরতা দাবি করে। তাঁহার চিন্তনে এই অমরতার ব্যঞ্জনা আছে বলিয়াই অনেক সময় প্রতিবেশ ও প্রতিবেশীর ক্ষুদ্র দাবি ও মলিন কামনা অস্বীকৃত হইয়াছে এবং সেই অস্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভিযোগ বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই অভিযোগের ঔদ্ধত্যে অমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু যে প্রবাহিণী সাগরের ডাক শুনিয়া মাতিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে অভিযোগের বেড়া-জালে আবদ্ধ রাখা যায় না। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের মুক্তধারায় আমরা আপ্লুত হইয়াছি—গ্রহণ না করিলেও তাহাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি।

রবীন্দ্র-ভাবধারার দুইটি মূল সূত্রের সঙ্গে পরিচয় ও সহানুভূতি না থাকিলে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির প্রেরণা বা আদর্শ সম্যকরূপে গ্রহণ করা সুকঠিন হইবে। সেই সূত্র দুইটি হইল—তাঁহার কাব্যে বিশ্বানুভূতি ও মানবতা।

এই সমগ্রতা রবীন্দ্রনাথের ভাবরাজ্যের বিশেষত্ব। তিনি কোন কারণে মনুষ্যত্বের মঙ্গলকে বিকাইয়া দিতে অসম্মত। তাই তাঁহার স্বাদেশিকতা বিশ্ববোধ হইতে বিমুক্ত নয়—তাঁহার অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযানে কোন ক্ষুদ্রতার পরিপোষণ নাই। ভারতীয় আদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ 'নৈবেদ্য'-কাব্যে নানা ভাবে প্রচারিত হইয়াছে—'শান্তিনিকেতন'-উপদেশাবলীতে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; কিন্তু যে জাতীয়তাবোধে স্বার্থে-স্বার্থে সংঘাত বাধে, লোভে-লোভে সংগ্রাম ঘটে, মানুষকে আঘাত করে, তাহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মমতা নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন যে, "যদি দুঃখে দহিতে হয়, তবু মিথ্যা চিন্তা নয়" এবং "যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু মিথ্যা কর্ম নয়" এবং "যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু মিথ্যা বাক্য নয়।"

রবীন্দ্রনাথের উক্ত আদর্শের সঙ্গে সহজ পরিচয় থাকিলে তাঁহার রাজনীতির প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে সজাগ থাকা সম্ভব। তিনি ইংরেজ শাসনের রূপকে নিন্দা করিয়াছেন – কারণ জাতির মনুষ্যত্ব তাহাতে সঙ্কুচিত হইয়াছে। শাসকের দণ্ড যখন আমাদের আত্মসম্মানকে আঘাত করিয়াছে, তাহাদের স্থূল লোভাতুর দৃষ্টি যখন আমাদের সম্পদকে হরণ করিয়াছে, তাহাদের অন্যায় যখন জাতিকে জর্জরিত করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ উদাত্ত কণ্ঠে ভারতবর্ষের সম্মান ঘোষণা করিয়াছেন এবং রাজশক্তির ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের বাণী দেশবাসীর ক্ষুদ্রতাকে আঘাত করিয়াছে, মনুষ্যত্বের অধিকার ঘোষণা

করিয়াছে এবং জাগ্রত চিত্তকে দেশসেবার দুর্গম পথে আহ্বান করিয়াছে। সেবার সাহায্যে মঙ্গলের সঙ্গে যোগ-সাধন করা রবীন্দ্রনাথের আদর্শ; যাঁহারা সর্বহারা তাঁহাদের বিধিদত্ত অধিকারকে খর্ব না করা রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা; মনুষ্যমর্যাদার গর্ব মানুষকে দান করা এবং আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা রবীন্দ্রনাথের তপস্যা।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে যেমন একটা বাজনার সুর আছে, তেমনি একটা কর্মের আহ্বানও আছে। তাঁহার কাব্য গীতিধর্মী হইলেও তিনি গতিধর্মকে অস্বীকার করেন নাই। তাই তাঁহার সাহিত্যে অতীতের মহৎ স্মৃতি, বর্তমানের কামনা ও ও ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা বাজিয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিবর্তন লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার কবিতার গতিটা প্রকৃতির ধাপ হইতে মানুষের ধাপে উঠিয়াছে এবং সেই গতি বিশ্বপ্রবাহের তালের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে। 'প্রভাত-সঙ্গীত'-কাব্যে রবীন্দ্রনাথের যে স্বপ্ন ভাঙ্গিল, 'মানসী'-কাব্যে যে সংশয়ের দোলা দেখা দিল, 'সোনার তরী'-কাব্যে সে সংশয় অতিক্রান্ত হইল—'চিত্রা' কাব্যে সেই কর্মের ডাক স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। তারপর 'খেয়া'র যুগে কর্ম হইতে বিদায় লইবার যে বাসনা দেখা যায়, তাহা গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'-কাব্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যে কর্মময় জীবনের ঘোষণা পুনরায় আত্মপ্রকাশ পাইল 'বলাকা'-কাব্যে। 'বলাকা'র সেই নিরুদ্দেশ সুর কবিকে দিবারাত্র সম্মুখের দিকে টানিয়া আনিয়াছে, কর্মের পথে নিজেকে সজাগ রাখিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত রাষ্ট্রকে অবলম্বন করিয়া গঠিত হয় নাই। মানুষের পূর্ণতর বিকাশে রাষ্ট্রই একমাত্র যন্ত্র ও মন্ত্র—একথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন "শক্তির বীভৎসতাকে কিছুতে আমরা ভয় করিব না, তাহাকে উপেক্ষা করিব, অবজ্ঞা করিব।" বিজ্ঞানের কৃপায় বাহুবল আজ নিদারুণ দুর্জয়; কিন্তু যাঁহাদের বল আছে, তাঁহাদের স্বাধীনতা আছে—এমন কথা ভাবিবার কারণ নাই। যাঁহারা ক্ষমতা লাভ করিয়া মানুষকে পিষ্ট করিতে চান, তাঁহারা স্বাধীন হইতে পারেন, কিন্তু স্বাধীন মানুষ গড়িবার পক্ষে তাঁহাদের রাষ্ট্র-নৈতিক স্বাধীনতা কাম্য নয়। তাঁহার Nationalism-গ্রন্থে তিনি প্রচার করিয়াছেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পশ্চিমের শক্তি বাড়াইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের স্বাধীন করিয়াছে এমন নহে। জাতীয়তার ভিতর যে সংকীর্ণতা আছে, তাহা পুষ্ট হইয়া সমস্ত জাতিকে প্রকৃত স্বাধীনতার পথ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। সেই স্বাধীন দেশে জনগণের পরাধীনতা, পরাধীন দেশের অপেক্ষা কম নহে। রবীন্দ্রনাথের

রাজনৈতিক মত ভারতীয় সাধনার সঙ্গে যুক্ত। তিনি রাষ্ট্রের তুলনায় সমাজকে বড় স্থান দিয়াছেন। ভারতের সামাজিক বৃত্তি হইল লোভ ও ঘৃণাকে সংযত রাখা। মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক সম্বন্ধ যদি লোভহীন ও ঘৃণাহীন হয়—অর্থাৎ সম্পর্কটা যদি সেবা হয়, তাহা হইলে সমাজের পরিবেষ্টনের ভিতর মানুষের পরিপোষণ ও পরিবর্ধন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠভাবে সম্ভব হয়। রাষ্ট্রের শক্তির ঔদ্ধত্যে যে লোভ ও ঘৃণা সৃষ্ট হয় তাহাতে সংঘাত ঘটিতে বাধ্য। সামাজিক চেতনা যখন সমাজবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়—অর্থাৎ সেবা ও ত্যাগ, সেই চেতনায় তখন আধুনিক দয়াহীনা সভ্যতা-নাগিনীর গুপ্ত বিষ-ভরা দন্তের প্রকাশ থাকে না।

রাষ্ট্রের আধুনিক ধর্ম হইল দেশবাসীকে সেবা করা। ভারতের সামাজিক সাধনার ভিত্তি হইল প্রতিবেশীকে সেবা দ্বারা জয় করা এবং ত্যাগের দ্বারা নিজেকে সেবার উপযুক্ত করা। সেই সামাজিক বিধানের সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রবিধানের মূলনীতির কোন পার্থক্য নাই—অথচ রাষ্ট্রীয় যন্ত্র শক্তির আধার বলিয়া তাহার বীভৎসতা ও ক্ষুদ্রতা অনেক সময় জাতিকে সংকুচিত করিয়া ফেলে। ভারতীয় সামাজিক বিধানের সেবা ও ত্যাগের বাণী রবীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকায় প্রচার করিয়াছিলেন, তখন পশ্চিম তাহার শক্তির অহংকারে সে-বাণী প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং ভারতবর্ষ তাহার দুর্বলতার দরুণ সে-কথা গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইয়াছিল। আজ স্বার্থে-স্বার্থে সংঘাতের বিস্তৃতি দেখিয়া পশ্চিমের রাজনীতিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, জাতীয়তা-বোধের সংকীর্ণতা পরিহার না করিলে এবং সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে একটা প্রেমের ও সেবার যোগসূত্র স্থাপিত না হইলে ভবিষ্যতের শান্তিকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব নয়। এই স্বীকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাণীর গভীর সংযোগ আছে।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের দিনে বাঙালীকে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র অধিকার করিবার পরামর্শ না দিয়া "স্বদেশী সমাজ" গড়িয়া তুলিতে বলিয়াছিলেন। বিদেশী রাষ্ট্রের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সামাজিক বিধানকে এমন ভাবে গড়িতে হইবে যে, মানুষের সমস্ত অভাব-অভিযোগ এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের সর্ববিধ উপায় যেন সমাজের সাহায্যে সৃষ্টি করা হয়। বিদেশী শাসন ও বিদেশী মাল বর্জন করিয়া আত্ম-শক্তি, আত্মসম্মান এবং জাতির প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে হইবে। জাতির ভাণ্ডারকে ঐশ্বর্যশালী করিতে হইবে—বিদেশী শাসকের কাছে আবেদন জানাইয়া নয়—দেশের সম্পদ্ সৃজনে নিজেদের শক্তিকে নিবেদন করিয়া। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের যে-দিকটা বিদেশী সমাজের উপর নির্ভরশীল, সেদিকে রবীন্দ্রনাথের

কোনদিন উৎসাহ ছিল না। তাই দেশবাসী অনেক সময় তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে কখনও ভুল বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই।

য়ুরোপের বিচারমূলক দৃষ্টি, গতিশীল সভ্যতা এবং কর্মপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু ইংরেজ-শাসনের গভীর শোষণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সজাগ ছিলেন। ইংরেজের পূর্বে অনেক বিদেশী রাজা আমাদের দেশে আসিয়াছেন—কেহ বা লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন—আবার কেহ বা এই দেশে রাজত্ব করিয়াছেন। কোন ক্ষণস্থায়ী লুণ্ঠনকারী ভারতবর্ষের ধনকে নিঃশেষ করিতে পারে নাই—বিদেশী রাজাকে সন্তুষ্ট করিবার মত ঐশ্বর্য ভারতবর্ষে চিরকাল ছিল। কিন্তু ইংরেজ-শাসন শুধু বিদেশী শাসকের শাসন নয় —তাহা হইল বিদেশী জাতির শাসন। এক জাতি যখন অন্য জাতিকে শোষণ করিতে আরম্ভ করে তখন সেই শোষণের সীমা থাকে না। তাই রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীকে পরের দিকে না তাকাইয়া নিজের দিকে বারবার তাকাইতে বলিয়াছেন—পরের শক্তির উপর বিশ্বাস না করিয়া নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস করিতে বলিয়াছেন। মানুষের পূর্ণতা হইল তাহার শক্তি অর্জনে নয়, তাহার মুক্তি অর্জনে। পরের অনুগ্রহে বাহিরের শক্তি পাওয়া যায়, রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া যায়, কিন্তু আত্মশক্তি না থাকিলে বাহিরের শক্তি প্রতারণা করে, মনের স্বাধীন বিকাশ না ঘটিলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা শুধু অন্যায় সৃষ্টির সাহায্য করে। সামাজিক দাসত্বের ভিত্তির উপর রাজনৈতিক স্বাধীনতার সৌধ সৃষ্টি করা একটা প্রহেলিকা মাত্র—তাহা স্থায়ী এবং মঙ্গলপ্রসূ হইতে পারে না—এ কথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন এবং সে-কথা রবীন্দ্রনাথ প্রচার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। যাঁহাদের রাজনৈতিক বুলি ছাড়া অন্য কোন সম্বল নাই, তাঁহারা রবীন্দ্র-দর্শনের প্রচারণে অসন্তোষের আগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু সত্যকে আত্মপ্রবঞ্চনার আবরণ দিয়া কয়দিন চাপিয়া রাখা যায়?

রবীন্দ্রনাথের মনন-বিকাশের রূপ সম্বন্ধে চেতনা না থাকিলে তাঁহার রাজনৈতিক মতের মূলসূত্রগুলি লোকের মনে দাগ কাটিবে না। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মত রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। তাঁহার সাহিত্যের সুর সম্বন্ধে যিনি বধির, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতের মর্ম গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিকে কাব্যময় প্রকাশ বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া লাভ নাই, কারণ তাঁহার মতকে যিনি জানিবেন, তাঁহার পথকেও তিনি মানিবেন। সেই পথে যাওয়া না যাওয়া নির্ভর করে, ঘটনার যোগাযোগের উপর।

রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্য-জিজ্ঞাসা

সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা না জানিতে পারিলে, না বুঝিতে পারিলে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের রূপ আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইবে না। সাহিত্য সৃষ্ট হয় লেখকের অন্তরের জগতে। সাহিত্যিকের অন্তর মানব জগতের দিকে প্রবাহিত—এই প্রবাহ কি ভাবে প্রকাশিত, তাহাই সাহিত্য।

যখন মানুষ নিজেকে ব্যক্ত করে, তখন সে সাহিত্য সৃষ্টি করে। মানুষ আছে, এই কথাটা বড় জিনিস নয়। থাকিতে হইলে প্রয়োজনের দাবি মিটাইতে হয়, প্রয়োজনের তাগিদ সহ্য করিতে হয়। "আমি আছি"—ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত আমি মুখ্য। "আমি প্রকাশ করি"—ইহার মধ্যে ব্যক্তির মানবত্বের দিক প্রধান। যে মানুষ, সে মানুষের সঙ্গে মিশিতে চায়, বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হইতে চায়। সাহিত্য এই আত্মীয়তা-স্থাপনের পথ দেখাইয়া দেয়। মানুষ যেখানে একা, সেখানে তার প্রকাশ নাই। মানুষ যেখানে মিলিতে চায়, সে নানা ভাবে, নানা প্রকারে নিজেকে প্রকাশ করে। সর্বজনের ও নিত্যকালের হাতে যে সমর্পণ, তাকেই বলে প্রকাশ। এবং সেই প্রকাশই সাহিত্যে ঘোষিত হয়। তাই বর্তমানকালকে অতিক্রম করিয়া সর্বকালের দিকেই সাহিত্যকে লক্ষ্য নিবেশ করিতে হয়।

মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় যে মানুষ সৃষ্টিকর্তা। "মানুষ নির্মাণ করে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আত্মার প্রেরণায়।" ব্যবসায়ীর পথ প্রয়োজনের পথ, সাহিত্যিকের পথ সৌন্দর্যের পথ, কল্যাণের পথ, প্রেমের পথ। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মানুষ পশু; সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে মানুষ প্রেমিক। জীবধর্ম ও চিত্তধর্ম—এই দুই ধর্মের সীমানা আলাদা। চিত্তধর্মের গৌরব সাহিত্যে ব্যাখ্যাত।

সাহিত্য চিত্তধর্মকে যদি আশ্রয় করিয়া গৌরবের আসন দাবি করে, তাহা হইলে সাহিত্যিকের কাছে চিত্তজাগরণ সবচেয়ে প্রশংসার জিনিস। এই জাগরণের প্রভাব যেখান হইতেই আসুক, তাহা বরণীয়। আমির সঙ্গে না-আমির মিলনে সাহিত্যসৃষ্টি হয়। আমি এক, বাইরে আছে বহু। "আমাতে যে এক আছে সে নিজেকে বহুর মধ্যে পাইতে চায়।" এই উপলব্ধির আনন্দ সাহিত্যে ঘোষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর

প্রবাহিত হচ্ছে বহুর ধারা, রূপে, রসে, নানা ঘটনার তরঙ্গে।” এই প্রকাশই আনন্দ, এবং এই প্রকাশেই সাহিত্যের ঐশ্বর্য প্রচারিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন যে, বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়; তার যে রস সে অহৈতুক। আনন্দ বিতরণ করা সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষের বিশ্ব মানুষের মনের বাইরে যদি থাকে, সেটাই নিরানন্দের কারণ হয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে বহু মানুষ, আর সেই সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে সেই এক মানুষ, যে বিশেষ।” সাহিত্যের বড় চাওয়া হইল বিশ্বের সঙ্গে মিলনের চাওয়া। এই চাওয়ার প্রকাশ সাহিত্যে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—“ভর্তৃহরি বলেছেন, যে মানুষ সাহিত্যসংগীকলাবিহীন সে পশু, কেবল তার পুচ্ছবিধান নেই এইমাত্র প্রভেদ। পশু-পক্ষীর চৈতন্য প্রধানত আপন জীবিকার মধ্যেই বদ্ধ—মানুষের চৈতন্য বিশ্বে মুক্তির পথ তৈরি করছে, বিশ্বে প্রসারিত করছে নিজেকে—সাহিত্যে তার একটি বড়ো পথ।”

মানুষ যে-বিশ্বে জন্মিয়াছে, তাতে দুই জগৎ আছে—ব্যবহারের জগৎ এবং ভাবের জগৎ। ভাবের জগতে হৃদয় উপলব্ধি করে বিশেষ রসের যোগে। মানুষের বিশ্বজয়ের এই একটা পালা বস্তুজগতে; ভাবের জগতে তার আছে আর একটা পালা। ব্যবহারিক বিজ্ঞানে একদিকে তার জয়স্তম্ভ, আর একদিকে শিল্পে সাহিত্যে।” রবীন্দ্রনাথের মতে, “চিরকালের মানুষ বাস্তব নয়, চিরকালের মানুষ ভাবুক।” এই ভাবনার প্রাধান্য, ভাবুকের মহিমা সাহিত্যে ঘোষিত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।”

প্রকাশের দুইটি ধারা—একটি ধারা মানুষের কর্ম, আর একটি ধারা মানুষের সাহিত্য। এই কর্মরচনা ও ভাবরচনা—এই দুই কাজে মানুষ নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছে। মানুষকে জানিতে হইলে এই দুয়ের মধ্য দিয়া জানিতে হইবে। কর্মক্ষেত্রে প্রকাশটা গৌণ, অভিপ্রায়-সাধন প্রধান। কিন্তু সাহিত্যে প্রকাশই মুখ্য। হৃদয়ের ধর্ম বাহিরের জগতের সঙ্গে মিলন-সাধন করা। সে নিজের মধ্যে নিজে পুরা নহে। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে যে এই প্রকাশের বিভাগ, ইহাই বাজে-খরচের বিভাগ। “হৃদয় আপনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া লোকসানকে একেবারে গণ্যই করে না,” তাই প্রকাশধর্মী লোক নিতান্ত বে-হিসাবী। “কাজের মধ্যে আমাদের আত্মরক্ষার শক্তি, আর রসের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রকাশের

শক্তি। আত্মরক্ষা আমাদের প্রয়োজনীয়, আর আত্মপ্রকাশ আমাদের প্রয়োজনের বেশি।"

আত্মপ্রকাশে প্রাচুর্যের প্রয়োজন। যাহা অপ্রয়োজনীয়, হিসাবী লোকের মতে তাহা বাহুল্যমণ্ডিত। প্রাণের কারবারে এই বাহুল্যের প্রয়োজন বেশি। আত্মপ্রকাশে দীপ্তি আসে অস্তিত্বের প্রাচুর্য থেকে, অস্তিত্বের ঐশ্বর্য থেকে। পর্যাপ্তে চলে আত্মরক্ষা, অপর্যাপ্তে আত্মপ্রকাশ। যেটা ভোগের বাহুল্য তাহা সাহিত্যের সামগ্রী নয়, যে-বাহুল্য মানুষকে সার্থক করে, তাহাই আত্মপ্রকাশের পথে সাহায্য করে। প্রাণের মুনাফা সাহিত্যের ধন, ব্যবহারিক জগতের মুনাফা সাহিত্যের সমস্যা। প্রাণ-প্রাচুর্য পৃথিবীকে স্পর্শ করে, মানুষের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"প্রকৃতির এই নব জীবনের উৎসবে রূপের উত্তরে রসের গান গাইবার জন্যেই আমি এসেছিলুম এই কথাই কেবল মনে পড়ে। কাজের লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, তার দরকার কী? বলে ওটা সৌখীনতা। অর্থাৎ এই প্রয়োজনের সংসারে আমরা বাহুল্যের দলে। তাতে লজ্জা পাবো না, কেননা এই বাহুল্যের দ্বারাই আত্মপরিচয়।"

রব উঠিয়াছে সাহিত্যে বাস্তবতা প্রথম কথা। যে-সাহিত্যে বাস্তবতা নাই তাহা প্রাণহীন। অর্থাৎ তাহা জনসাধারণের উপযোগী নয়। যে-সাহিত্য-চেতনায় গণ-চেতনা নাই, তাহাকে বিদ্রূপ করিবার মর্জি আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে প্রবল।

এই বাস্তবতার রূপ সম্বন্ধে সজাগ না থাকিলে বাস্তব সাহিত্যের প্রাণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মুশকিল এই যে, বস্তু একটা নহে। মানুষের প্রকৃতি বহুধা। তাহার প্রয়োজন বিচিত্র। সবাই একই বস্তুর সন্ধানে ঘুরিয়া ফেরে না—একই চোখে দেখেনা। একই বস্তু বিভিন্ন লোকের নিকট নানা রূপে ও বর্ণে দেখা দেয়। বস্তুর মহলে নানা দরজা আছে। আমরা নানা দরজার সাহায্যে বস্তুর মহলে প্রবেশ করি। তাই কোন্‌টা বস্তু ও কোন্‌টা বস্তু নয়, এনিয়ে মতভেদ ঘটে। বস্তুর যে অংশ নিয়া মতভেদ ঘটে না, সেই অংশকে বুঝিতে পারিলে এবং বুঝাইতে পারিলেই সাহিত্যের কোঠায় পৌছানো যায় না।

রবীন্দ্রনাথের মতে বস্তু-জগতের দুই দিক—একটা তথ্যের দিক, আর একটা সত্যের দিক। তথ্য হইল খণ্ডিত, স্বতন্ত্র। তাহা সীমাবদ্ধ। তথ্য হইল যা আছে তাকে তেমনটি ভাবে দেখা। সত্য হইল তথ্যের ভিতর সুষমার অখণ্ড ঐক্যকে

দেখা। তথ্যের স্বাদ বিচ্ছিন্ন পদার্থের স্বাদ, সত্যের স্বাদ অবিচ্ছিন্ন পদার্থের স্বাদ। সাহিত্যিক সত্যের সাহায্যে তথ্যকে প্রকাশ করিবে। সত্যের মধ্যে অসীমের ইশারা আছে, ঐক্যানুভূতি আছে—তাই নিত্যতা ও ছন্দ আছে। তথ্যকে বুঝিতে হইলে বৈজ্ঞানিক শ্রেণীগত বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে হয়। সাহিত্যের যে-সত্য বস্তু আছে, তাহাকে বুঝিতে হয় রসের ভূমিকায়। সাহিত্য তথ্যের সীমায় বদ্ধ থাকে না—তাই সাহিত্যে এত ইশারা, এত কৌশল ও এত ভঙ্গী।

বস্তুজগতে যে সত্য আছে, তাহা দুই প্রকার—সাধারণ সত্য ও সার্থক সত্য। যে জিনিসকে আমরা খণ্ডিতভাবে দেখি, তাহা সাধারণ সত্য। যে-জিনিসের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি সেই জিনিসই সার্থক। তার মানে, আমার মন যার মধ্যে অর্থ পায়না আমার পক্ষে তাহা অযথার্থ।

সাহিত্যের মধ্যে আমরা প্রধানত খুঁজি রস-বস্তু। রসকে গ্রহণ করিতে হইলে রসিকের প্রয়োজন। যাঁরা খণ্ডিত তথ্যকে বিশ্লেষণ করিতে চান, তাঁরা সাহিত্যে রস-বস্তুকে উপেক্ষা করেন। রসবিচারে ব্যক্তিগত রুচি ও কালগত মর্জিকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তুর রসের একটা নিত্যতা আছে। রসের আধার নিশ্চয়ই থাকিবে কিন্তু সেই আধারকে ওজন করিলেই রস-সাহিত্যের বিচার হয় না। বস্তুর দর নানা যুগে পরিবর্তিত হয়—অর্থাৎ সেইটা হইল স্থূল বস্তু। কিন্তু সাহিত্যিকের জগৎ হইল তাহার অন্তরের জগৎ। অন্তরে বিচিত্র রস বিরাজ করে। সেই রসে অন্তরের জগৎ সাহিত্যকের নিজস্ব জগৎ হইয়া উঠে। তাই বাহিরের জগতের স্থূল বিচারে বস্তু সাহিত্য বড় স্থান পায় না। হৃদয়ে যে রস আছে, সেই রস-সিক্ত জগতে স্থূল বস্তু নতুন সত্যে আভাসিত হয়। যাহাদের হৃদয়ে গবাক্ষ বন্ধ থাকে বা বিস্তৃতিতে সংকীর্ণ, তাহারা বিশ্বের মাঝখানে প্রবাসী হইয়া বাস করে। বাহিরের জগৎকে হৃদয়বৃত্তির রসে সিঞ্চিত করিতে না পারিলে রসবস্তুকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই মানস-জগৎ—ইহা সাহিত্যিকের জগৎ। রবীন্দ্রনাথের মতে, ইহার প্রবাহ পুরাতন ও নিত্য নূতন। "নব নব ইন্দ্রিয়, নব নব হৃদয়ের ভিতর দিয়া এই সনাতন স্রোত চিরদিনই নবীভূত হইয়া চলিয়াছে।"

হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই, যাহার মানস-জগৎ আছে, তাহার মধ্যে সাহিত্যের আবেগ আছে। সাহিত্য-বিচারে আমরা দুইটি জিনিস লক্ষ্য করি—এই মানস-জগতের বর্ণ, ছাঁচ এবং রূপ, এবং তাহার প্রকাশ-নৈপুণ্য। এই প্রকাশের মধ্যে এতটা কলা ও কৌশল থাকা চাই যে, নিজের মানস-জগতের রস অন্যের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে, অন্যের

চিত্তকে জাগাইতে পারে। তাই সাহিত্যে সাজসরঞ্জাম দরকার—তাই প্রয়োজন রচনাশক্তির, অলংকারের, রূপকের, ছন্দের, ইশারার। বিজ্ঞানে বা দর্শনে আবরণ, বা অলংকার বা ইঙ্গিতের প্রয়োজন নাই। সাহিত্য-রচনায় শ্রী এবং হ্রী, দুই থাকা চাই। এই শ্রী ও হ্রী সাহিত্যে অনির্বচনীয়তা আনিয়া দেয়। সাহিত্যে নিরাভরণতা এই শ্রী ও হ্রীকে আঘাত দেয়, এই আভরণে আচ্ছন্ন হইলেও এই শ্রী ও হ্রী আহত হয়। তাই সাহিত্যে চিত্র ও সঙ্গীত, দুই-ই থাকিবে। "চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সঙ্গীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সঙ্গীত প্রাণ।"

সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় এবং মানবচরিত্র। মানবহৃদয়ে এবং মানবচরিত্রে অনেক অংশ, অনেক স্তর, এমন কি অনেক বিরুদ্ধ ভাবনা আছে। তাই আসে সংঘাত, এবং হৃদয়ের লীলা হয় এত সূক্ষ্ম। এই বহিঃ-প্রকৃতি ও অন্তঃ-প্রকৃতির আশ্লেষে যে নব নব রস সৃষ্ট হয় এবং সঙ্গীত ধ্বনিত হয়, তাহাই সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কি রাগিণী বাজাইতেছে, সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথের মতে জীবনটা লীলা, বৈজ্ঞানিক মতে জীবনটা সংগ্রাম। জীবনটা লীলা বলিয়াই রবীন্দ্র-সাহিত্যে খেলা, ছুটি, আনন্দ, এই সব রসে টৈটম্বুর। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন যে, আনন্দ হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, আনন্দের দিকে চলে। আনন্দ আছে বলিয়াই দুঃখ আছে, হানাহানি আছে। সাহিত্যিকের কাজ এই আনন্দকে স্বীকার করা।

জগতে সংঘাত ও হানাহানি বেশি, কারণ বেশির ভাগ মানুষ কাজ করে অন্যের জন্য। আমরা মনিবকে অথবা কোন প্রবল পক্ষকে, অথবা বাঁধা কর্ম-প্রণালীকে স্বীকার করি। "পেটের দায়ে বা পিঠের দায়ে" আমরা তাদের প্রকাশ করি, তাদের দাসত্ব করি। এই দাসত্বের আঙিনায় সাহিত্য-রচনা চলে না, কারণ, যথার্থ সাহিত্য নিজেকে প্রকাশ করিবে। তাই সাহিত্যে লীলা-বোধের প্রয়োজন আছে, জীবন সংগ্রামে তার স্থান যত সংকীর্ণই হউক না কেন। সাহিত্যে আনন্দের জয়ঘোষণা থাকে বলিয়াই তাহা মৃত্যুজয়ী। সাহিত্য তখনই মৃত্যুহীন যখন সে রসপূর্ণ। এবং রসসাহিত্যেই আনন্দ রূপ ধরে। যে রচনার সমাপ্তিতে সমাপ্তি নাই, সেই রচনা রসসাহিত্যের অঙ্গ।

সত্যকে যখন আমরা নিবিড়রূপে, আনন্দরূপে, অমৃতরূপে উপলব্ধি করি, তখনি তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ করিতে পারি। জগতের সঙ্গে আমাদের

যোগ তিন প্রকারের—বুদ্ধির যোগ, প্রয়োজনের যোগ এবং আনন্দের যোগ। পরকে আপন করিয়া জানা এবং আপনাকে পর করিয়া জানা, ইহাই আনন্দের যোগ। সকলের মধ্যে নিজেকে জানা—এই জানাতেই যথার্থ আনন্দ। ইহাই মানবধর্ম। মানবধর্ম কর্মের শূদ্রত্ব হইতে মানুষকে উদ্ধার করিতে চায়। "যে কর্মের অন্তরে মুক্তি নাই, শুধু লোভ, শুধু প্রেমের অভাব, সেই কর্মেই শূদ্রত্ব।"

সাহিত্যিক আপনার রচনার মধ্যে বিশেষকে চায়। মানুষের প্রাণে নানা ভাবাবেগ আছে। এই ভাবাবেগকে বিশিষ্টতা দেওয়া হ'ল সাহিত্যিকের আনন্দ। এই বিশিষ্টতা আসে, যখন সে একান্তভাবে দেখিতে পায়। সৃষ্টির এই বিশেষত্ব হইল দৃষ্টির বিশেষত্ব, অনুভূতির বি'শষত্ব। তাই চরিত্র-চিত্রণ সাহিত্যক্ষেত্রে আদর পায় তার গুণের জন্য নয়, তার রূপের জন্য। "রূপের স্পষ্টতায় যে স্বপ্রত্যক্ষ, সেই রূপবান।" সাহিত্যে আদরণীয় হয়, যখন কোন চরিত্র সুস্পষ্ট ও স্বপ্রত্যক্ষ। তাই বাল্মীকির রামায়ণে সাহিত্য দৃষ্টিতে রামের চেয়ে লক্ষ্মণ বড়, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষে হীরা রূপবান। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "হীরা আমাদের খুমোত দেয় না, সে সুন্দর বলে নয়, গুণবান বলে নয়, রূপবান বলে; সাধারণ অস্পষ্টতার মাঝ-খানে সে বিশেষ বলে, স্বপ্রত্যক্ষ বলে। সাহিত্য বিচারে চরিত্ররূপটা সবচেয়ে বড় কথা, চরিত্রের নৈতিকগুণ নয়। সমাজে আস্বাস্থ্যকর কি না, সাহিত্য বিচারে সে কথা প্রধান কথা নয়। .শেকসপিয়রের ফলসটাফ সমাজে অনাদরণীয় হতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ বলে সাহিত্যে আদরণীয়।"

উপনিষৎ সত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন—শান্তং শিবং অদ্বৈতং। শান্তং হইল সামঞ্জস্য যার যোগে সমস্ত বিশ্ব শান্তিতে বিধৃত। শিবং হইল সেই সামঞ্জস্য যা কল্যাণের মধ্যে বিকাশ লাভ করিতেছে। অদ্বৈতং হইল আত্মার মধ্যে ঐক্যের উপলব্ধি। অর্থাৎ অসীমের মধ্যে দ্বন্দ্বের অভাব নাই—কিন্তু দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইবে। সত্যের তত্ত্ব হইল অদ্বৈত। বিপ্লব ও শান্তি, ভাল ও মন্দ, বিচ্ছেদ ও মিলন, এই দ্বন্দ্বের সাহায্যে সত্যের স্বরূপকে পাইতে হইবে। শান্তং শিবং অদ্বৈতং—এই মন্ত্রে বিরুদ্ধশক্তির সন্ধি-স্থাপনে সত্যের উপলব্ধি-প্রচেষ্টা আছে। মানুষের মনে বিশ্বকে দেখিবার বাধা আছে। এই বাধার ভিতর দিয়া পথ দেখিতে হইবে। মানুষের মন বাধাকে মানে না, বাধাকে অতিক্রম করে। তাই পথ খোদা মানুষের ধর্ম, এবং সাহিত্য সেই ধর্মের সাহায্যে বিশ্বকে দেখিতে চায়। এই "দেখতে পাওয়া মানে হচ্ছে প্রকাশকে পাওয়া। সংবাদ গ্রহণ করা এক জিনিস আর প্রকাশকে গ্রহণ করা আর এক জিনিস। বিশ্বের প্রকাশকে

মন দিয়ে গ্রহণ করাই হচ্চে আর্টিষ্টের সাধনা।" বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করা যায় জ্ঞানের দ্বারা নয়, ব্যবহারের দ্বারা নয়, সম্পূর্ণ করে দেখার দ্বারা, যোগের দ্বারা।

এই বিশেষকে দেখিবার একটা কৌশল আছে। সৃষ্টির লীলা চারিদিকেই আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"যেখানটা সর্বদা আমাদের চোখে পড়ে অথচ দেখতে পাই নে, সেইখানেই দেখবার জিনিসকে দেখানো হচ্চে আর্টিষ্টএর কাজ। আর্ট পুরাতনকে বারে বারে নূতন করে। বিশেষকে সে দেখতে পায় হাতের কাছে, ঘরের কাছে। সৃষ্টি তো খনির জিনিস নয় যে, খুঁড়তে খুঁড়তে তার পুঁজি ফুরিয়ে যাবে। সে যে ঝরণা—তার প্রাচীন ধারা যে চিরদিনই নবীন হয়ে বইচে, এইটে প্রমাণ করবার জন্যে তাকে কোনো অদ্ভুত ভঙ্গী করতে হয় না।"

মানুষের যে-দিকটা তুচ্ছ নয়, ক্ষুদ্র নয়, সংকীর্ণ নয়, সেই দিকটা সাহিত্যে স্থান পায়। সাহিত্যে একটা নিত্যকালীন আদর্শ আছে। তাহা মানুষের সর্বদেশের সর্বকালের সম্পত্তি। সেই আদর্শকে সাহিত্যবিচারে আঁকড়াইয়া ধরিতে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন। "যেখানে লেখক নিজের ভাবনায় সমগ্র মানুষের ভাব অনুভব করিয়াছে, নিজের লেখায় সমগ্র মানুষের বেদনা প্রকাশ করিয়াছে, সেইখানেই তাহার লেখা সাহিত্যে জায়গা পাইয়াছে।" তাই, সাহিত্য শুধু ভাল-মন্দ বিচার করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। তাই, রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। সাহিত্যে এই সহিতত্ব থাকা চাই। এবং সাহিত্যে এই মিলনযোগ থাকে বলিয়াই সমাজের বিচ্ছিন্নতা সাহিত্যের সাহায্যে দূর হয়। সাহিত্যের শক্তি প্রেমরূপিণী, বলরূপিণী নহে। শক্তিধর্মে ভেদকে প্রাধান্য দিয়াছে, বৈষ্ণবধর্মে এই ভেদকে নিত্যমিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। তাই, সাহিত্যে বৈষ্ণব জয়লাভ করিয়াছে। সাহিত্যের শক্তিও এই "হ্লাদিনী শক্তি।"

মানুষের দুই জগৎ আছে—ব্যবহারিক জগৎ ও ভাবের জগৎ। একথা ঠিক নয় যে, রবীন্দ্র সাহিত্য অন্নবস্ত্রের জগৎকে অস্বীকার করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু সাহিত্যিকের কাছে অন্ন-বস্ত্র আশ্রয়ের সুযোগটাই বড় কথা নয়, রবীন্দ্রনাথের মতে, ধনীদের টাকা আছে, গুণীদের কীর্ত্তি আছে। টাকার খনি বাইরের জগতে, কীর্ত্তির খনি মনের মধ্যে। ব্যবহারিক জগতে ফরমাসের আক্রমণ প্রবল—রাজার

ফরমাস, প্রভুর ফরমাস। ফরমাসই যাদের চরম, তারা প্রথমে বাঁচেন, পরে মরেন। আর ফরমাসকে মানিয়া লইয়া সকল কালের, সকল মানুষের কথা যারা ভাবেন তারা ভাবীকালের জন্য টিকে থাকেন।

T. S. Eliot বলেন—

Shall we not bring to Your service all our powers
For life, for dignity, grace and order,
And intellectual pleasures of the senses ?
The Lord who created must wish us to create
And employ our creation again in His service
Which is already His service in creating.
For man is joined spirit and body.
Visible and invisible, two worlds meet in man ;
Visible and invisible must meet in His Temple ,
You must not deny the body.

ইলিয়ট-কাব্যে যে কথা ঘোষিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহা অস্বীকার করেন নাই। তিনিও বলিয়াছেন—"ঘর বলে, পেয়েছি, পথ বলে, পাইনি, মানুষের কাছে 'পেয়েছি' তারও একটা ডাক আছে আর 'পাইনি' তারও ডাক প্রবল। ঘর আর পথ নিয়েই মানুষ। শুধু ঘর আছে পথ নেই সেও যেমন মানুষের বন্ধন, শুধু পথ আছে ঘর নেই সেও তেমনি মানুষের শাস্তি।"

রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনের তাগিদকে নতমস্তকে মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব হইল এই যে তিনি সাহিত্যিককে নিজের স্বধর্ম ত্যাগ করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছেন। প্রয়োজনের তাগিদ অভাবের থেকে, লীলার তাগিদ ভাবের থেকে। প্রয়োজনের ক্ষুধা বিরাট, দাবি বিস্তর। মানব-সংসারের রথ চলে কর্মী ও গুণীর পারস্পরিক সহায়তায়। "উভয়ের কর্ম একাকার হইয়া গেলে মোট কর্মটাই পঙ্গু হইয়া যায়।" রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"ক্ষুধার সময়ে বকুলের চেয়ে বার্তাকুর দাম বেশি হয়। সেজন্য ক্ষুধাতুরকে দোষ দিই নে ; কিন্তু বকুলকে যখন বার্তাকুর পদ গ্রহণ করবার জন্যে ফরমাস আসে, তখন সেই ফরমাসকেই দোষ দিই।"

প্রয়োজনের দাবি মিটাইয়া দেওয়া যখন সকল লোকের নিত্যসাধনা হয়, তখন "বিশ্বব্যাপী দস্যুবৃত্তি" অপরিহার্য হইয়া ওঠে। ব্যবহারিক জগতের গতির কোন স্বাভাবিক লয় নাই, সেই গতি বাড়তে থাকে প্রয়োজনের দাবিতে। দ্রুত চলাই

যে দ্রুত এগোনো, সে-কথা সত্য হয় জন্তুর পক্ষে, মানুষের পক্ষে নয়। আজ প্রয়োজনের ডাকে সবাই চলিতেছে, মনুষ্যত্বের ডাক শুনিতে কেহই অপেক্ষা করিতে চায় না। তাই যুদ্ধ থামিলেও শয়তানি থামে না। সাহিত্যিকের কাজ মানুষ-ব্যক্তিকে সজাগ রাখা, বাহ্য প্রয়োজনের "বীভৎস সর্বভুক পেটুকতার" উদ্যোগ হইতে মানুষকে বাঁচানো। এই দ্রুত চলায় সাহিত্যিক তাহার ছন্দ হারাইয়া ফেলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "প্রয়োজনের সম্বন্ধ হইল কেবলি গ্রহণের সম্বন্ধ এবং সত্যের সম্বন্ধ হইল পাওয়া ও দেওয়ার মিলিত সম্বন্ধ। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে লোভ আছে, সত্যের ক্ষেত্রে, রসের ক্ষেত্রে আনন্দ আছে। পশ্চিমের সবুর না-করা নীতি ও দম-দেওয়া ছন্দহীন দ্রুত চলা, তাহাতে পশ্চিম অন্তরের মানুষকে হারাইতেছে, ফলে, সাহিত্যেও সেই প্রয়োজনের দাবিকে স্বীকার করিতেছে।" "কামে আমরা মাংসই দেখি আত্মাকে দেখিনে, লোভে আমরা বস্তুই দেখি মানুষকে দেখিনা, অহংকারে আমরা আপনাকেই দেখি অন্যকে দেখিনে।" এই পশ্চিম-সভ্যতাকে লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় উর্দ্ধস্বরে ডাকি'
"থামো, থামো, কোথা তুমি রুদ্রবেগে রথ যাও হাঁকি
সম্মুখে আমার গৃহ।"
রথী কহে, "ঐ মোর পথ,
ঘুরে গেলে দেরি হবে, বাধা ভেঙে সিধা যাবে রথ।"
গৃহী কহে, "নিদারুণ ত্বরা দেখে মোর ডর লাগে,
কোথা যেতে হবে বলো।''
রথী কহে, "যেতে হবে আগে।"
"কোনখানে", শুধাইল।
রথী বলে, "কোনো খানে নহে,
শুধু আগে।"
"কোন তীর্থে, কোন সে মন্দিরে," গৃহী কহে ?
"কোথাও না, শুধু আগে।"
"কোন বন্ধু সাথে হবে দেখা ?"
"কারো সাথে নহে, যাবো সব-আগে আমি
মাত্র একা।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রাণ গতি। রবীন্দ্রনাথ গতিকে বিদ্রূপ করেন নাই, বিদ্রূপ করিয়াছেন লক্ষ্যশূন্য, ছন্দহীন ঘর্ঘরিত রথবেগ, যখন সংগীত হইয়া ওঠে চীৎকার। রবীন্দ্রনাথের আনন্দ পথচলাতে, ধূলি উড়ানোতে নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে চলচ্চিত্তের নিত্য প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন—

"যারা বিষয়ী তারা বিশ্বকে বাদ দিয়ে বিশেষকে খোঁজে। যারা বৈরাগী তারা পথে চলতে চলতেই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে বিশেষকে চিনে নয়। বিশ্বপ্রকৃতি স্বয়ং যে এই লক্ষ্যহীন বৈরাগী—চলতে চলতেই তার যা-কিছু পাওয়া। জড়ের রাস্তায় চলতে চলতে সে হঠাৎ পেয়েছে মানুষকে। চলা বন্ধ করে যদি সে জমাতে থাকে তা হলেই সৃষ্টি হয়ে ওঠে জঞ্জাল। তখনি প্রলয়ের ঝাঁটার তলব পড়ে।"

সাহিত্যের নবত্ব বা আধুনিকতা নিয়ে সমালোচক মহলে কলরব চলে। রবীন্দ্রনাথ "ল্যাঙট-পরা গুলি-পাকানো ধুলোমাথা আধুনিকতাকে" প্রশংসার চোখে দেখেন নাই। তাঁর মতে, সাহিত্যের শ্রী ও হ্রী, আব্রু ও আভিজাত্য, সংযম ও সংগতি থাকা দরকার। তাঁর আদর্শ সর্বকালীন ও সর্বজনীন। যাঁহারা উপস্থিত গরজের দাবিকে প্রাধান্য দেন, হট্টগোল পছন্দ করেন, তাঁরা চিরন্তনকে নতুন করিয়া প্রকাশ করিতে অক্ষম। শক্তিহীনের কৃত্রিমতা, দারিদ্র্যের আস্ফালন, লালসার অসংযম, এইসব অপটু লেখকের লক্ষণ। সস্তা সাহিত্যের একটা প্রলোভন আছে, কিন্তু তাহা সাহিত্যের পক্ষে বিপদজনক।

যে জিনিসের গতি আছে, তা কখনও সোজা চলে না। মাঝে মাঝে সে বাঁক নেয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, এই বাঁকটাই আধুনিকতার নিশানা। তখন সাহিত্যে নতুন মর্জি, নতুন অভিরুচি, নতুন ভাবনা আসে। প্রত্যেক যুগের একটা মর্জি আছে, প্রতি সাহিত্যিক যুগে একটা বিশিষ্ট রীতি আছে। এই রীতির বেড়া ভাঙিয়া যখন নতুন রীতি ও মর্জি আসে, তখন সাহিত্যে আমরা আধুনিকতা দেখি। এই ভাঙনের খেলা চিরকাল চলবে। এই ভাঙা-খেলার সমাপ্তি নাই।

তাই নতুন যুগের নতুন রূপ থাকে। তারই ঘোষণা হয় আধুনিকতায়। কিন্তু যুগের বিশিষ্টতা অতিক্রম করিয়া যে রস সর্বকালের ও সর্বলোকের জন্য বন্টিত হয়, সেই রসসাহিত্য চিরকালের আধুনিক। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ছিল সাহিত্যের আধুনিকতা। মায়া ও মোহ, সেই সাহিত্যে মুখ্য ছিল। তাই ইশারা, ইঙ্গিত, আভরণ, শুচিতা ইত্যাদি সাহিত্যকে এক

রূপ দিয়াছিল। এই যে সাহিত্য, যাতে মায়া আছে, মোহ আছে, সমালোচকের দল তাকে রোমান্টিক সাহিত্য বলে। আধুনিক কালে সময়ের অভাব, মনের মধ্যেও তাড়াহুড়া থাকে। সংকোচহীন প্রকাশ, বিচারমূলক আলোচনা আধুনিকতার লক্ষণ বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকে। রোমান্টিক সাহিত্যে প্রসাধনের স্থান আছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুগে নিরাভরণতা প্রশংসা দাবি করে। রোমান্টিক সাহিত্য লালিত্যপূর্ণ, ব্যক্তিগত। আধুনিক সাহিত্য নৈর্ব্যক্তিক। "বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা" হইল বিশুদ্ধ আধুনিকতা। নিরাসক্ত মন সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন। কিন্তু সাহিত্যে নিরাসক্ত মন এখনও বড় স্থান অধিকার করে নাই।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা, এইজন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলংকারের উপর নয়, কেননা অলংকারটা ব্যক্তির নিজের রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্যে।"

সাহিত্যের আধুনিকতার ও বাস্তবতার বুলি আওড়াইয়া অনেকে আব্রুহীন, উদ্ধত প্রকাশকেই সাহিত্য আদর দেখাইতে প্রস্তুত হয়েন। নববধূর সকরুণ মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি ভাঙিতে দিয়া তাকে অসংযত ও আবরণহীন করিতে হইবে বাস্তবতার দোহাই দিয়া, সেটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার, সাহিত্যের সত্য সেখানে পাওয়া যায় না। ভাষাকে ভাঙিয়া, অর্থের বিপর্যয় ঘটাইয়া, ভাবগুলিকে ডিগবাজি খেলাইয়া চমক লাগাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু তাহা আধুনিকতার নিশানা, ইহা স্বীকার করা যায় না। আলাপের চেয়ে প্রলাপের শক্তি বেশি, কিন্তু প্রলাপের জোর দেখিয়া গর্ব করা উচিত নয়। মাতলামিকে পৌরুষ বলিয়া মনে করা উচিত নয়। যে-লেখক অপটু, তিনিই রূঢ়তাকে ভাবেন শৌর্য, নির্লজ্জতাকে ভাবেন পৌরুষ।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

প্রথম কথা—"জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করিতে হয়, আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করিয়া দিতে হয়। তাহার জন্য নানাপ্রকার আভাস-ইঙ্গিত, নানা প্রকার ছলাকলার দরকার হয়। তাহাকে কেবল বুঝাইয়া বলিলে হয়না, তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়।"

দ্বিতীয় কথা—"রচনা সম্পূর্ণ নিজের। তাহা একজনের যেমন হইবে, আর একজনের তেমন হইবে না।"

তৃতীয় কথা—"সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়। যাহা জ্ঞানের কথা, তাহা পুরাতন হয়, যাহা ভাবের কথা, তাহা পুরাতন হয় না। তাহা নানা হৃদয়ে নানা রঙে প্রতিফলিত হয়।"

ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ এই কথা বারবার বলিয়াছেন। তাই, "অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।"

যাঁহারা বাস্তব-সাহিত্য অন্বেষণ করেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ আছে। একদল আছেন যাঁহারা স্বাদেশিকতার শিকলে আবদ্ধ। অর্থাৎ যাঁহারা হিন্দুত্ব প্রচার করিবেন, নিজের দেশের আচার, রীতি ও প্রথার তারিফ করিবেন এবং পশ্চিম দেশের প্রভাবকে হেয় মনে করিবেন। এদের বলা যায় রক্ষণশীল দল। প্রচলিত ও প্রাচীন হিন্দুত্বের ব্যাখ্যান ও পরিপোষণ বাস্তবতার লক্ষণ বলিয়া তাঁরা মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন দলের লোক, ইংরাজী-শিক্ষার সাহায্যে পশ্চিম যখন ভারতীয় ভাবনা ও সাধনাকে আঘাত করিল, সেই সংঘাতকে মূর্তি দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনের আঘাতে জীবন জাগিয়া উঠে। এই জাগরণ অবাস্তব নয়। উনবিংশ শতাব্দীর ভারত জাগিয়া উঠিয়াছি পশ্চিমের ডাকে। যারা শিকলটাকে সত্য বলিয়া জানে, তারা শিকলের ভাঙনকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে জাগ্রত চিত্তকে স্থান দেন।

অনেকে বলেন যে সাহিত্যে লোক-শিক্ষা নাই, তাহা সত্যই অবাস্তব। রবীন্দ্রনাথের মতে, লোকশিক্ষা সাহিত্যের কাজ নয়। তার মানে, সাহিত্যিক ইস্কুল মাষ্টার নহেন। যিনি নীতির কথা বলেন, জাঠরিক উন্নতির কথা বলেন, যাঁরা শিক্ষা দিবার জন্য বই লেখেন, তাঁহাদের রচনার আয়ু সীমাবদ্ধ। নিত্যকালের জন্য তাঁহারা কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন না। তাহাদের রচনায় আনন্দের সৃষ্টি নাই, তাই নিত্যতা নাই। সাহিত্যিকের কাজ শিক্ষা দেওয়া নয়—তার কাজ নিজের ভাবের দ্বারা বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করা। তাহার আদর্শ দেশী কি বিদেশী, তাহার সত্য জনগণের উপযোগী কি না, একথা বড় নয়। তাহা চিত্তকে নাড়া দেয় কি-না, রস-সিঞ্চিত কি না এবং অনির্বচনীয় কি না। সাহিত্যিকের কাছে যাহা সত্য, তাহাই সত্য—"যদি কাহারো কাছে তাহা মিথ্যা হয় তবে সেই মিথ্যাটাই মিথ্যা।" আনন্দের মধ্যেই যাহার প্রকাশ, তখন এই প্রশ্ন অর্থহীন যে আর্টের দ্বারা আমাদের কোন হিতসাধন হয় কি-না।

য়ুরোপে বিজ্ঞানের সত্য দিয়া সকল দেশকে স্পর্শ করিয়াছে। তাই জ্ঞানের ক্ষেত্রে, কর্মের ক্ষেত্রে য়ুরোপ জয়ী। আত্মরক্ষায় য়ুরোপ বিপুল শক্তি অর্জন করিয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে য়ুরোপ বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ-পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, কিন্তু মানুষের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিল না। য়ুরোপ দেবতার শক্তি পাইয়াছে কিন্তু দেবত্ব পায় নাই। বিজ্ঞানের স্পর্দ্ধায় শক্তির গর্বে অর্থের লোভে য়ুরোপ মানুষকে লাঞ্ছিত করিয়াছে। তার লোভকে থামাইতে হইবে। প্রয়োজন বিজ্ঞান-বুদ্ধির সঙ্গে ধর্ম-বুদ্ধির মিলন। ধর্মের সাধনা হইল লোভকে ভিতরের দিক হইতে দমন করা, আর বিজ্ঞানের সাধনা হইল লোভকে বাইরের দিক হইতে দূর করা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে আত্মপ্রকাশ চলে, তার ভিতর এই বিজ্ঞান-বুদ্ধির ও ধর্মবুদ্ধির ঐক্য সাধন করিতে হইবে। ভারতবর্ষ একদিন তার বাণী বাইরে পাঠাইয়াছিল, কিন্তু সেই বাণী কখনো মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্যকে শুষ্ক করিয়া দেয় নাই। ভারতের মন্ত্র কখনও মানবচিত্তবৃত্তিকে খর্ব করে নাই। ভারতবর্ষ তখন সত্যকে জানিয়াছিল। য়ুরোপ সত্যকে জানিয়াছে, কিন্তু সেই সত্যের কল্যাণকর ব্যবহার জানে নাই। "য়ুরোপ আপন বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের মধ্যে আসেনি, এসেচে আপন কামনা নিয়ে।"

রবীন্দ্রনাথ অসামান্য মানুষকে বিশেষ দাম দিয়াছেন। সর্বসাধারণ মানুষের মনে যে ছায়া ফেলে, যে মায়া সৃষ্টি করে তাহা ক্ষণকালের, কারণ যুগে যুগে তার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এমন সব মানুষ আছেন যাঁরা শত শত শতাব্দী ধরিয়া মানুষের চিত্তকে অধিকার করিয়া আছেন। সেই অসামান্য মানুষকে সাহিত্যে স্থান দিতে হইলে তাহার অসামান্য রূপকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে। ম্যাক্সিম গোর্কি লিখিত টলসটয়ের জীবনচরিত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, "ক্ষণকালের মায়ার দ্বারা চিরকালের স্বরূপকে প্রচ্ছন্ন করে দেখাই আর্টিষ্টের দেখা একথা মানতে পারিনে।" যাঁরা ম্যাক্সিম গোর্কিকে প্রশংসা করেন যে, তিনি টলসটয়কে দোষেগুণে যে মানুষটি ছিলেন সেই মানুষটিকে আঁকিয়াছেন, ভক্তি-শ্রদ্ধার কোন কুয়াশা নাই, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথ অপ্রশংসার চোখে দেখিয়াছেন। আর্টিষ্টের কাছে টলসটয়ের ক্ষণিকমূর্তি অপ্রধান। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন—"যে-সত্যের গুণে টলসটয় বহুলোকের ও বহুকালের, তার ক্ষণিকমূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আচ্ছন্ন করে থাকে, তাহলে এই আর্টিষ্টের আশ্চর্য ছবি নিয়ে আমার লাভ হবে কী?" তাই প্রশ্ন উঠে—গোর্কির টলসটয় কি টলসটয়?

রবীন্দ্রনাথ যাকে ঐক্য বলেন, তাহা একের মধ্যে নয়। মানুষের পরিচয় সম্পূর্ণ, যখন সে আপনাকে যথার্থভাবে প্রকাশ করে। প্রকাশ হইল নিজের সঙ্গে অন্য সকলের সত্যসম্বন্ধ স্থাপন। অনেকের মধ্যে সম্বন্ধের ঐক্যই ঐক্য। "সেই ঐক্যের ব্যাপ্তি ও সততা নিয়েই, কি ব্যক্তি বিশেষের কি সমূহ বিশেষের যথার্থ পরিচয়। এই ঐক্যকে ব্যাপক করে, গভীর করে পেলেই আমাদের সার্থকতা।" তাই সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে প্রকাশের চেষ্টা থাকে, তার একদিকে থাকে স্বানুভূতি, অপর দিকে থাকে অন্য সকলের কাছে আপনাকে জানানো। তাই বলা যায় যে, সাহিত্য মমত্ববোধ হইতে উদ্ভূত। মমত্বের অভাব থাকিলে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করা যায় না, এবং মানুষের অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না। "মমত্বের অভাব মাহাত্ম্যেরই অভাব।" তাই সাহিত্যের রিপু হইল প্রাণের অসারতা। যে-চিত্ত প্রাণবান, তাহার দেখিবার ইচ্ছা থাকে, দেখিবার শক্তি থাকে। এই হিসাবে, সাহিত্যকে সামাজিক প্রযত্ন (social activity) বলে ধরা যায়। অসার ও সুপ্ত চিত্তের সাহায্যে সাহিত্যসৃষ্টি ব্যাপকতা ও দীপ্তি লাভ করিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের মতে, নূতনত্বে আর নবীনত্বে প্রভেদ আছে। নূতনত্ব কালের ধর্ম, নবীনত্ব কালের অতীত। সাহিত্যক্ষেত্রে যখন নূতনত্বের আস্ফালন ঘটে, তখন সেই সাহিত্য দীন। "নতুন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে।" রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাঁদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণবর্ণে সহজে নবীন। আমি সেই তরুণদের বন্ধু, তাঁদের বয়স যতই প্রাচীন হোক।" তাই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন -

> "নূতন সে পলে পলে অতীত বিলীন,
> যুগে যুগে বর্তমান সেই তো নবীন।
> তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলে নূতনের সুরা,
> নবীনের নিত্যসুধা তৃপ্তি করে পুরা।"

সাহিত্য-বিচারে বিষয়টা প্রধান নয়, রূপটা প্রধান। সাহিত্যিক যে-ভাবকে অবলম্বন করিয়া লেখেন, তার বিশেষত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টিতে ভাবের বা বিষয়ের বিশেষত্বটা গৌণ। সাহিত্যে বিষয় যখন বিশেষরূপ গ্রহণ করে, তখনই সে অপূর্বতা লাভ করে। সেখানেই সাহিত্যের কৌলীন্য। "রস-সাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম। বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে,

দর্শনে, কিন্তু রূপের গৌরব রসসাহিত্যে।" বিষয়ের গৌরব সাহিত্যের গৌরব নয়। বিষয়প্রধান সাহিত্যকে বড় স্থান রবীন্দ্রনাথ দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

"বিষয়ের বৈচিত্র্য কালে কালে ঘটতে বাধ্য। কিন্তু যখন সাহিত্যে আমরা তার বিচার করি, তখন কোন কথাটা বলা হয়েছে তার উপরে ঝোঁক থাকে না। কেমন করে বলা হয়েছে সেইটের উপরেই বিশেষ দৃষ্টি দিই। বিষয়টি যত বড়োই হিতকর বা অপূর্ব হোক না কেন যতক্ষণ সে কোনো একটা সাহিত্যরূপের মধ্যে চিরপ্রাণের শক্তি লাভ না করে ততক্ষণ কেবলমাত্র বিষয়ের দামে তাকে সাহিত্যের দাম দেওয়া যায় না। রচনার বিষয়টি কালোচিত যুগোচিত, এইটেই যার একমাত্র গৌরব তিনি উঁচুদরের মানুষ হতে পারেন, কিন্তু তিনি কবি নন,সাহিত্যিক নন।"

সাহিত্যিক হইল রূপস্রষ্টা। সাহিত্যিক রূপসৃষ্টি করিবে ভাষায় ভঙ্গীতে আভাসে, ঘটনাবলীর নিপুণ নির্বাচনে, বলা এবং না বলার অপরূপ ছন্দে। প্রয়োজনের গরজে অনেক সময় আমরা রূপকে যথার্থ দাম দিতে চাই না। সমাজে যে সমস্যা দেখা দেয়, আমরা তার সমাধান খুঁজি সাহিত্যে। তাই অনেকে সাহিত্যে বিষয় অন্বেষণ করেন, রূপসৃষ্টিকে অবান্তর বলিয়া মনে করেন, কিন্তু সাহিত্যের আসর প্রব্লেমের আসর নয়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিককে কারিগর হিসাবে গ্রহণ করেন। তাই তিনি বলেন—

"আনন্দমঠে সত্যানন্দ ভবানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীরা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের নবযুগ অবতারণ করেছেন কি না তা নিয়ে সাহিত্যের তরফে প্রশ্ন করব না; আমাদের প্রশ্ন এই যে, তাঁদের নিয়ে সাহিত্যে নিঃসংশয় সুপ্রত্যক্ষ কোনো একটি চারিত্ররূপ জাগ্রত করা হল কি না। পূর্বযুগের সাহিত্যেই হোক, নবযুগের সাহিত্যেই হোক, চিরকালের প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, হে গুণী, কোন্ অপূর্ব রূপটি তুমি সকল কালের জন্য সৃষ্টি করলে।"

বিজ্ঞান ও দর্শনে আমরা জগতকে জানি, সাহিত্যে আমরা নিজেকে জানি। এই নিজেকে জানা মানে হইল মানুষকে জানা। কোন জিনিসটা কেমন লাগে, এই প্রকাশই সাহিত্যের আত্মপ্রকাশ, কিন্তু কোনটা কী, তাহার উত্তর দেয় বিজ্ঞান বা দর্শন। সাহিত্য আদত মানুষটিকে চায়, মানবজীবনের সম্পর্ক খুঁজিয়া বেড়ায়, বুদ্ধি ও হৃদয়, বাসনা ও অভিজ্ঞতা সবার সম্পূর্ণ ঐক্য ঘটাইতে চেষ্টা করে। মানুষের খণ্ড অংশগুলি প্রচার করে বিজ্ঞান ও দর্শন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "পর্য্যবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে, চিন্তাশীল মানুষ দর্শন রচনা করে এবং সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে।

প্রত্যেক মানুষের মানুষ হওয়া প্রথম দরকার। মানুষের সঙ্গে মানুষের লক্ষ লক্ষ সম্পর্কসূত্র আছে, সেই সূত্রকে সহজ ও সবল করা মানুষের কাজ। সাহিত্য ক্ষুদ্র মানুষকে বৃহৎ করিয়া তুলিয়া, চিরস্থায়ী মনুষ্যত্বের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ যোগ সাধন করাইয়া মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতেছে। তাই, সাহিত্যের প্রথম লক্ষণ, প্রকাশ; দ্বিতীয় লক্ষণ, সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টা। সাহিত্যের যে প্রকাশ, তাহা ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও হৃদয়কে তৃপ্তি দেয়। সাহিত্যে মানুষের খণ্ড খণ্ড তত্ত্ব চাই না, চাই তার হাসি, তার কান্না, তার অনুরাগ ও বিরাগ। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "মানুষের সমস্ত সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর কোথাও থাকছে না কেবল সাহিত্যে থাকছে। সংগীতে চিত্রে বিজ্ঞানে দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই। এই জন্যেই সাহিত্যের এত আদর। এইজন্যেই সাহিত্য সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার। এই জন্যেই প্রত্যেক জাতি আপন আপন সাহিত্যকে এত বেশি অনুরাগ ও গর্বের সহিত রক্ষা করে।"

সাহিত্যে আমরা সত্য চাই না, আমরা মানুষ চাই। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সমগ্র মানুষকে গঠিত করিয়া তোলা। বিজ্ঞান খণ্ড জিনিসকে খণ্ডভাবে দেখায়। সাহিত্য যখন মানবপ্রকৃতির কোন একটা অংশ অবতারণা করে তখন তাকে একটা বৃহত্তের একটা সমগ্রের প্রতিনিধিস্বরূপে দাঁড় করায়। "নিজের সুখদুঃখের দ্বারাই হ'ক, আর অন্যের সুখদুঃখের দ্বারাই হ'ক, প্রকৃতির বন্দনা করেই হ'ক আর মনুষ্যচরিত্র গঠিত করেই হ'ক মানুষকে প্রকাশ করতে হবে।" সাহিত্যে আর সমস্ত উপলক্ষ্য। যে সকল ভাব মানুষের বৃহত্ত্বের দিকে ধাবিত, তাহাই সাহিত্যকে প্রাণদান করে। সাহিত্য তখনই শুষ্ক হয় যখনই "সর্বমানবের মহেশ্বরকে" দূরে রাখিয়া মানুষের মধ্যে ভেদবিভেদের সীমাবিভাগ করিতে ব্যস্ত হয়। সাহিত্য হইল মানবহৃদয়ের ঐশ্বর্য্য, মানবমনের বৃহত্তর দিকের বাহন।

রবীন্দ্রনাথ "নানা বর্ণে চিত্র করা বিচিত্রের নর্ম বাঁশিখানি" যাত্রাপথে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। তিনি আপন ছন্দের অন্তরালে গান বাঁধিয়া "অনন্তের আনন্দ বেদনা" লাভ করিয়াছেন, তাই তিনি বলিলেন—

> "কত যাত্রী গেল পথে
> দুর্লভ ধনের লাগি' অভ্রভেদী দুর্গম পর্বতে
> দুস্তর সাগর উত্তরিয়া। শুধু মোর রাত্রিদিন,
> শুধু মোর আনমনে পথ-চলা হোলো অর্থহীন।

গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশি কিছু
হয়নি সঞ্চয় করা, অধরার গেছি পিছু পিছু।
আমি শুধু বাঁশরিতে ভরিয়াছি প্রাণের নিঃশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিকারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্ত্রতে।

এই বিচিত্রের বাঁশীতে বৈচিত্র্য আছে। তাই আমেরিকার কবি Walt Whitman প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

> Do I contradict myself?
> Very well then, I contradict myself.
> (I am large, I contain multitudes)

নিজের আমির ভিতর বহু আমি বাস করে, তাই কবির চিত্রণে নানা বর্ণ, কবির গানে এত বিভিন্ন সুর। এই বৈচিত্র্য সাহিত্যের প্রাণ, সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রথম কথা লেখক এবং তাঁর সংস্কৃতি। শক্তিমান লেখক যখন আসেন, তখনই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হয়। লেখক তাঁর মননশক্তি হইতে আহার করেন। Blake-এর কথা মিথ্যা নয়—"It is I who see and feel. I see only what I see and feel only what I feel. My experience is mine, in its specific quality lies its significance." এই ব্যক্তিগত বিশেষত্ব সাহিত্যে প্রতিফলিত। লেখকের মনের পরিবর্তন ঘটে, সমাজের রূপের বদল হয়, কোন জিনিস চিরস্থায়ী নয়। তাই নতুন সংস্কার নতুন সংস্কৃতি বহন করিয়া আনে। Eliot "tradition"-কে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"The means by which the vitality of the past enriches the life of the present." আমাদের আধুনিক সময়ের প্রচেষ্টা হইল ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ স্থাপন করা। কিন্তু এই সম্বন্ধ-স্থাপনের প্রচেষ্টায় লেখকের ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা অসঙ্গত হইবে। মনের যেখানে খেলা, বিভিন্ন প্রেরণা সেখানে থাকিবেই। Lawrence বিশ্বাস করেন—"It is the way our sympathy flows and recoils that really determines our lives." তাই প্রথম প্রয়োজন চিত্তের জাগরণ ও মনের প্রসারণ। রবীন্দ্র-সাহিত্য এই জাগরণ ও প্রসারণকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। Eliot বিশ্বাস করেন—"The number of people in possession of any criteria for distinguishing between good and evil is very small." তাই জনতার পথে চলিলে

সাহিত্যিকের চলিবে না—নিজের সজাগ মন দিয়া জনতার মনকে স্পর্শ করিতে হইবে, তাহাকে সচেতন করিতে হইবে। গন্তব্য স্থান নির্ণয় করা লেখকের কাজ নয়; তাঁর সাহিত্য ততখানি সার্থক যতখানি তিনি লোককে পথ-চলার শক্তি ও আনন্দ দিতে পারিবেন।

এই মনের মন্দিরে সাহিত্যিকের সাধনা চলে। পৃথিবীতে বিভিন্ন রস আছে, বিভিন্ন বর্ণ আছে। সমস্তই তাহার কাছে সত্য। সে এই পৃথিবীতে আসিয়াছে তাকে পরিবর্তন করিবার জন্য নহে, তাকে সস্নেহে গ্রহণ করিয়া নিজের বিশিষ্টতা দান করিবার জন্য। সাহিত্যিক প্রচারক নয়, সাহিত্যিক স্রষ্টা। তাই Michelangelo বলেন—"One paints not with hands but with brain." Leonardo de Vinci সেই কথাই স্বীকার করেন যখন তিনি বলেন—"The minds of men of loft, genius are most active in invention when they are doing the least external work." Croce তাঁর Esthetic-গ্রন্থে বলিয়াছেন—"Art is ruled uniquely by the imagination. Images are its only wealth. It does not classify objects; it does not pronounce them real or imaginary, does not qualify them, does not define them; it feels and presents them—nothing more." মানুষ শিল্পী যখন ভাবনা তাকে উতলা করে; মানুষ প্রচারক যখন সে যুক্তি করে, তর্ক করে এবং বিশেষ মত প্রচারণে নিজেকে নিযুক্ত করে। বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ এগিয়ে চলে, কিন্তু সাহিত্যিকের এক সহজ প্রবৃত্তি আছে। সে প্রথম নিজেকে জানে, এবং সেই অন্তর্দর্শনের সাহায্যে বাহিরের জগৎকে দেখে। সাহিত্যিকের কাছে তার মনোজগৎ ও তার মানসতা সবচেয়ে বড় জিনিস, সাহিত্যিকের স্বজ্ঞা (intuition) তাহাকে বিকাশ করে—যুক্তিবিদ্যা তার সত্তা প্রকাশের পক্ষে বড় সহায়ক নয়। Shelly-র কথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন—"A man to be greatly good must imagine intensely and comprehensively." যে সাহিত্য, যে-চিন্তন, যে-দর্শন, মানুষের অগ্রসরণের পথে সহায়ক, তাহাই মানুষের কাছে দামী ও প্রিয়।

যাঁহারা সাহিত্যের ভিতর উগ্র আধুনিকতা বা বিশুদ্ধ বাস্তবতা অন্বেষণ করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশংসা করেন। মার্কস-এর দর্শন সমাজ ব্যাখ্যান করিবার জন্য নহে, সমাজ পরিবর্তন করিবার জন্য। মার্কসীয়

দর্শনের প্রথম কথা—"The philosophers have merely interpreted the world variously; the real question is to change it." তাই মার্কসীয় দর্শনে পক্ষপাতিতা আছে। যে-ব্যবস্থা অহিতকর, মার্কসবাদী সেই ব্যবস্থা পরিবর্তন করিতে চান। এবং পরিবর্তন করিতে হইলে যে-সংঘাত অবশ্যম্ভাবী তাহাকে শুধু গ্রহণ করিতে হইবে তা নয়, তাহার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে হইবে। তাঁহার দর্শনে নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের আশ্লেষ আছে। আর কোন দার্শনিক চিন্তাক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রকে একীকরণ করিয়া একটা বিরাট ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দেন নাই। তাই মার্কস দলপতি, দলের প্রাধান্য স্বীকার করেন, শ্রেণীসংঘাত অবশ্যম্ভাবী বলিয়া গ্রহণ করেন, এবং গণকল্যাণকে বিশ্বের কল্যাণ বলিয়া বিশ্বাস করেন। শুধু বিশ্বাসই মার্কসীয় দর্শনে বড় কথা নয়— সেই বিশ্বাসকে সজাগ প্রচেষ্টাদ্বারা ফলবান করিবার ভারও মার্কসবাদীগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

মার্কস-এর মতে, ব্যক্তির নিছক ব্যক্তিগত সত্তা নাই। ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তার চিন্তন ও মনন-ধারা এই যে, বস্তুজগতে ও সামাজিক জগতে মানুষ উৎপাদনের যন্ত্র। নিজেকে বাঁচাইতে হইলে তাহার অপরের সঙ্গে মিলিতে হইবে, নতুন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। এটা প্রয়োজনীয়, এটা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয়। এই উৎপাদনের প্রথা ও রীতি সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো সৃষ্ট করে। এই কাঠামোর উপর আইনের ও রাজনীতির কাঠামো সৃষ্টি হয়। সমাজে মানুষ উৎপাদক, এটা হইল গোড়ার কথা। এই উৎপাদনের যে ধরন, তাহা মানুষের চেতনাকে রূপ দেয়। মার্কসীয় দর্শনে তার গোড়ার কথা হইল—

"The mode of production in material life determines the social, political and intellectual life-process in general. It is not the consciousness of men that determines their being, but, on the contrary their social being that determines their consciousness."

এই জড়বাদিক ব্যাখ্যা হইতে মার্কস এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, যুগে যুগে সামাজিক সম্বন্ধ পরিবর্তিত হয় উৎপাদনের রকমফের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু সংঘাতে যে নতুন সমাজ সৃষ্ট হয় তাহা প্রাচীন সমাজ হইতে উদ্ভূত। মার্কস তাই বলেন—"New highest relations of production never appear before the material conditions of their existence have matured in the womb of the old society itself"

সাহিত্য বিচারে মার্কসীয় দর্শনের মোটা সিদ্ধান্তগুলি আমাদের স্মরণ রাখা দরকার।

প্রথম—ব্যক্তির ধারণা, অনুভূতি ও চেতনা জড়জগত ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত। জড়জগতে যে-ভাবে কাজ করি, যে-ভাবে মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করি, তাহারই প্রভাব মনের জগতে আসিয়া পড়ে। মানুষ তার অনুভূতি ও চেতনাকে সৃষ্টি করে, এবং মানুষ গড়িয়া ওঠে সামাজিক ও ব্যবহারিক জগতের চাপে।

দ্বিতীয়—ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক বিধান। মানুষ কি ভাবে জীবন ধারণ করে, এবং জীবনধারণের ব্যবস্থা করিতে গিয়া একজন আর একজনের সঙ্গে কি ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করে, ইহা জাতির উন্নতির পথে একমাত্র প্রেরণা নহে, কিন্তু এই ভাণ্ডারকে আশ্রয় করিয়াই ব্যক্তির বুদ্ধি, বোধ ও চেতনা নানারূপে রূপায়িত হয়।

তৃতীয়—এই জড়জগতে মানুষ এক সজাগ, সচেতন জন্তু। সাধারণ জন্তু—সেও নির্মাণ করে নিজের জন্য বা নিজের সন্ততির জন্য। এই নির্মান একচোখো। মানুষ সৃষ্টি করে পরের জন্য, বিশ্বের জন্য। অর্থাৎ জন্তু নির্মাণ করে প্রয়োজনের চাপে; কিন্তু মানুষ সৃষ্টি করে দৈহিক প্রয়োজনের বাহিরেও। মার্কস একথাও স্বীকার করিয়াছেন—"Man also creates according to the laws of beauty."

চতুর্থ—শিল্পে ও সাহিত্যে, এমন লক্ষণও দেখা যায় যে, সাধারণ উন্নতির সঙ্গে সাহিত্যের উন্নতির কোন গভীর যোগ নাই, অর্থাৎ, বাঁচিবার প্রণালী অনুন্নত থাকিলেও সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব হয়।

একটি কথা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সমাজ-চেতনার উপর জড়জগতের যতটা প্রভাব, সাহিত্যের উপর ততটা প্রভাব থাকে না। ব্যক্তি জড়জগতের জীব হইলেও জড়জগতের উর্দ্ধে উঠিয়া সে তার সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে। ব্যক্তি নিজের কথাও ভাবে, পরের কথাও ভাবে—প্রয়োজনকেও স্বীকার করে, প্রয়োজনের অতীত যে জগৎ আছে, তাকেও স্বীকার করে। মার্কস তাই একথা কখনও বলেন না যে, সাহিত্য মার্কসবাদের বাহন হইবে।

সাহিত্য-বিচার সম্বন্ধে মার্কসবাদী Frederick Engels এর মত সংক্ষেপে দিলাম—

(1) Realism, to my mind, implies, besides truth of

detail, the truthful reproduction of typical characters under typical circumstances.

(2) The more the author's views are concealed, the better for the work of art.

(3) I am not at all an opponent of tendentious poetry as such. But I think that the bias should flow by itself from the situation and action. The writer is not obliged to obtrude on the reader the future historical solutions of the social conflicts pictured.

Balzac সম্বন্ধে Engels বলেন যে, তাঁহার দরদ ফরাসী উচ্চশ্রেণীর উপর থাকিলেও তিনি সেই ঘুণধরা সমাজের যে নিখুঁত চিত্র দিয়াছেন তার জন্য তাঁকে প্রধান বাস্তববাদী সাহিত্যিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়। Frederick Engels-এর নিম্নলিখিত মতও প্রণিধানযোগ্য—

"A socialist-biased novel fully achieves its purpose, in my view, if by conscientiously describing the real mutal relations, breaking down conventional illusions about them, it shatters the optimism of one bourgeois world, instils doubt as to the eternal character of the existing order, although the author does not offer any definite solution or does not even line up openly on any particular side."

মার্কসদর্শনের লক্ষ্য ও লক্ষ্যণীয় হইল—

(ক) যাহা কল্যাণকর, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

(খ) সমাজে গণদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

(গ) এই গণসমাজের রূপায়ণে বিদ্রোহ, সংঘাত ও ঝাঁকানি সব কিছুর ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।

(ঘ) এই গণসমাজ রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয় এবং এই রাষ্ট্রবিধানে দলের অধিনায়কত্ব পদে পদে মানিয়া লইতে হইবে।

(ঙ) মার্কসীয় দর্শনে ব্যক্তি সমাজের অঙ্গ এবং দলের পুতুল।

(চ) এই দলবোধ প্রধান বলিয়া মার্কসীয় দর্শনে লঘিষ্ঠসংখ্যার সাহায্যে গরিষ্ঠ সংখ্যার হিতে সমাজের আমূল পরিবর্তন মার্কসীয় দলের নিকট প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা এবং করণীয় আদর্শ।

(ছ) রাষ্ট্র যেখানে পূজ্য, রাষ্ট্রশাসক সেখানে চরমশক্তির আধার। এবং রাষ্ট্রশাসনে রাষ্ট্রশাসকের দল যেখানে সর্বদর্শী, সেই দলের বিরুদ্ধতা করা মার্কসীয় দর্শনে সর্বনাশী চেষ্টা এবং অননুমোদিত প্রয়াস। তাই, দলই একমাত্র সর্বেশ্বর এবং সর্বশক্তিমান দলপতিকে অনুসরণ ও অনুকরণ করা অগ্রগতি ও প্রগতির নমুনা।

মার্কসীয় দর্শনের এই লাক্ষণিক বৃত্তি প্রণিধানযোগ্য। এই দর্শনের ঝোঁক কর্মের প্রতি, মনোবৃত্তির প্রতি নহে। সাহিত্যিকের কাছে এই বস্তুজগৎ প্রধানত মনোময় অর্থাৎ ভাবের জগৎ। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর উদ্ধৃত মত হইতে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সাহিত্যের ধর্ম বা প্রাণ প্রচারণে নয়। সত্যকে বলিবার শক্তি, বুঝিবার শক্তি এবং তাহা হৃদয়ের রসে ভরিয়া দেওয়া সাহিত্যিকের কাজ। তার সাধনা ও কর্মবীরের সাধনা, এক নয়। যে সাহিত্যিক কোন বিশেষ দলের মোক্তার, তার বাজারদর দলের কাছে যত বেশিই থাকুক না কেন, সাহিত্যের আসরে তার স্থান সংকীর্ণ। সাহিত্যের মন্দিরে দ্বৈতবাদের স্থান স্বল্প। মানুষের চেতনাকে সজাগ করিয়া রাখা, সমাজের অবক্ষয়-গতিকে বাধা দেওয়া, ব্যক্তির ব্যথা ও বেদনাকে মূর্তি দেওয়া, কল্যাণকর প্রয়াসকে স্বীকার করা, ও দেশগত, সমাজগত, ব্যষ্টিগত, ব্যক্তিগত অহমিকাকে অপনয়ন করিয়া অন্তর্বেগকে বিশ্বমুখী করা, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সত্তাকে একত্ববোধের দিকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া—ইহা হইল সাহিত্যের কাজ। তাই জার্মান কবি গেটে বলেন—

> "Nature has left us tears, the cry of pain
> When man can bear no more, and most of all
> To me, she has left me melody and speech
> To make the full depth of my anguish known;
> And when man in his agony is dumb
> I have God's gift to utter what I suffer."

ইংরাজ কবি শেলী বলিয়াছেন—

> The loathsome mask has fallen, the man remains
> Sceptreless, free, uncircumscribed, but man
> Equal, unclassed, tribeless and nationless,
> Exempt from awe, worship, degree, the king
> Over himself."

রবীন্দ্রনাথ স্বর্গ হইতে বিদায় মাগিয়াছেন, কারণ তাহা "শোকহীন, হৃদিহীন, উদাসীন"। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"থাকো, স্বর্গ, হাস্যমুখে—করো সুধাপান,
দেবগণ, স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান,
মোরা পরবাসী, মর্ত্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দুদণ্ডের তরে।"

"এবার ফিরাও মোরে" কবিতায়, রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"সে বাঁশিতে শিখেছি যে স্বর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীতে
কর্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্তের তরে—দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।"

"প্রেমের অভিষেক" কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ নিখিল প্রণয়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

অয়ি মহীয়সী মহারাণী,
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান। আজি
এই যে আমারে ঠেলি চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগসুধাপানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর।

এই একই সুরে আইরিশ কবি ইয়েটস গাহিয়াছেন—

Sing on : somewhere, at some new moon
Wi'll learn that sleeping is not death,
Hearin?? the whole earth change its tune.

মোট কথা, সাহিত্যের কাজ দলের বা মতের প্রচারণ নয়। সমস্তাসমাধানের দায়িত্ব সাহিত্যিকের নয়। গতিশীল সমাজের বেগবান প্রাণের বিকাশন সাধন করা হইল সাহিত্যের ধর্ম—শাসক সম্প্রদায় তাহাতে আহত হইলেন কি ব্যাহত হইলেন, সেই কথা প্রধান নয়। তাই রাজনীতি বা অর্থনীতি সাহিত্যের প্রাণ নয়, সাহিত্যের কাজ হইল প্রাণসঞ্চার ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা। যে প্রাণায়ামের সাহায্যে ব্যক্তি মানবত্ব লাভ করে, তাহারই সাধনায় সাহিত্যিক নিমগ্ন থাকে।

যে-সাহিত্যে গতি আছে, যে-সাহিত্যে নিত্যকালীন আদর্শ আছে, সে সাহিত্য বুর্জোয়া সাহিত্য বা প্রোলিটারিয়ান সাহিত্য বলিয়া গণ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যে এমনতর শ্রেণীবিভাগ করা উচিত নয়। তবুও মার্কসবাদীগণ সাহিত্য বিচারে মার্কসীয় দর্শনের সংজ্ঞাকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থান দিতে সংকোচ করেন না। ক্রাইষ্টোফার কডওয়েল-এর মত এসম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য। বুর্জোয়া সাহিত্যিকদের তিনি তিন স্তরে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম—যাঁরা গণ-জাগরণের বিরুদ্ধবাদী, যাঁদের দৃষ্টি পিছনের দিকে, সম্মুখের দিকে নয়। দ্বিতীয়—যাঁরা সমাজের মঙ্গল কামনা করেন, সমাজের অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান, আচার, কামনা সব অস্বীকার করেন, সমাজের প্রগতির সব অন্তরায় ভাঙিয়া দিতে চান, অথচ নতুন কিছু ব্যবস্থা ও সমাধানের জন্য আকুতি প্রকাশ করেন না। তৃতীয়—যাঁরা জনগণের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করেন। এই আত্তীকরণ যেখানে ঘটে, সেখানে বুর্জোয়া সাহিত্য গণ-সাহিত্যের আসন লাভ করে, যাকে আমরা প্রোলিটারিয়ান সাহিত্য বা কম্যুনিস্ট সাহিত্য বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকি। জনগণের সঙ্গে যে সাহিত্যিকদের সংযোগ আছে, তারাও বিদ্রোহী, কিন্তু সেই বিদ্রোহে ভাঙনের গান থাকে, কিন্তু নবসমাজের পরিকল্পনা থাকে না। কিন্তু যাঁরা প্রোলিটারিয়ান সাহিত্যিক, তাঁহারা গণের সঙ্গে মিশিয়া, গণবোধকে সজাগ রাখিয়া গণতন্ত্র স্থাপনের প্রয়াস করিবেন। একথা যদি সত্য হয় (যাহা মার্কসবাদীদের মতে সত্য) যে মনের চিন্তা, প্রাণের অনুভূতি, হৃদয়ের চেতনা সমাজের বাঁচিবার ও থাকিবার বিধানের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত, তাহা হইলে চিন্তা-প্রবাহ প্রোলিটারিয়ান জীবনের প্রবাহ হইতে বিমুক্ত নয়। যে-সাহিত্যে এই যোগাযোগকে অস্বীকার করা হয়, তাহা পঙ্গু, তাহা বুর্জোয়া, তাহা অসম্পূর্ণ, তাই সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের যোগ সাধন হওয়া প্রয়োজন। এবং সাহিত্য তখনই জাগ্রত, যখন এই ব্যবহারিক জীবন যে চেতনা সৃষ্টি করে, সেই চেতনা যখন সাহিত্যে মূর্তি পায়, তখনই তাহা জীবনের তথ্য ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবন যে চেতনা

সৃষ্টি করে, সেই চেতনা যখন সাহিত্যে মূর্ত্তি পায়, তখনই তাহা প্রোলিটারিয়ান সাহিত্য। প্রোলিটারিয়ান-এর ব্যবহারিক জীবন বুর্জোয়া চেতনার সাহায্যে প্রতিফলিত হয় না। কডওয়েলের মতে—

In bourgeois art man is conscious of the necessity of outer reality but not of his own, because he is unconscious of the society, that makes him what he is. He is only a half-man. Communist poetry will be complete, because it will be man conscious of his own necessity as well as that of outer reality."

কডওয়েলের মতে শিল্পীর কাছে কোন পক্ষপাতিত্বহীন জগত নাই। শ্রেণীবোধ সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর। এই শ্রেণীহীন শিল্প কম্যুনিষ্ট সাহিত্যেই পাওয়া যায়। তাই কডওয়েল বলেন—

"There is no classless art except communist art, and that is not yet born; and class art today, unless it is proletarian, can only be the art of a dying class."

কিন্তু সাহিত্যে চলিবে মানুষের অভিসার, চিত্তের সংযোগে যে চিত্তের জাগরণ, রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যে তাহাই বিত্ত। মানুষের অভিসার ব্যবহারিক জগতকে গ্রহণ করা নয়, অন্নবস্ত্রের জগতে যে পাওয়া ও না-পাওয়ার খেলা চলে, তাহার সামঞ্জস্য সাধন করা। T. S. Eliot সেই কথাই বলেন—

"And we must extinguish the candle, put out the light and relight it.

For ever must quench, for ever relight the flame."

মানুষ নিঃসঙ্গতা পছন্দ করে না। মানুষের পরিচয় মানুষের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনে। মানুষের যে মননশক্তি, মানুষের যে অন্তরজগৎ, তাহা বাহিরের সমাজ হইতে রসগ্রহণ করিলেও তার আত্মজগতের রসে ভরপুর থাকে। এই ব্যাখ্যান মার্ক্সীয় ব্যাখ্যান হইতে বিভিন্ন। মানুষ যখন একা, সে তখন বন্দী, তার স্বাধীনতা মানবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে। বিজ্ঞান বাহিরের জগত সম্বন্ধে সচেতন করাইয়া দেয়, তাই বিজ্ঞানও সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত। সাহিত্য মানুষের অনুভাবনার সম্বন্ধে সচেতন করাইয়া দেয়, তাই সাহিত্যও সমাজের সঙ্গে সূত্র স্থাপন করিতে বাধ্য। কারণ মানুষের ব্যবহারিক অনুভাবনা জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাই, মার্কসবাদীদের মতে, আর্থিক ব্যবস্থা যত উন্নত, সভ্যতা ততখানি উন্নত ও

মুক্ত। এই ব্যাখ্যানের পরিণতি হইল কর্মে, মননশক্তিতে নয়। তাই, মার্কসবাদী কর্মবীরকে বরণ করেন, সাহিত্যিককে নয়। তাঁরা ঘোষণা করেন, যাঁরা সমাজের বিবর্তনে ও পরিবর্তনে সাহায্য না করেন, তাঁরা সামাজিক ব্যবস্থার সংরক্ষণের সহায়ক। এই পরিবর্তন-বিরোধী লোকদের প্রতি মার্কসবাদীর অবজ্ঞা অত্যন্ত গভীর। অর্থাৎ কর্মবীর তাঁদের প্রধান পুরোহিত।

মানুষ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। তার চলিতে হইবে, কর্ম করিতে হইবে, নতুন বিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাই মার্কসবাদী বলেন—"He can never choose between action and inaction, he can only choose between life and death." তাই যে প্রচারণে মানুষকে কর্ম্মবীর না করে, সেই প্রচারণ তার কাছে মিথ্যা, অলীক। অর্থাৎ তাঁরা মানুষের ক্ষণিকমূর্তিকে প্রধান স্থান দিয়াছেন বলিয়াই সাহিত্যকে প্রচারপন্থী করিয়াছেন। মার্কসবাদী অবজ্ঞার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন—"In a world where thought rules and action must hold its tongue, how can the issue ever be resolved?" কিন্তু সাহিত্যিকের কাজ আপনার জীবনের দশদিক উন্মুক্ত করিয়া নিখিলের সমগ্রতাকে আপনার অন্তরের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া নিয়া একটি বৃহৎ চেতনার সৃষ্টি করা। সাহিত্যিকের কাজ দলগত সমাধানের পথে নিজেকে উন্মত্ত করা নয়। এই কথা সাহিত্যিকের জানিতে হইবে যে, উন্মাদনার সাহায্যে কোন বৃহৎ কাজ সাধন করা যায় না এবং মানবের হাসি-কান্নাকে নিজের অন্তরের রস দিয়া ব্যাপ্তি ও দীপ্তি দান করিতে হইবে। সাহিত্যের মূল সুর বিচিত্র সুরের ঐক্যসাধন করা। এই ঐক্য-সাধনের সেতু মিলনসাধনা।

মার্কসবাদী বলেন, কর্মযোগে যাঁরা মননশক্তিকে অস্বীকার করেন, তাঁরা ফ্যাসিষ্ট; যাঁরা চিন্তনকে কর্ম হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখেন, তাঁরা বুর্জোয়া। যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, এই ব্যবহারিক জগৎ মানুষের উপলব্ধি-শক্তিকে প্রাণ দেয় এবং সেই অনুভূতি কর্মকে বাহন করিয়া সমাজের বিবর্তন ও পরিবর্তন আনে এবং কর্মজগতকে প্রধান স্থান দেয়, তারা মার্কসিষ্ট। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্র চিন্তনক্ষেত্র নহে, কর্মক্ষেত্র নহে, এর ক্ষেত্র হইল মানুষের নিত্যরূপ ও শ্রেয়রূপ প্রকাশ আত্মীকরণের দ্বারা।

মার্কসীয় ব্যাখ্যাতাগণ "Art for art's sake" ব্যাখ্যানকে বিদ্রূপের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন। মানুষকে বাদ দিয়া, সমাজকে অস্বীকার করিয়া সাহিত্যের

কোন কাজ নাই। তাঁহাদের মতে, সাহিত্যের ধর্ম হইল মানুষকে সচেতন করা, মানুষের কল্যাণকর পথকে বিস্তৃত করা। Chernyshevsky-র সাহিত্য-বিচার মার্কস-পন্থীদের নিকট বরণীয়। তাঁর মতে "Reproduction of life is the general characterestic feature of art and constitutes its essence. Works of art often have another purpose, viz., to explain life; they often also have one purpose of pronouncing judgment on the phenomena of life." তাঁহার মতে, সাহিত্যিকের কাজ ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তোলা। এই ভবিষ্যৎ কল্পনার দিকে সাহিত্যিকের দৃষ্টি থাকে বলিয়াই Plekhanov তাঁর Art and Social Life গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, যাঁহারা প্রোলিটারিয়টের জন্য সাহিত্য রচনা করেন না, তাঁহারা অসার্থক। বুর্জোয়ার সংখ্যা কম, প্রোলিটারিয়টের সংখ্যা বেশী। এই অধিকসংখ্য প্রোলিটারিয়টের স্বার্থে সাহিত্য রচনা করিতে হইবে। Plekhanov সাহিত্যিক Knut Hamsunকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, কারণ Knut Hamsun বুর্জোয়া সমাজের গৌরব ঘোষণার চেষ্টা করিয়াছেন। Plekhanov বলেন—"Knut Hamsun bases his play on an idea which is quite contrary to reality. Knut Hamsun has great talent. But no talent can make truth out of its direct opposite." Plekhanov-এর দৃষ্টি প্রচারকের দৃষ্টি, সাহিত্যিকের দৃষ্টি নয়। তাই Plekhonov বলিতে পারিয়াছেন—"When a talented artist is inspired by a false idea he spoils his own work. And no modern artist can be inspired by true ideas if he is seeking to defend the bourgeoisie in its struggle against the proletariat."

Soviet সাহিত্যিকদের গর্ব যে, "Our literature has built and has fought." কিন্তু সেখানেই কি সাহিত্যের যথার্থ সার্থকতা? এই প্রশ্ন সোভিয়েট সাহিত্য সমালোচকদের মনেও জাগিয়াছে। "The period of maturity is arriving for soviet literature. Uptil now it was strong chiefly because of the deeds it objected. Now it must become strong by depicting the people who accomplish those deeds."

আমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে দুইটি নতুন ধারা আসিয়াছে—একটি হইল যন্ত্রের অধিনায়কত্ব, এবং আর একটি হইল রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিসর্জন। যেখানে যন্ত্র প্রধান, সেখানে মানুষের স্থান নীচে। এবং যেখানে রাষ্ট্র একমাত্র প্রভু, সেখানে ব্যক্তি শুধু রাষ্ট্রশাসিত নয়, রাষ্ট্রচালিত। তাই যে যুগে কল্যাণের সঙ্গে ব্যক্তির যোগ অল্প, সাহিত্যের স্থান সেখানে সংকীর্ণ। এই ব্যক্তিকে ঘিরিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। তার বেদনা, তার আশা ও আকাঙ্খা, তার স্বপ্ন, তার কল্যাণ চেষ্টা, তার গতি ও প্রগতি, রবীন্দ্র-সাহিত্যে বড়স্থান অধিকার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্যের অবলম্বন এই ব্যক্তি। এই ব্যক্তি যেখানে পঙ্গু ও অপ্রধান, সেই যুগে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জিজ্ঞাসা বর্ণহীন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু সেই সাহিত্য-জিজ্ঞাসাতেই চিরন্তন সাহিত্যধর্ম ব্যাখ্যাত আছে। ব্যক্তিকে অশ্রদ্ধা করিলে চিরন্তন সাহিত্য গড়িয়া তোলা কঠিন। সাহিত্যের প্রাণ হইল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, এবং সাহিত্যের ধর্ম হইল এই ব্যক্তির গতি ও প্রগতির ইতিহাস রচনা করা। তাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জিজ্ঞাসার ইঙ্গিত মানিতে হইলে এই কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্যক্তিকে অস্বীকার করিয়া শুধু যন্ত্র ও রাষ্ট্রকে মানিয়া লইলে সাহিত্য-রচনার ধর্ম হইতে বিচ্যুতি ঘটিবে। এই ব্যক্তিতন্ত্রবাদকে সমর্থন করিয়া সাহিত্যিক ও শিল্পীর সপক্ষে কবি W. H. Anden যে অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য—

"Most poets in the west believe that some sort of democracy is preferable to any sort of totalitarian state and accept certain political obligations, but I cannot think of a single poet of consequence whose work does not, either directly, or by implication codemn modern civilisation as an irremediable mistake, a bad world which we have to endure because it is there, and no one knows how it could be made into a better one, but in which we can only retain our humanity in the degree to which we resist its pressure. Poetry to take an interest in and be capable of dealing with a subject, the latter must possess three qualities: personality, power, and virtue or wickedness. Thus, to be a poetic hero, a man must intend to do something and be able to do it. But the machine divorced power from person: nature becomes an impersonal slave, but the slave

not of this or that person, but of man in general, the impersonal collective. The good or evil a man can do depends not on the intensity of his intention but the power of the machines which carry out his intention for him. If the attitude of poets towards our civilisation is purely negative, this is mainly because they know that poetry can do nothing to solve the problems of a machine culture, and the people who might be able to do so seem hardly aware that these problems exist."

ইংরেজ কবি Auden-এর বাচন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জিজ্ঞাসার প্রাণধর্মকে প্রকাশ করিয়াছে। যে সভ্যতায় ব্যক্তি নিষ্পেষিত এবং যন্ত্রের বাহনমাত্র, সেই সভ্যতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রদর্শনের জিহাদ ঘোষণা রহিয়াছে। Auden সেই জিহাদের প্রয়োজনীয়তাকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

রবীন্দ্র-কাব্যের ভূমিকা

কাব্যের মাল-মশলা কবির নিজের অভিজ্ঞতা। কবির ধর্ম ব্যাখ্যা করা নয়, তাঁহার অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা। কবির প্রধান অবলম্বন vision—এই vision যাঁহার নাই, কবি-ধর্ম তাঁহার নাই। কিন্তু vision-ই সব নয়—লোকের অন্তরে এই ক্ষণিক vision-কে চিরস্থায়ী করিতে হইলে তাঁহার প্রকাশের শক্তি থাকা চাই। আপনাকে জানো, এই কথাটাই কবির কাছে শেষ কথা নয়, আপনাকে জানাও, এটাই তাঁহার কাছে বড় কথা। এই জানাইতে হইলে তাঁহার ঐশ্বর্য থাকা চাই—ভাবের ঐশ্বর্য, ভাষার ঐশ্বর্য। চিত্রকরের কল্পনার যেমন প্রয়োজন, তুলিরও তেমনি প্রয়োজন; গায়কের সুরবোধ থাকা যেমন প্রয়োজন, কণ্ঠের মাধুর্যেরও তেমনি প্রয়োজন।

মানুষ শুধু প্রয়োজনের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়, সে গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নিজের বন্ধন হইতে মুক্তি চায় এবং এই মুক্তি লাভ করিবার ঐশ্বর্য তাহার অন্তরে বিরাজ করে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন,

'Man has a fund of emotional energy which is not all occupied with his self-preservation. This surplus seeks its outlet in the creation of art, for man's civilisation is built upon his surplus—'(Personality).

একথা ঠিক যে, কবির ভাব, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা তাঁহার কাব্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার প্রকাশ বা বিকাশ যথার্থ কাব্য হইতে হইলে তাহাতে কিছু বিশেষত্ব থাকিবার প্রয়োজন আছে। জীবন ও কাব্য এক নয়—তাই সমস্ত অভিজ্ঞতাই কাব্যে স্থান পায় না, অথবা সমস্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলেই তাহা কাব্যের রূপ ও রস পায় না। একথা সত্য,

'It is the honourable characteristic of poetry that its materials are to be found in every subject which can interest the human mind'—(Wordsworth).

কিন্তু অভিজ্ঞতার যথার্থ প্রকাশই কাব্য নয়। কোন অভিজ্ঞতা প্রকাশের সময় যে-ভাব উদিত হয়, যে-অনুভূতি ও দরদ সৃষ্ট হয়, যে-স্মৃতি জাগরিত হয় এবং যে-পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, এই সমগ্রতার প্রকাশই কাব্যের ধর্ম। তাই

'Poetry and life differ, just as coal and diamonds differ, though the basis of both is exactly the same substance.'

সংস্কৃত আলংকারিকেরা বলেন যে, * 'কাব্যের আত্মা হচ্ছে তার বাচ্য নয়, ব্যঞ্জনা; কথা নয়, ধ্বনি।' এই ব্যঞ্জনা হইল রসের ব্যঞ্জনা, এই ধ্বনি হইল রসের ধ্বনি। কাব্যের রসগ্রহণ করিতে হইলে আস্বাদনের শক্তি থাকা চাই।

কাব্যের রসই যদি প্রধান হয়, তাহা হইলে তাহার বস্তু ও অলংকার গৌণ। অলংকারের বা বাস্তবতার আতিশয্য কাব্যের রসকে আঘাত করিলে, তাহা বর্জনীয়। 'কাব্যের লক্ষ্য রস; শব্দ, বাচ্যরীতি, অলংকার, ছন্দ—তার উপায়।'

অনেকে বলেন যে, কবির অভিজ্ঞতা তাঁহার নিজস্ব—তাঁহার প্রকাশভঙ্গি একান্তই তাঁহার নিজের; সাধারণ পাঠকের সেইদিকে উৎসাহ বা দৃষ্টি থাকিবার হেতু নাই। অতএব কাব্যের পাঠকগোষ্ঠীর সংখ্যা নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ, সর্বসাধারণের তাহাতে কোন যোগ নাই। তদুপরি কোন বিশেষ সময়ের, বা বিশেষ যুগের ও বিশেষ ভাবের অভিজ্ঞতার বিশেষ রূপ সকলকে আকৃষ্ট করিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী †। বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কি রাগিণী বাজাইতেছে, সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কবি নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করিতে চায়—বহু মনকে আয়ত্ত করা, বহু মনের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করা কবির বিশিষ্টতা। এই অমরত্বের দাবি

---

* 'কাব্য-জিজ্ঞাসা'—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। আলঙ্কারিকেরা নয়টি প্রধান ভাব স্বীকার করেন—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম। এই নয়টি ভাব কাব্যের 'বিভাব,' 'অনুভাব'-এর সংস্পর্শে যথাক্রমে নয়টি 'রস'-এ পরিণত হয়—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত। উক্ত নয়টি 'ভাব' ছাড়া আরো অনেক ভাব আছে, সেই সব ভাব 'সঞ্চারী' বা 'ব্যভিচারী' ভাব, যথা—লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিষাদ প্রভৃতি। কারণ এই সব ভাব মনে স্বতন্ত্র থাকে না, কোনও-না-কোনও স্থায়ী 'ভাব'-এর সম্পর্কে এই সব ভাব মনে যাতায়াত করে। স্থায়ী ভাবের পরিণতিই রস, বাকীগুলি 'সঞ্চারী'-রস।

† 'A true artist knows how to elaborate his day-dreams so that they lose that personal note which grates upon strangers and becomes enjoyable to others; he knows how to modify them sufficiently so that their origin in prohibited sources is not easily detected. When he can do all these he opens out to others the way back to the comfort and consolation of their own unconscious source of pleasure, and so reaps their gratitude and admiration." Freud-এর 'Introductory Lectures on Psycho-analysis.'

আছে বলিয়াই সে জ্ঞানের কথা প্রচার করে না, ভাবের কথা প্রচার করে। এই ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।" 'সাহিত্য' পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

"যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাহা আকারে-প্রকারে, ভাবে-ভাষায়, সুরে-ছন্দে মিলিয়া তবেই বাঁচিতে পারে—তাহা মানুষের একান্ত আপনার—তাহা আবিষ্কার নহে, অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি।......অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষায়, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।"

কিন্তু একথাও ঠিক যে. পাঠক কবির সহধর্মী না হইলে কাব্যের রসাস্বাদ গ্রহণে অন্তরায় ঘটে। কাব্যের কাব্যত্ব বিচার পাঠকের রুচি দিয়া সম্ভব নয়। কাব্যের বিচার করিতে হইলে কাব্যের ভিতর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়, রসগ্রহণে সহানুভূতি স্থাপন করিতে হয় এবং নিজের প্রাণের ভিতর কাব্যের সাহায্যে নূতন দীপ জ্বালাইয়া সমস্ত পথ-ঘাট অনুসন্ধান করিয়া লইতে হয়—এই ভাবে কাব্যের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া নূতন ভাবে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া কাব্যের কাব্যত্ব বিচার করিতে হয়। কবি যেখানে কাব্য সৃষ্টি করেন এবং সহৃদয় পাঠক যখন তাহা পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন, তখন তাঁহাদের উভয়ের মানস ব্যাপারের মধ্যে একটা 'সাধারণীকরণ' বিদ্যমান থাকে। কবি কিংবা পাঠকের স্বকীয় মর্ত্যলোক যখন কাব্যলোকের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়, তখন সেই নিমগ্নতার মধ্যে তাহার সাংসারিক স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের পার্থক্য ও ভেদ যে পরিমাণে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে তিনি কাব্যরসের সম্ভোগে অধিকারী হন। এই সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দেওয়ার নাম ব্যক্তিত্ব বিসর্জন বা সাধারণীকরণ। * যেখানে সহানুভূতি নাই, 'বাসনা † নাই, ভাব ও

---

* ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—'কাব্যানন্দে বিষয়ানন্দ,' উদয়ন—আষাঢ়—১৩৪১ সাল। দার্শনিক বেনেডেটো ক্রোচ এই মতই প্রচার করেন—'In order to judge Dante we must raise ourselves to his level; let it be well understood that empirically we are not Dante, nor Dante we; but in that moment of judgment and contemplation our spirit is one with that of the poet and in that moment we and he are one single thing. In this identity alone resides the possibility that our little soul can unite with the great souls and become great with them in the universality of the spirit.'

† 'বাসনা হচ্ছে অনুভূত ভাব বা জ্ঞানের সংস্কারলেশ, যাকে আশ্রয় করে পূর্বানুভূতির স্মৃতি মনে জাগ্রত হয়। এই বাসনা আছে বলেই কাব্যের ভাব-চিত্র মনে রসের সঞ্চার করে।'
'কাব্য-জিজ্ঞাসা'—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

আবেগ নাই, সেখানে কাব্যবিচার শুষ্ক বিশ্লেষণ মাত্র, রসাস্বাদ গ্রহণের অনুকূল নয়। যিনি তিক্ততা ভালবাসেন বলিয়া মিষ্টতা বুঝিতে অপটু, কাব্য-বিচারে তিনি যথার্থ অধিকারী নহেন। নিজের রুচি, নিজের মতবাদ, নিজের লৌকিক ধর্ম, এই সব অন্তরায়ের ঊর্ধ্বে না উঠিতে পারিলে কাব্যকে বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহারা কাব্যের কাছে লোকশিক্ষা চান, নূতন ধর্ম বা দর্শন চান, এমন কি সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলকে চান, তাঁহাদের চাওয়াতে অপরাধ নাই কিন্তু সেই চাওয়া মিটিলেই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে না। প্রাচীন আলংকারিকদের মতে সাহিত্যের কথা 'সুহৃৎসম্মিতবাণী, প্রভুসম্মিতবাণী নয়।' অর্থাৎ সাহিত্যে প্রোপাগাণ্ডা বা আত্মপ্রচার চলিবে না। কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করিবে রসসৃষ্টির উপর। যথার্থ কাব্যরসের ধ্বনি চিত্তকে স্পর্শ করিবে ও রাঙাইয়া তুলিবে। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বিশ্বাস করেন—

'Poetry describes things not as they are, but as they appear to the senses.'

দার্শনিক Croce বলেন—

'Poetic idealisation is not a frivolous embellishment, but a profound penetration, in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation. He who fails to accomplish this passage, but remains immersed in passionate agitation, never succeeds in bestowing pure poetic joy upon others or upon himself, whatever may be his efforts."

সমালোচক H. W. Garrod সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন—

'The end of literature is, truly enough, to present life; but to present it in such a fashion as to eliminate what is unessential, unrelated, inorganic; to present it as a whole of which all the parts are seen to be co-operative. Much of life is off the point; literature, where it is off the point, is not good but bad. It is in this sense, and perhaps in this sense only, that literature is, in the phrase of a great writer, a criticism of life. Literature is always to the point. It does what life does not, what, because we cannot do it for our lives, makes them so hard: it eliminates the unessential—' (The Profession of Poetry).

কিন্তু সাহিত্যের ধর্ম যাহাই হউক, উহার সহিত কবির প্রকাশভঙ্গি ও প্রকাশের

ঐশ্বর্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই শক্তির অভাব কোন কবির ভিতর থাকিলে তাঁহাকে বড় কবির আসন দেওয়া সুকঠিন। এই কথাটিকে সুস্পষ্ট করিয়া E. DE Selincourt বলিয়াছেন—

'We must seek it (pcetic quality in a poem) not in an alliance with music, nor in an alliance with prayer, but in the perfect rightness of its language to convey a passionately felt experience. The transport, as Longinus justly calls it, that the poet kindles in us springs from our instinctive recognition that his form, a term that includes both rhythm and diction, is an entirely faithful rendering of his experience, so that we gain from it a sudden clear sense of fulfilment such as we can hardly hope to gain outside the ideal world of art ……To give to impassioned experience that perfect form by which alone it can live on the lips and in the hearts of men, to give it life by means of form, that is the creative act of the poet—'

(Oxford Lectures On Poetry)

প্রকাশধর্মের ভিতর প্রকাশশক্তি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে বলিয়াই, Oscar Wilde বলিয়াছেন—

"There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well-written or badly written. That is all."

কিন্তু কবিরা যখন তাঁহাদের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করিতে চাহেন, তখন এই 'form'-এর বাঁধনই বড় অন্তরায় হয়। কবির সেই অনুভূত অভিজ্ঞতা এই form-এ পূর্ণ রূপ পায় না। কারণ Shelley বলেন—

'The mind in creation is as a fading coal; when composition begins, inspiration is already on the decline; and the most glorious poetry that has ever been communicated to the world is probably a feeble shadow of the original conception of the poet.'

এখন যাহাকে আমরা সাহিত্য বলি, সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম ছিল কাব্য। প্রমথ চৌধুরী বলেন,

'এই 'সাহিত্য' শব্দ বাঙ্‌লায় কোথা থেকে এল জানিনে। ও শব্দ সম্ভবতঃ সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক গ্রন্থ 'সাহিত্য-দর্পণে'র মলাট থেকে উড়ে এসে বাঙ্‌লা

সাহিত্যের অন্তরে জুড়ে বসেছে। কাব্য ও সাহিত্য এ দুটি শব্দের যে শুধু নামের প্রভেদ আছে তাই নয়, ও দুয়ের অর্থেরও বিস্তর প্রভেদ আছে। কাব্যের চাইতে সাহিত্যের এলাকা ঢের বেশি বিস্তৃত।'

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, 'সহিত' শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। তাই ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই মিলন-সাধন রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রাণ—মানুষের সহিত মানুষের, দূরের সহিত নিকটের, অতীতের সহিত বর্তমানের যোগসাধনা। রবীন্দ্রকাব্যের বিশিষ্টতা এই যে, তিনি জীবনের সকল রস, সকল অভিজ্ঞতা, সর্বপ্রকার উপলব্ধি প্রকাশ করিয়াছেন—সমস্ত বাধাকে তিনি সহজে অতিক্রম করিয়াছেন নিপুণতার সহিত তাঁহার শক্তির সাহায্যে। তিনি প্রকৃতির কবি, মানবপ্রেমের কবি, বিশ্বপ্রেমের কবি, জীবনপথের কবি এবং জীবনের কবি। তিনি বাস্তব জীবনের কবি, অথচ এই বাস্তব জগতের মাঝে যে অদৃশ্য জগৎ আছে, রবীন্দ্র-কাব্যে সেই অজ্ঞাত জগতের রূপ স্পর্শ রস গন্ধ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বাংলার গীতি কাব্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বিস্ময়কর হইলেও আকস্মিক বলিয়া মনে হয় না, এবং আকস্মিক হইলেও অসম্ভব বলিয়া ভাবিবার কারণ নাই।

বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি—মাধুর্য-ভাব আমাদের অস্থিমজ্জাতে। আমাদের প্রাণে রস আছে কিন্তু চরিত্রে দৃঢ়তা নাই। ফলে আমাদের ভাব আসে কিন্তু ভাব রক্ষা করিতে পারি না। এই ভাব ও মাধুর্য গীতিকবিতার সম্পত্তি। এবং সেই সম্পদে বাংলার গীতি-কাব্য ধনী। চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র পর্যন্ত অব্যাহত ভাবে প্রাচীন গীতি-কবিতা চলিয়া আসিতেছিল। 'বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়, জনসাধারণের ভক্তিব্যাকুল হৃদয়সমুদ্র হইতে শাক্ত ও বৈষ্ণব, এই দুই দ্বৈতবাদের ঢেউ উঠিয়া শৈবধর্মকে ভাঙিয়াছে।' বাঙলার জলবায়ুতে মধুররস বিরাজ করে, তাই বাঙলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশঃ মাতা অন্নপূর্ণার রূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে—মাতা, পত্নী ও কন্যা, রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গল-সুন্দর রূপে দরিদ্র বাঙ্গালীর ঘরে মধুর-রস সঞ্চার করিয়াছেন।' সাহিত্যে বৈষ্ণবই জয়লাভ করিয়াছেন, কারণ 'বৈষ্ণব-ধর্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি, সে-শক্তি বলরূপিণী নহে, প্রেমরূপিণী।' রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে বাঙলার প্রাচীন গীতি-কবিতার মর্মস্থল বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন—

'আমরা ভাব উপভোগ করিয়া অশ্রুজলে নিজেকে প্লাবিত করিয়াছি, কিন্তু

পৌরুষলাভ করি নাই, দৃঢ়নিষ্ঠা পাই নাই। আমরা শক্তিপূজায় নিজেকে শিশু কল্পনা করিয়া মা মা করিয়া আবদার করিয়াছি এবং বৈষ্ণব-সাধনায় নিজেকে নায়িকা কল্পনা করিয়া মান-অভিমানে, বিরহ-মিলনে ব্যাকুল হইয়াছি। শক্তির প্রতি ভক্তি আমাদের মনকে বীর্যের পথে লইয়া যায় নাই, প্রেমের পূজা আমাদের মনকে কর্মের পথে প্রেরণ করে নাই। আমরা ভাববিলাসী বলিয়াই আমাদের দেশে ভাবের বিকার ঘটিতে থাকে। একদিকে দুর্গায় ও আর একদিকে রাধায় আমাদের সাহিত্যে নারীভাবই অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পৌরুষের অভাব ও ভাবরসের প্রাচুর্য বঙ্গসাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বঙ্গ-সাহিত্যে দুর্গা ও রাধাকে অবলম্বন করিয়া দুই ধারা দুই পথে গিয়াছে—প্রথমটি গিয়াছে বাংলার গৃহের মধ্যে, দ্বিতীয়টি গিয়াছে বাংলার গৃহের বাহিরে। কিন্তু এই দুইটি ধারারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রমণী এবং এই দুইটিরই স্রোত ভাবের স্রোত।'

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর বঙ্গভারতীর বীণায় যে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা অনেকটা সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থার প্রতিক্রিয়া মাত্র। মোগলরাজত্ব তখন ভাঙিয়া শেষ হইয়াছে—কোম্পানী-রাজত্ব স্থাপিত হইল কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত হইল না। দুর্ভিক্ষে ও বন্যায় তখন দেশ প্রপীড়িত, সামাজিক অবস্থায় ঘুণ ধরিল, জনসাধারণ ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক অর্থবান সম্প্রদায়ের ভিতর অনিশ্চয়তা ও আর্থিক দীনতা আসিয়া প্রবেশ করিল। তখন কবিওয়ালাদের ক্ষীণকণ্ঠে সাহিত্যের গুঞ্জরণ চলিতেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহায্যে পাশ্চাত্ত্য চিন্তার সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় ঘটিল। বাঙ্গালীর চিন্তায় নূতন এবং বিরুদ্ধ চিন্তা আসিয়া প্রবেশ করিল। দুর্গা ও রাধাকে অবলম্বন করিয়া যে গীতি-কবিতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার সহিত পাশ্চাত্ত্যের বাস্তব-প্রীতি, বহির্মুখী কল্পনা ও প্রবৃত্তির সাধনা আসিয়া বাঙ্গালীর চিন্তাজগতে যে-আলোড়ন, যে-ঝড় সৃষ্টি করিল, তাহার বেগে, তাহার গতিতে তাহার বাত্যায় বাঙ্গালী নিজের সাধনার মাটি হইতে উৎপাটিত হইল। 'বাংলায় প্রতীচ্যের নব আগমনে, তাহার আলোক, তাহার বুকের সলিতা শুকাইয়া গেল, বাঙ্গালীর দীপ নিভিয়া আসিল। বাংলা চিরদিন পূর্বদিকেই সূর্য উঠিতে দেখিয়াছে, অকস্মাৎ পশ্চিমাকাশে বিজলীর ঝলকের মত আলোক দেখিয়া তাহার নয়নে ধাঁধাঁ লাগিল, বাঙ্গালী একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তাহার প্রাণের ভিতর যে প্রাণ ছিল, সে তখন তাহার প্রাণপুট বন্ধ করিল। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে

বিদ্যুৎ চমকাইলে যেমন সে-আলোক সহ্য করা যায় না, বাংলার প্রাণেও ঠিক সেইরূপ, ইউরোপ হইতে যে-আলোক সহসা বর্ষিত হইল, তাহা সহ্য হইল না। সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল।' *

বাংলা নিজেকে হারাইয়া আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি করিল। ভারতীয় ভাব-পন্থা য়ুরোপীয় কাব্যপন্থায় মিলিত হওয়াতে এক অভিনব মিলন সাধিত হইল। ইহারই সাহায্যে নূতন বাঙলা, নূতন বাঙালী সৃষ্টি হইল, যাহারা বহিঃপ্রকৃতির প্ররোচনাকে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। ফলে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সংযোগে বাংলা দেশে এক নূতন সাহিত্যের জন্ম হইল, ইহাকেই আমরা বলি আধুনিক। ইহা আধুনিক, কারণ প্রাচীন বাংলা সাহিত্য হইতে বিভিন্ন। এই আধুনিক সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন্। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।'—(সাহিত্যের পথে)।

পশ্চিমের সহিত আমাদের যোগ সাধিত হওয়াতে আমাদের রুচির পরিবর্তন ঘটিল। প্রকৃতিকে, সমাজকে, জীবনকে আমরা নূতন চোখে দেখিতে লাগিলাম। বাহিরের জীবন ও জগতের প্রতি আমাদের মমতা জাগিয়া উঠিল, বিশ্বের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনকে টানিয়া ধরিল এবং চিন্তার জগতে বাঙ্গালীর আত্ম-প্রতিষ্ঠার উন্মাদনা সবার হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়িল। এই বাস্তব-প্রীতি বাঙালীর কামনা, বাসনা ও পিপাসাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া এক নূতন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিল। মাইকেল হইতে বঙ্কিম পর্যন্ত এই দ্বন্দ্বই আমরা দেখিয়াছি। এই বস্তুতন্ত্র আমাদের সাহিত্যে নূতন আসিল, কারণ আমরা ভাবতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলাম। অর্থাৎ সাহিত্যে নূতন কাব্য-কৌশল আমরা গ্রহণ করিলাম। এই নূতন কৌশলের 'স্বষ্টরসের মধ্যে আস্বাদের প্রভেদ আছে, কিন্তু রসত্বের প্রভেদ নাই।'

রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—

'য়ুরোপ হইতে একটা ভাবের প্রবাহ আসিয়াছে এবং স্বভাবতঃই তাহা আমাদের মনকে আঘাত করিতেছে। এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, সে-কথা অস্বীকার করিলে নিজের চিত্তবৃত্তির প্রতি

* বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অভিভাষণ।

অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে। য়ুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে, একথা যখন সত্য, তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার চেষ্টা করি না কেন, আমাদের সাহিত্যে কিছু-না-কিছু নূতন মূর্তি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। ঠিক সেই সাবেক জিনিসের পুনরাবৃত্তি আর কোন মতেই হইতে পারে না—যদি হয়, তবেই এ সাহিত্যকে মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিব। * * * য়ুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য পার্থিব মহিমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে—তাহার বিদ্যুৎখচিত বজ্র আমাদের নত মস্তকের উপর দিয়া ঘন ঘন গর্জন করিতে করিতে চলিয়াছে। * * দেশ জুড়িয়া ইহার আয়োজন চলিয়াছে—দুর্বলের অভিমানবশতঃ ইহাকে আমরা স্বীকার করিব না বলিয়াও পদে পদে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি।'

রবীন্দ্রনাথ ও বিহারীলাল

এই বহির্মুখী কল্পনা বাংলাকাব্যে বেশিদিন আমল পাইল না। মাইকেল, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ইংরেজী আদর্শে মহাকাব্য রচনায় ব্যস্ত ছিলেন—বাংলার একান্ত নিজস্ব কাব্যের সুর বাঙ্গালী হারাইতে বসিয়াছিল। বাংলার গীতি-কাব্যের সুরটী নূতন মূর্ছনায়, নূতন গমকে এবং নূতন ছন্দে বিহারীলালের বীণায় বাজিয়া উঠিল। বিহারীলাল বাংলার গীতি কবিতার নূতন পথ আবিষ্কার করিলেন—বাঙ্গালীর চিন্তাধারায় যে-সংঘর্ষ আসিয়াছিল, তাহা এড়াইয়া দ্বন্দ্বের নূতন সমন্বয় সৃষ্টি করিলেন। বেদান্ত ও সন্ন্যাস, আর্য সাধনার অধ্যাত্মবাদ চিত্তকে অন্তর্মুখী করিয়া তোলে। য়ুরোপীয় আদর্শ বাঙ্গালীর চিত্তে রসসৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল কল্পনাকে বহির্মুখী করিয়া। ভারতীয় অন্তর্মুখী সাধনা এবং য়ুরোপীয় বহির্মুখী প্রেরণা—এই দ্বন্দ্বের সমন্বয় করিলেন বিহারীলাল। বিহারীলাল এই বাহিরের জগৎকে অন্তরে অনুভব করিলেন এবং প্রাণের মধ্যে একটা আদর্শ ভাবজগৎ সৃষ্টি করিলেন। বিহারীলালের এই নূতন আদর্শে ভারতীয় সাধনার আদর্শবাদ আছে, অথচ আধ্যাত্মিকতার নিবৃত্তির সাধনা নাই; ইহাতে য়ুরোপীয় সাধনার জগৎ ও জীবনের মাধুর্য ও সৌন্দর্য পান করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু বহির্জগতের কঠোর কর্কশতার প্রাধান্য ও 'য়ুরোপীয় সাহিত্যের পাকখাওয়া প্রবৃত্তির ঘূর্ণীনৃত্যের প্রলয়োৎসব' নাই। ভারতীয় সাধনার

শান্তরস ও য়ুরোপীয় সাধনার সৌন্দর্যপ্রীতি বিহারীলালের কাব্যসাধনায় নূতন ধর্ম আনিয়াছে ; ইহাই আধুনিক বাঙলার গীতি-কাব্যের বৈশিষ্ট্য এবং বিদেশী সংঘাতের প্রতিক্রিয়া। এই নব আধ্যাত্মিকতার প্রবর্তক বিহারীলাল এবং এই সাধনার মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ। এই নূতন সাধনায় বাঙালীর বাস্তব-রসপিপাসার সহিত ভারতীয় ভাবনা যুক্ত হইয়াছে। এই নূতন কবিধর্ম ভারতীয় নিবৃত্তি ও য়ুরোপীয় প্রবৃত্তি-সাধনার সহজ মিলন-প্রসূত। এই নূতন সাধনা প্রবৃত্তিকে একেবারে পুরামাত্রায় জলিয়া উঠিতে দেয় নাই, অর্থাৎ সৌন্দর্যপ্রিয়তা ত্যাগ করে নাই। এই নূতন আদর্শবাদ বলে যে, 'যথার্থ সৌন্দর্য, সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীর কাছে নহে।'

অতএব ধরা যাইতে পারে যে, বাংলার আধুনিক গীতি-কবিতার লক্ষণ হইল *—

(ক) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য—কোন বিশেষ সাধনতন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া আধুনিক গীতি-কাব্যের বিকাশ হয় নাই। যে-সাধনাকে আশ্রয় করিয়া আধুনিক গীতি-কবিতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা একান্ত কবির নিজের সাধনা। নিজের সুরে নিজের অনুভূতিকে কবি প্রকাশ করিয়াছেন—কোন নায়ক-নায়িকার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই।

(খ) আত্মভাব সাধনা—আধুনিক কবিদের কল্পনা অনেক সময়েই আত্মলীন (subjective)—নিজের আনন্দে ও ধ্যানে তাঁরা নিমগ্ন। এই ভাববিভোরতা নিতান্তই আধুনিক।

(গ) নিজের আদর্শ অনুযায়ী সুসঙ্গত মনোজগৎ সৃষ্টি করা।

(ঘ) আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয়-সাধন।

গীতিকাব্য † হইল কবির আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, সাহিত্যের

---

* বিহারীলাল সম্বন্ধে মোহিতলাল মজুমদার প্রণীত 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' দ্রষ্টব্য। তিনি বলিয়াছেন, 'বিহারীলালের কবি-প্রতিভার বিশিষ্ট লক্ষণ—প্রথম তাঁহার কবিদৃষ্টির মৌলিকতা ; দ্বিতীয়, তাঁহার কবিতায় রূপ অপেক্ষা ভাবার প্রাধান্য। এই দুয়ের কারণ এক—তাঁহার অভিনব ও ঐকান্তিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। তাঁহার কল্পনার মৌলিকতা এই যে, তিনি কবি-প্রেরণাকে বাহির হইতে ভিতরে ফিরাইয়াছেন, কাব্য অপেক্ষা কবিকে বড় করিয়াছেন। তাঁহার নিকট কাব্যকলা হইতে কবি-হৃদয় বা কবি-চরিত্র বড়।'

† 'গীতি-কবিতা বলি সেইটাকে যেটার স্বরূপ হচ্ছে কিছুটা কবিতা আর বাকীটা গীত। গীতি-কবিতার উৎকৃষ্টতা নির্ভর করবে এর ওপরে যে, সে-কবিতার অর্থ কতখানি তার কথা-গুলোকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে উঠেছে—ঠিক গানের মত। কারণ, গীতি-কবিতার প্রাণ যেটা সেটা তার কথার অর্থের মধ্যে ততটা নেই যতটা আছে তার ভাবের সঙ্গীতের মধ্যে'—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সবুজ পত্র—আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৪।

কার্যকে দুই অংশে ভাগ করা যাইতে পারে—আত্মপ্রকাশ এবং বংশরক্ষা। গীতি-কাব্যকে আত্মপ্রকাশ এবং নাট্য-কাব্যকে বংশপ্রকাশ নাম দেওয়া যাইতে পারে। লেখকের নিজের অন্তরে একটি মানবপ্রকৃতি আছে; তাই এই আত্ম-প্রকাশকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, সাহিত্যের কাজ সমগ্র মানবকে প্রকাশ করা। লেখক উপলক্ষ্য মাত্র, মানুষই উদ্দেশ্য। সঙ্গীতে, চিত্রে, বিজ্ঞানে, দর্শনে সমস্ত মানুষ নাই—এই জন্য সাহিত্যের এত আদর। এই জন্যই সাহিত্য সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভার। মানুষের অন্তরে যে অনন্তের সুর আছে, গীতি-কবিতা সেই বৃহত্তর আনন্দের সুর, সেই অনির্বচনীয়তা আমাদিগকে আনিয়া দেয়।

আধুনিক যুগের বাংলার গীতি-কবিতার প্রবর্তক বিহারীলাল—তাঁহার প্রদর্শিত পথে অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ চলিয়াছেন। বিহারীলাল কাব্যলক্ষ্মীর আরতির ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, তাই কাব্যসৃষ্টিতে বাধা পাইয়াছেন এবং বাধা পাইয়া তাহা লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির প্রাচুর্যে বিহারীলালের মন্ত্র ও সাধনা অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে, তাহা সমালোচকের নিকট উপেক্ষণীয় নহে। একথা সত্য যে, বিহারীলালের কাব্যসাধনা কাব্যসৃষ্টিতে সিদ্ধিলাভ করে নাই। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ কাব্যরস-ধারাকে নূতন ও বিচিত্র উৎসে প্রবাহিত করিয়া নব নব সৃষ্টির দ্বারা জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন। তবুও কাব্যসাধনায় তিনি যাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্র কোথায়, তাহা অনুসন্ধান করিতে গেলে রবীন্দ্রকাব্যকে বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইবে। উক্ত কারণেই বিহারীলালের কবি-প্রতিভার সহিত রবীন্দ্র-কাব্যের যোগাযোগ এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বিহারীলালের কাব্যে যে-দৃষ্টিভঙ্গী, যে-সাধনমন্ত্র, যে-আদর্শবাদ পাওয়া যায়, তাহা আলোচনা করিলেই রবীন্দ্র-কাব্যের সহিত কতখানি সম্বন্ধ আছে, তাহা সহজে ধরা যাইবে। প্রথম, বিহারীলাল মানুষকে ভালবাসিতেন—তাঁহার সৌন্দর্যধ্যানে পিপাসা আছে, কাম আছে। কিন্তু প্রবৃত্তির জ্বালা তিনি প্রীতিমন্ত্র-দ্বারা সংহত করিয়া লইয়াছেন। আবার যাহাকে তিনি ভালবাসেন, তাহাকেই তিনি বিশ্বময় দেখিতে চান। বিহারীলাল তাঁহার বন্ধু অনাথবন্ধু রায়কে লিখিয়াছিলেন—

"ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর ভালই করিয়াছেন···ভালবাসার চরম চরিতার্থতার·

স্থান এই বিশ্ব…নর-নারীতে ভালবাসা প্রথম প্রস্ফুটিত হয়। তাহার স্বর্গীয় সৌরভ চিরদিন জীবনকে পরমানন্দময় করিয়া রাখে। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিশ্ব আপনার হইয়া যায়। এই অমায়িক আত্মভাব দেবদুর্লভ। ইহার নাম পরমার্থ, স্বার্থ নহে।"

বিহারীলাল কাব্যে এই ভাবকে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মানবীকে ভালবাসেন এবং অবশেষে প্রেমিকাকে খুঁজিতে বিশ্বে তাঁহার প্রেমকে ব্যাপ্ত করিয়া দেন। বাহিরের রূপ ও অন্তরের অনুভূতি, বাস্তব ও কল্পনা, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়, সৌন্দর্য-পিপাসা ও হৃদয়-বৃত্তি, এক কথায় বাস্তবপ্রীতি ও অবাস্তব সৌন্দর্যধ্যান, ইহাদের মিলন তিনি তাঁহার কাব্যে ঘটাইয়াছেন। তাই তাঁহার 'নিশান্ত-সঙ্গীত' শুধু দাম্পত্য প্রেমের সম্ভোগ নয়, ইহাতে বিশ্বের সহিত কবির হৃদয়ের যোগসাধন করিবার আকুলতা আছে। 'নিশান্ত-সঙ্গীত'-এ প্রেয়সীর মুখপানে চাহিয়া কবি কহিলেন—

'আহা এই মুখখানি
প্রেমমাখা মুখখানি
ত্রিলোক সৌন্দর্য্য আনি কে দিল আমায়'

'প্রেম-প্রবাহিণী'-কাব্যে তিনি তাঁহার প্রেয়সীকে সর্বস্থানে দেখিতে লাগিলেন—

'কি জলে স্থলে শূন্যে যে দিকেই চাই,
বিরাজিত তব ছবি দেখিবারে পাই।'

এই প্রেমিকাকে তিনি খুঁজিয়াছেন নানা স্থানে নানা ভাবে। কিন্তু এই অনুসন্ধানের ধাঁধা হইতে তিনি বাঁচিলেন যখন তিনি নিজের প্রেমকে বিশ্বময় করিয়া দিলেন—

'কিছুতেই যখন তোমারে না পেলেম,
একেবারে আমি যেন কি হয়ে গেলেম।
শূন্যময় তমোময় বিশ্বসমুদয়,
অন্তর বাহির শুষ্ক, সব মরুময়।
আসিয়ে ঘেরিল বিড়ম্বনা সারি সারি ;
দুর্ভর হৃদয়-ভার সহিতে না পারি ;
কাতর চীৎকার-স্বরে ডাকিনু তোমায়,
কোথা, ওহে দেখা দাও আসিয়ে আমায়।

অমনি হৃদয়ে এক আলোক পূরিত,
মাঝে বিশ্ববিমোহন রূপ বিরাজিত।"*

(প্রেম-প্রবাহিণী)

দ্বিতীয়, বিহারীলাল তাঁহার 'সারদা'কে 'যোগেন্দ্রবালা', 'যোগেশ্বরী' 'যোগানন্দময়ীতনু' 'যোগীন্দ্রের ধ্যান-ধন' প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিয়াছেন। তিনি সারদার ধ্যানে নিমগ্ন, সারদার প্রেমে বিভোর। তাই তিনি বলিতেছেন—

'ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে রাখি
ভোর হয়ে বসে থাকি,
নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার।'

বিহারীলালের 'সারদা' 'প্রীতি-প্রেমের প্রবাহরূপিণী' এবং 'বিশ্বব্যাপ্ত সৌন্দর্য ও মানবীয় প্রেমের সমন্বয়রূপিণী।' তিনি 'সারদা'কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

'তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা,
কবির যোগীর ধ্যান
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ—
মানব মনের তুমি উদার সুষমা'

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বিহারীলালের মত কেহই আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত সহস্রধারে উৎসারণ করিতে পারেন নাই। সারদা মঙ্গলের কবি তাঁহার সারদার প্রেমে একনিষ্ঠ—অর্থাৎ তিনি কাব্যধর্মে অদ্বৈতবাদী। এই কাব্য-সাধনায় তিনি যখন রহস্যের দুয়ারে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি তাহা ভেদ না করিয়া কাব্যলক্ষ্মীর আরতি করিয়াছেন। কাব্য-সৃষ্টি বাধা পাইলেও তাঁহার সাধনায় একনিষ্ঠা প্রমাণিত হইয়াছে।

তাই তিনি বলিয়াছেন—

---

* 'From these considerations it may be concluded that 'Alastor' and 'Hymn to Intellectual Beauty' went largely to the making of 'Prem-prabahini'; though occasionally Kalidas and Shakespeare were laid under contribution by him; and that if any Bengalee Poet, more consistently than any of the rest, approaches Shelley in his ethereality, morality, sublimity (should we not also add ineffectuality ?) and even in the fidelity to his poetical creed or in his inclination in life to be wise, just, free and mild, it is, without doubt, Beharilal Chakravarti"—Prof. H. M. Das Gupta প্রণীত—Western Influence on 19th Century Bengali Poetry, 1857-1887.

'রহস্ত ভেদিতে তব আর আমি চাব না,
না বুঝিয়া থাকা ভাল,
বুঝিলেই নেবে আলো,
সে মহাপ্রলয় পথে ভুলে কভু যাব না।"

তৃতীয়, তিনি নারী-ব্যথার দরদী কবি। নারীকে সমাজে সম্মানের আসন দিতে হইবে। বিহারীলাল 'বঙ্গসুন্দরী'-কাব্যে নারীত্বের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। নারীকে পর্দার অন্তরালে থাকিয়া ঝরিয়া পড়িতে হইবে, বিহারীলাল তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। 'বন্ধু বিয়োগ' কবিতাতে পতিতা রমণীদের জন্য সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

'অনামে দুরাত্মা পুত্র গৃহে স্থান পায়
পাপস্পর্শ মাত্র কিন্তু কন্যা ভেসে যায়।
কতদিন আর হায় কতদিন আর,
অবাধে চলিবে এই ঘোর অবিচার।'

চতুর্থ, জগতের মধ্যে সর্বদা পরিবর্তনের স্রোত চলিয়াছে – এই রূপান্তরের ফলেই নূতন জন্মলাভ করিতেছে এবং এই রূপান্তরই জগতের সৌন্দর্য ও মাধুর্য বিধান করিতেছে। তিনি জানেন যে, 'জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মরণ।' তাই তিনি বলেন—

'বিশ্বের প্রকৃতি এই,
একবারে লয় নেই,
এক যায় এক আসে
তরুণ সৌন্দর্য্য ভাসে। (সাধের আসন)

পঞ্চম, বিহারীলাল কামনাহীন স্বর্গ-সুখে তৃপ্ত নহেন। তিনি মানবের কবি; তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

'স্বর্গেতে অমৃত সিন্ধু'
পাই নাই একবিন্দু।' (সাধের আসন)

মানবের অশ্রুকণা যে, 'অমৃত অধিক ধন,' একথা তিনি জানেন এবং তাহা জানেন বলিয়াই মায়ামমতাহীন স্বর্গকে তাঁহার কাব্যে লোভনীয় বলিয়া ঘোষণা করেন নাই।

ষষ্ঠ, প্রকৃতির সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষা বিহারীলালের কাব্যের একটী বিশিষ্ট রূপ। বিশ্বপ্রকৃতির রূপরস, গন্ধগান বিহারীলালকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানুষের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা বিহারীলালের কাব্যে পরিস্ফুট।

বিহারীলালের কাব্যের যে-সব ভাব ও আদর্শবাদ আমরা উক্ত বিশ্লেষণ হইতে জানিতে পারিলাম, তাহা রবীন্দ্রকাব্যেরও মূল কথা। শুধু রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতবাদী মন ও প্রাণ কাব্যসৃষ্টির যে-প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য দেখাইয়াছে, তাহা বাঙলা-সাহিত্যে অপূর্ব, এমন কি, বিশ্বসাহিত্যেও এত ঐশ্বর্য কোন বিশেষ কবির আছে বলিয়া আমার জানা নাই। যে-ধ্যান-মন্ত্রে তাহা সম্ভব হইল, তাহা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার বিহারীলালের কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'বিহারীলালের কবিদৃষ্টি কাব্যসৃষ্টিতে সার্থক হয় নাই; তাঁহার কাব্য একরূপ তত্ত্বরসের (mysticism) আধার হইয়া আছে,—সে-রসকে তিনি রূপ দিতে পারেন নাই; তিনি নিজে যাহা দেখিয়াছেন, অপরকে তাহা দেখাইতে পারেন নাই।'*

রবীন্দ্রনাথ কাব্যসৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছেন।

অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী বিহারীলালের কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যে কোন গভীর সংযোগ আছে, তাহা বিশ্বাস করেন না। তিনি লিখিয়াছেন—

'বিহারীলাল যাহা কিছু লিখিয়াছেন, সবই চোখ কান দিয়া দেখিয়া শুনিয়া লিখিয়াছেন মাত্র, তাহার সহিত মনের বা অনুভূতির কোন যোগ রাখিতে পারেন নাই।····তিনি প্রকৃতির পানে চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চোখে দেখা রূপের সহিত তিনি কোন দিন 'আপন মনের মাধুরী'টি মিশাইতে পারেন নাই, অর্থাৎ চিত্রের সহিত তিনি কোনদিন সঙ্গীত যোজনা করিতে পারেন নাই। তবে বিহারীলালের কৃতিত্ব এই যে, তিনি এতদিন-কার সংস্কার ভাঙিতে পারিয়াছেন। বিহারীলাল ভাঙিয়াছেন অনেক কিছু, কিন্তু গড়িয়া যাইতে পারেন নাই খুব বেশি। সংস্কারক হিসাবে তিনি হয়ত অনেককাল বাঁচিয়া থাকিবেন কিন্তু স্রষ্টা হিসাবে তাঁহার আসন যে কোথায় পাতা হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না।' (কাব্যে রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথের মতে, চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান

* 'বিহারীলালের সারদামঙ্গল-কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'সূর্য্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয় কিন্তু কোনও রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্য-স্বর্গ হইতে একটি অপূর্ব রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।'

করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ। বিহারীলালের প্রকৃতিবর্ণনায় অনেকে এই প্রাণহীন দেহের পরিচয় লাভ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে সেই প্রাণ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, উচ্ছলতায় দেহকে ভাসাইয়া বিশ্বমানবের চিত্তসাগরে মিলিত হইয়াছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে চিত্র-কাব্য হইল অ কাব্য। চিত্র যেমন বস্তুর অনুকরণ, কিন্তু বস্তু নয়, চিত্র-কাব্যও তেমনি কাব্যের অনুকরণ কিন্তু কাব্য নয়। এই চিত্র-কাব্য যে প্রকৃত কাব্য নয়, তাহা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বুঝাইয়া বলিয়াছেন—

If you ask me to draw some particular tree, and I am no artist, I try to copy every detail. But when the true artist comes, he overlooks all details and gets into the essential characterisation. When he looks on a tree, he looks on that tree as unique, not as the botanist who generalises and classifies. It is the function of the artist to particularise that one tree. How does he do it ? Not through the peculiarity which is the discord of the unique, but through the personality which is harmony. Therefore he has to find out the inner concordance of that one thing with its outer surrounding of all things. (Personality)

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিহারীলালকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে তিনি যে প্রেরণা পাইয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

'পল্‌-বর্জিনীতে যেমন মানুষের এবং প্রকৃতির সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম, বিহারীলালের কাব্যেও সেইরূপ একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।'

রবীন্দ্রনাথ আরও স্বীকার করিয়াছেন—

'যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস বোধ হয় এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন কেমন করিতে থাকে, বিহারীলালের ছন্দেই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম।'

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানুষের যে গভীর সম্বন্ধ, এবং সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীমের মিলন-সাধনা, ইহা রবীন্দ্রকাব্যে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং রবীন্দ্রনাথের নিজের স্বীকৃতিতেই পাওয়া যায় যে, বিহারীলালের কাব্য রবীন্দ্র-কাব্যের উল্লিখিত বিশিষ্টতার প্রেরণা জাগাইয়াছে।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর* পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া কাব্যরচনা করিতেছিলেন। এতদিন বিহারীলালের ভাব, ভাষা ও ছন্দের প্রভাব রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কবিতায় তিনি প্রথম সেই 'অনুকরণের বন্ধন ছেদন করিয়া নিজের ইচ্ছার অনুরূপ ছন্দ ও স্বকীয় ভাব অবলম্বন করেন।'

রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত, বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল'-এর আরম্ভ ভাগ হইতে গৃহীত। তিনি আরও স্বীকার করিয়াছেন—

'বর্তমান সমালোচক এককালে 'বঙ্গ সুন্দরী' ও 'সারদামঙ্গল'-এর কবির নিকট হইতে কাব্যশিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কতদূর কৃতকর্ম হইয়াছে বলা যায় না, কিন্তু এই শিক্ষাটি স্থায়ীভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্য-সৌন্দর্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ, ছন্দে এবং ভাষায় সর্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক।'

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় বিহারীলালের ভাবের প্রভাব পাওয়া যায়। অনেকে † মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী'র ভাব বিহারীলালের একটি গান হইতে পাইয়াছিলেন। সেই গানটি—

'সোনার তরী নয়নে নাচে নাচে,
পা না দিতে দিতে ডুবে যে আচম্বিতে।'

ভাবসাদৃশ্য এই দুই কবির কবিতায় প্রচুর পাওয়া যায়—এমন কি, রবীন্দ্র-কাব্যে বিহারীলালের কাব্যের ছন্দের প্রভাবও যথেষ্ট।

রবীন্দ্র-কাব্যের বিচিত্রতা

বিহারীলালের কাব্যের সহিত রবীন্দ্র-কাব্যের যোগ থাকিলেও রবীন্দ্রনাথ কাব্য-সাধনায় আপনার পথেই চলিয়াছেন। তাঁহার সাধনপন্থা ঠিক ভারতীয় নয়, বিদেশীয় নয়—সে-পথ তাঁহার নিজের। তিনি আপন পথে চলিতে, আপনার সাধনপন্থা আবিষ্কার করিতে, আপনার কাব্যপন্থা খুঁজিয়া লইতে হয়ত কাহারও

* কবির বয়স তখন ১৯, যখন 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচিত হয়।

† 'সোনার তরী'—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত, ভারতবর্ষ ১৩৩১, ভাদ্র। তিনি 'সোনার তরীর' জন্ম-ইতিহাস এই প্রবন্ধে আলোচনা করেন।

প্রভাবকে মানিয়া লইয়াছেন, সেখানেই আমরা বলি যে, তিনি বিহারীলালের কাব্যের মন্ত্রশিষ্য, ভারতীয় সাধনার অনুপন্থী এবং য়ুরোপীয় কাব্যপন্থার পক্ষপাতী। সত্যে, আনন্দে, কল্যাণে রবীন্দ্র কাব্য নিজের সাধনায় নিজের পথ কাটিয়া চলিয়াছে—তাহাতে য়ুরোপীয় রূপবাদ ও ভারতীয় ভাববাদের কতখানি সমন্বয় হইল, তাহা অনুসন্ধান করিতে গেলে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রতি যথার্থ বিচার করা হইবে না *। পথ তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছেন—

'মিথ্যা আমি কি সন্ধানে
যাব কাহার দ্বার?
পথ আমারে পথ দেখাবে
এই জেনেছি সার।'

তিনি দশের পথে যান নাই, তিনি নিজের পথে চলিয়াছেন। তিনি জ্ঞানীর চোখে জীবনকে দেখেন নাই, কারণ জীবন জ্ঞানীর কাছে ধরা দেয় না। জীবনের বর্ণচ্ছটা ক্ষণে ক্ষণে বদলায়—তাহার পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করিতে হইলে, বুঝিতে হইলে তন্ময়তার সহিত সাধনা করিতে হয়। অন্যকে অনুকরণ করিলে এই নিত্যক্রিয়াশীল নিত্যপরিবর্তনশীল জীবনকে ধরিতে পারা যায় না। জীবনের সমস্ত রস, সমস্ত গতি, সমস্ত বর্ণ রবীন্দ্রকাব্যে ধরা দিয়াছে। রবীন্দ্র-

---

* অনেকে রবীন্দ্রনাথের খণ্ড কবিতার সঙ্গে ইংরেজ রোমান্টিক কবির খণ্ড কবিতার মিল দেখাইয়া ভাবেন যে, একজনের প্রভাব আর একজনের উপর পড়িয়াছে। যুগধর্মের প্রভাব সবার উপরই পরিলক্ষিত হইবে, শুধু খণ্ডকবিতার সাদৃশ্য দেখাইলে কোন কবির প্রতি সুবিচার করা হইবে না। Shelley বলেন—"There must be a resemblance, which does not depend upon their own will, between all the writers of any particular age. They cannot escape from subjection to a common influence which arises out of an infinite combination of circumstances belonging to the times in which they live, though each is in a degree the author of the very influence by which his being is thus pervaded—(Preface to the Revolt of Islam)." একথা ঠিক যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি বৎসলতা শেলীর আদর্শবাদ ও তন্ময়তা, ব্রাউনিং-এর মানবতা, কীট্‌সের সৌন্দর্যতত্ত্ব, টেনিসনের ভগবৎবিধানের তত্ত্ব—সবই রবীন্দ্র-কাব্যে সন্ধান পাওয়া যায়। প্রফেসার অমূল্যচরণ আইকত তাঁহার "On the poetry of Matthew Arnold, Robert Browning and Rabindranath Tagore" গ্রন্থে ব্রাউনিং ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভিতর যোগাযোগ দেখাইতে গিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—"Rabindranath's poems include aspects which suggest filiation with Wordsworth, Shelley, Tennyson and Matthew Arnold." এই যোগাযোগ যুগধর্মপ্রসূত এবং অবশ্যম্ভাবী।

সাধের কোন বিশিষ্ট সাধননীতি নাই—তাঁহার তন্ময়তা, ভাববিভোরতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য তাঁহাকে সমস্ত রহস্যের খোঁজ দিয়াছে। সেই তন্ময়তা তিনি কোথা হইতে পাইয়াছিলেন, তাহার সঠিক ইতিহাস দেওয়া সম্ভব নয়। অবলীলাক্রমে তিনি সৌন্দর্য ফুটাইয়া গিয়াছেন, আলঙ্কারিক সৌষ্ঠবে সাজাইতে গিয়া তিনি কবিতার কলাসৌষ্ঠবকে নষ্ট করেন নাই। কারণ, 'যে গায়ক গানের প্রত্যেক তালটিতে, লয়টিতে অত্যন্ত বেশি ঝোঁক দেয় অর্থাৎ সে-সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাহার গানের মাধুর্য নষ্ট হইতে বাধ্য। এইজন্য আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যখন ভাবের প্রেরণার হাতে কবিরা আপনাদিগকে সমর্পণ করেন, তখনই তাঁহাদের সঙ্গীত ফুলের মত রঙে ও গন্ধে পূর্ণ হইয়া ফোটে; ঢেউয়ের মত কলক্রন্দনে বাজিতে থাকে; বিশ্বের সকল সৌন্দর্য, সকল আনন্দের সঙ্গে একাসন গ্রহণ করে' সেই ফুল রবীন্দ্র-কাব্যে ফুটিয়াছে, সেই ফুল রবীন্দ্রনাথই ফুটাইতে পারেন—

'তোমরা কেউ পারবে না গো
পারবে না ফুল ফোটাতে।
যতই বল যতই কর
যতই তারে তুলে ধর
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন
আঘাত কর বোঁটাতে।
তোমরা কেউ পারবে না গো
পারবে না ফুল ফোটাতে।'

ফুল আপনা হইতে ফুটিলেও জলবায়ু তাহাকে সাহায্য করে। বাংলার জলবায়ুর ভিতর এমন গুণ আছে যাহার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা সম্ভব হইয়াছে। সেই কারণেই বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছেন—

'No other Indian province could produce a Rabindranath. No Indian vernacular except Bengali could supply the material for his art creations.'

বাংলার জলবায়ুর গুণে চণ্ডীর উৎকট ভীষণতা শান্ত হইল, তাহার বরাভয়করা মাতৃমূর্তিই প্রতিষ্ঠা পাইল। বাংলার গীতি-সাহিত্যে বৈষ্ণবই একা রাজত্ব করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের শুভ্ররসে পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হইলেও বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বের আভাসে তাঁহার কাব্য প্রভাবান্বিত হইয়াছে বেশি।

বৈষ্ণবগণ এই রূপরসগন্ধভরা সংসারের ভিতর দিয়াই আনন্দলোকে পৌঁছিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পদাবলী-সাহিত্য বৈষ্ণব কবিদের অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভূতির প্রকাশ। বৈষ্ণব লীলাতত্ত্বের কথা এই যে, বিশ্ব ও মানব-জীবনের সকল ঘটনা ভগবানের রসলীলা বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু উপনিষদের অধ্যাত্মযোগ-তত্ত্বের দ্বারা বা কেবল বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত নন। উপনিষদে সর্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখিবার কথা আছে, কিন্তু সেখানে আত্মস্থ হইয়া, যোগস্থ হইয়া সকল অনিত্যের মধ্যে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যান করিবার উপদেশ আছে। উপনিষদে এই 'অন্তর্মুখিন ধ্যানপরায়ণ সাধনায়' দর্শনশাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে, কিন্তু কাব্যকলা সৃষ্ট হয় না। ইহাতে ভক্তিবাদ হয়, কিন্তু ভক্তিকাব্য সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, বৈষ্ণবলীলাতত্ত্বে অনুভূতির নিবিড়তা ও তন্ময়তা ভক্তিকাব্য সৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারে না। অধ্যাত্মযোগের সাধনায় শুষ্কতা আনে, ভক্তিরসবিহ্বল সাধনায় মাদকতা আনে। এই দুয়ের মিলন চাই।* রবীন্দ্র-কাব্যে শুধু এই মিলন ঘটিয়াছে তাহা নহে, তাঁহার কাব্য এই মিলনকে অতিক্রম করিয়া নর-নারীর প্রেমের মধ্য দিয়া বিশ্বজগতের প্রীতিরসে মিলিত হইয়াছে—ইহা ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর অনুগত নহে, ইহা বৈষ্ণব-লীলাতত্ত্বের সংকেতে চালিত নহে। বৈষ্ণবধর্মের মতে, পূর্ণ আনন্দ এই সংসারেই পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ণ আনন্দ পাইতে হইলে নানা পথ আছে—শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস ও মাধুর্যরস। এই পঞ্চবিধ রস মানুষের পারিবারিক বা গোষ্ঠীর অন্তর্নিগূঢ় আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আধুনিক জগতে যখন গৃহী বিশ্ববাসীর সহিত নানাবিধ যোগসূত্রে আবদ্ধ, তখন তাহার পক্ষে উক্ত রসই যথেষ্ট নয়—অর্থাৎ মানুষের অভিজ্ঞতা ও আবেগ এই পঞ্চবিধ রসেই পূর্ণ প্রকাশ পায় না। যে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, তাহাতে সকল অভিজ্ঞতা, সকল রস প্রকাশ পাইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নানাবিধ সাধনার মিলন তত্ত্বে হয় নাই, জীবনে হইয়াছে। তিনি বৈষ্ণব কবিদের মত 'অসীম আনন্দকে সীমারূপের মধ্যে নিবিড় করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন', আবার আধুনিক ভক্ত

* শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী-প্রণীত 'কাব্যপরিক্রমা'—'বৈষ্ণবতন্ত্রের সাধনায় সেই অধ্যাত্ম-বোধ যেমন অন্তর্নিগূঢ় হইয়াছিল, তেমন বিশ্বানুপ্রবিষ্ট হয় নাই। সেই জন্য আমাদের দেশ ভেককে বিশ্বাস করে, বাস্তবকে করে না—স্বাভাবিকের চেয়ে অলৌকিককে শ্রদ্ধা করে। সেই অন্তর্নিগূঢ় অধ্যাত্মবোধকে কোন গোপন পন্থায় হারাইতে না দিয়া তাহাকেই বিশ্বের দিকে ব্যাপ্ত করিবার, সত্য করিবার জন্য কি রবীন্দ্রনাথের একটি একান্ত প্রয়াস নাই?'

কবিদের মত 'সীমারূপকে অসীম দেশে ও অসীম কালে ব্যাপ্ত করিয়া সীমার মধ্যে অসীমতাকে প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন।' প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করেন। অনেকে * এই পদাবলী-নিহিত রসকে কাব্যরস হিসাবে উচ্চপ্রশংসা করেন কিন্তু কবি নিজে বলিয়াছেন যে, তাহাতে 'আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলান ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতী টুং টাং মাত্র।' যাহা হউক, রবীন্দ্র-কাব্যে বৈষ্ণবপ্রভাব সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করিব।

রবীন্দ্র-কাব্যের বিশিষ্টতা এই যে, ইহাতে সকল রস আছে। যিনি ভক্তির গান গাহিয়াছেন তিনি জীবনের গান গাহিতে পারেন নাই, কারণ 'জীবনের গতি প্রবৃত্তির দিকে, ধর্মের গতি নিবৃত্তির দিকে।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সকল রসের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন এবং জীবনের সর্ববিধ সুর তাঁহার একতারাতে বাজিয়া উঠিয়াছে। তিনি 'সকল বিচিত্র-রসনিগূঢ় জীবনের গান গাহিয়াছেন'—তিনি বৈষ্ণবকবি, ভক্ত কবি, মরমী কবি, প্রকৃতির কবি, মানবপ্রেমের কবি। যথা,

'এরে ভিখারী সাজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে ?
হাসিতে আকাশ ভরিলে ॥
পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়,
ঝুলি ভরি রাখে যাহা কিছু পায়
কতবার তুমি পথে এসে হায়,
ভিক্ষার ধন হরিলে ॥
ভেবেছিল চিরকাঙাল সে এই ভুবনে
কাঙাল মরণে জীবনে।

* ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জার্মানীতে থাকাকালীন এই ভানুসিংহকে প্রাচীন পদকর্তা ভাবিয়া য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া ডক্টর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। Prof. Lesny তাঁহার "রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'These poems (of Bhanusinha) were intentional imitations of Chandidas and Bidyapati, old Baishnava lyric poets, but the form and spirit of their imitations were neither parody nor a mere trick. They gave evidence of serious literary effort, for they showed not only appreciation of literary tradition. but also a desire for its revivification. Artistically, too, this attempt stands fairly high. Baishnava lyricism's eager desire for divine love penetrated so deeply into the poet's mind that its influence is reflected in all his later works, and even overcame the influence of Byronic romanticism, by which, through Shelley, he was captivated as a young man.'

ওগো মহারাজ, বড় ভয়ে ভয়ে
দিনশেষে এল তোমার আলয়ে
আধেক আসনে তারে ডেকে লয়ে
নিজ মালা দিয়ে বরিলে ॥'

'এই উদ্ধৃত ছোট গানটির মধ্যে অধ্যাত্ম সাধনার প্রথম অবস্থায় ত্যাগের রিক্ততার সুগভীর বেদনা এবং শেষ অবস্থায় ভগবানকে অনন্যশরণ জানিয়া আশ্রয় করিবামাত্র মিলনের অপূর্ব আনন্দের সমস্ত ইতিহাস কি একটি সংহতরূপ লাভ করিয়াছে!' (অজিতকুমার চক্রবর্তী)

'তোমায় আমায় মিলন হোলে সকলি যায় খুলে,
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।'

ইহা সাধক কবির গান।

'কি ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি
কার ইসারা তৃণের অঙ্গুলি।
প্রাণেশ আমার লীলাভরে
খেলেন প্রাণের খেলাঘরে
পাখীর মুখে এই যে খবর পেনু।'

ইহা বৈষ্ণব কবির গান।

'পাগল করা গানের তানে
ধায় যে কোথা কেই বা জানে,
চায় না ফিরে পিছন পানে
রয় না বাঁধা বন্ধে রে,
লুটে যাবার ছুটে যাবার
চলবারই আনন্দে রে।'

কবি 'নিশ্চল নির্বিকল্প নির্গুণ' ঈশ্বরের ভক্ত নন—গতিধর্মের পক্ষপাতী।

'আমার পরশ পাবে বলে
আমায় তুমি নিলে কোলে
কেউ ত জানে না তা।
রইল আকাশ অবাক মানি
করল কেবল কানাকানি
বনের লতাপাতা।

এখানে রবীন্দ্রনাথ মরমী কবি।

'সখী প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে ?
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে।'

এখানে তিনি মানব-প্রেমের কবি।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীতের সহিত কবীরের ধর্মবাক্যগুলির যোগ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ভারতের ভক্তিসাধনা রসসাধনার সহিত যুক্ত হইয়াছে। আমাদের সাধকগণ ভক্তকবি, তাঁহারা শুধু রসহীন নীতিবোধকে আশ্রয় করিয়া থাকেন নাই। আমাদের ধর্মসাহিত্য* রূপ-রসের দাবিকে অগ্রাহ্য করে নাই, তাই রবীন্দ্রকাব্যে কবীরের প্রভাব লক্ষ্য করা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের ভক্তিকবিতায় রূপ ও সৌন্দর্য কোথাও অস্বীকৃত হয় নাই, কবীরের গানও এই আনন্দের সুরে বাঁধা।† যথা—

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।' —রবীন্দ্রনাথ

"কহৈঁ কবীর, বিছুড় নহিঁ" মিলিহো
জেঁ্যা তরবর ছোড় বনমাধরী—'
—কবীর

(কবীর কহেন, তরুকে ছাড়িয়া যেমন বনকে খুঁজিয়া পাইবে না—তেমনি তিনি বিচ্ছিন্নভাবে মিলিবেন না।)

* 'উপনিষদকেই বলে বেদান্ত ও শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, তাহার উপর ভর করিয়া সকল তত্ত্বশাস্ত্র ভারতবর্ষে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ তাহাকে সাধকের গভীরতম অধ্যাত্ম উপলব্ধির অপূর্ব প্রকাশ বলিয়া চিরদিনই ভারতবর্ষ শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে। ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি সকল শাস্ত্র সম্বন্ধেই সেই এক কথা—তাহা হইতে এক ধারা গিয়াছে তত্ত্বজ্ঞানের দিকে, অন্য ধারা গিয়াছে কাব্য ও সংগীতের দিকে। এই উভয় ধারাই ভারতবর্ষে চিরকাল পরস্পর পরস্পরকে পরিপুষ্ট করিয়া আসিয়াছে। সেই জন্য ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সংগীতগুলি ইউরোপের ধর্ম সংগীতের ন্যায় অ-কবিদের দ্বারা রচিত নহে। তাহা তত্ত্বদর্শী সাধক কবিদের রচনা।'

—অজিতকুমার চক্রবর্তী-প্রণীত 'কাব্যপরিক্রমা'।

† 'The influence of Kabir's religious poetry on Tagore is witnessed by the fact that in 1921 he himself edited a selection of these poems for the English-speaking public'—Prof. V. Lesny-প্রণীত 'Rabindranath Tagore.'

আবার—

'য়া ঘট ভীতর চন্দ্র সুরহৈঁ য়াহী মে নৌলখ তারা'—আমারি মধ্যে চন্দ্রসূর্য, আমারি মধ্যে নব লক্ষ তারা প্রকাশিত—(কবীর)। 'আজি যত তারা তব আকাশে, সবে মোর প্রাণভরি প্রকাশে'—(রবীন্দ্রনাথ)। 'যাবহী মুরত বীচ অমুরত, মুরতকী বলিহারী'—সকল মূর্তির মধ্যে অমূর্ত; বলিহারী যাই সকল মূর্তির (কবীর)। আমি রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি —(রবীন্দ্রনাথ)।

রমাপ্রসাদ চন্দের মতে—

'রবীন্দ্রনাথের গীতি-কাব্য অধিকাংশই মন্ত্র-সাহিত্য; আধুনিক যুগের ঋষির দৃষ্ট নব মন্ত্রসংহিতা। যে গীত দেখা কথার উপর প্রতিষ্ঠিত, শোনা বা শেখা কথার সম্পর্কবর্জিত, তাহা মন্ত্র; যে গীতে শেখা কথার ও শোনা কথার প্রাধান্য, তাহা কাব্য মাত্র। অবর বা পরবর্তীকালের লোকেরা পড়িয়া বা শুনিয়া যে অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান পাইয়া থাকেন, ঋষি তাহা প্রত্যক্ষ করেন এবং মন্ত্রগান করিয়া অপরকে প্রত্যক্ষানুভূতির পূর্বস্বাদ প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যে যাহা মন্ত্র, তাহাতে আমরা অতীন্দ্রিয় জগতের যে আলেখ্যের সন্ধান লাভ করি, তাহার দিকে চাহিলে স্বতঃই মনে হয়, ইহা শোনা বা শেখা কথার প্রতিধ্বনি মাত্র নহে, ইহা দেখা কথা, গানে গাঁথা।' (সাহিত্য, পৌষ, ১৩২০)।

রবীন্দ্রকাব্যে এই বৈচিত্র্য, অনুভূতির এই প্রসারতা সত্যই বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথের শৈশব রচনার ভিতর যে সুর বাজিয়াছে তাহা হইতেছে যে, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানবমনের এক নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। ইহা রবীন্দ্রকাব্যের একটি মূল সুর। 'সন্ধ্যা সঙ্গীত'-এ কবি প্রকৃতিকে মানবীয় ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু 'প্রভাত সঙ্গীত'-এ তিনি অসীম অনন্তকে অন্তরে অনুভব করিবার জন্য 'আনন্দময় স্বচ্ছন্দ মুক্ত জীবন' পাইতে চাহিয়াছেন। 'ছবি ও গান'-এ আছে একটা সৌন্দর্যের পুলক—তাহাতে কবির নব যৌবনের নেশা আছে। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-বর্ণ গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি-মন-স্নেহ-প্রেম লইয়া কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। 'মানসী'যুগে কবি দক্ষ স্রষ্টারূপে দেখা দিয়াছেন, মানবীয় প্রেমের গভীরতা দেখাইয়াছেন এবং প্রকৃতির ভৈরবরূপের সহিত পরিচয় ঘটাইয়াছেন। 'সোনার তরী'তে বিশ্বানুভূতি ও সৌন্দর্যানুভূতি প্রবলভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 'চিত্রা'-কাব্যে সৌন্দর্যপূজার এবং মহাজীবন লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা

দেখিতে পাই। 'চৈতালী'-যুগে কবি অনুভব করিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ে মিলিয়া বিশ্বের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ হইয়াছে—কেহ কাহাকে ছাড়িয়া সম্পূর্ণ নয়। বিশ্বসংসারের বিবিধ বিষয় ও বস্তুর মধ্যে যে যোগসূত্র আছে কবি 'কণিকা'-তে তাহা দেখাইয়াছেন এবং সেই বিশ্বকে 'ক্ষণিকা'-কাব্যে কবি সহজভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করিলেন। 'উৎসর্গ'-কাব্যে কবি-মনের যৌবনের পরিচয় পাওয়া যায়—সেখানে কবি জীবন-দেবতার সহিত নিবিড় পরিচয় লাভ করিতে ব্যগ্র। 'নৈবেদ্য'-কাব্যে তিনি প্রাচীন ভারতের প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইলেন এবং সুখদুঃখভরা পৃথিবীকে ভালবাসিলেন। 'খেয়া'-কাব্যে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের কাব্যময় প্রকাশ পাই। এই আধ্যাত্মিক কাকুতি 'গীতাঞ্জলি'-তে প্রকাশ পাইয়াছে। 'গীতাঞ্জলি' যেন দেবতার পায়ে সসম্ভ্রমে 'গীতি-নিবেদন', 'গীতিমাল্য' বঁধুর গলায় গীতিমাল্যের উপহার। 'গীতালি' হইল কবির গানের যুগ, যখন কবির মনে একটা অস্পষ্ট বেদনা জাগিয়াছিল। তারপর আবার 'বলাকা'-তে তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেন—এই কাব্যে তিনি অন্তরে যে গতি-ধর্ম অনুভব করিতেন তাহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'বলাকা'-তে কবি যৌবনকে রাঙটীকা পরাইয়াছিলেন, কিন্তু 'পূরবী'তে জন্ম-মৃত্যুর স্রোতে যৌবনকে চিরজীবী করিতে চাহিয়াছেন। 'মহুয়া'-র মধ্যে দেখিতে পাই যে, প্রেমের অন্তরাস্বাদ কবিকে বহির্যাত্রার পথে বরণ করিয়া লইয়াছে—দেহকে আলিঙ্গন করিবার যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, 'মহুয়া'-কাব্যে তাহা ভস্ম হইয়া মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তিরূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।'

জীবন-দেবতা

রবীন্দ্র-কাব্যের মূল কথা বুঝিতে হইলে, ইহার মূল প্রেরণাকে বুঝিতে হইবে। কবি যখন সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার অন্তরে আর একজন 'আমি' বিরাজ করেন, যাঁহার সংকেতে, যাঁহার লীলায়, যাঁহার বংশীশব্দে তিনি নিজেকে ডুবাইয়া সৃষ্টির আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন। কাব্যের অন্তরালে থাকিয়া যিনি কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা দিয়া যান, তাঁহাকেই রবীন্দ্র কাব্যে 'জীবন-দেবতা' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই জীবন-দেবতার রূপ সম্বন্ধে সতর্ক না থাকিলে রবীন্দ্র-কাব্যকে বুঝিবার পক্ষে পদে পদে বাধা ঘটিবে, তাঁহাকে হেঁয়ালী বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রলোভন আসিবে, রবীন্দ্র-কাব্যরসের দ্বার অবরুদ্ধ থাকিবে।

জগতের যাঁহারা শ্রেষ্ঠ কবি, তাঁহারা সকলেই এবংবিধ প্রেরণায় চালিত হন, কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যে ইহা এত সুস্পষ্ট, এত অর্থপূর্ণ যে, এই দেবতার মর্ম না বুঝিতে পারিলে তাঁহার বৈচিত্র্য, তাঁহার রসানুভূতির প্রসারতা কিছুই ধরা দিবে না।

এই 'জীবন-দেবতা' সম্বন্ধে নানারূপ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়াছে—তাহাতে সমালোচকের পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইতে পারে কিন্তু তাহা রবীন্দ্র-কাব্যরস আস্বাদনের পক্ষে অনুকূল নয়। যে-প্রেরণা, যে-শক্তি নানা রসে, নানা রূপে কবিকে চালিত করিয়াছেন, তিনিই জীবন-দেবতা। এই জীবন-দেবতার সাহায্যেই তিনি জীবনের অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থাকে নম্রতার সহিত গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে এবং সমস্ত ঘটনাকে ঐক্য দান করিতে পারিয়াছেন, বিশ্বচরাচরের মধ্যে নিজের আত্মার সংযোগ অনুভব করিতে পারিয়াছেন; ক্ষণিকের মধ্যে চিরন্তনের, বিচ্ছিন্নের মধ্যে একের, অসম্পূর্ণের ভিতর সম্পূর্ণের উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এই 'জীবন-দেবতা' বিশ্বদেবতা নহে। বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁহার আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবন-দেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে যাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলিয়াছে 'মনের মানুষ।'* বঙ্গবাসী হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক পুস্তকে কবি নিজেই তাঁহার 'জীবন-দেবতা' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

'আজ জানিয়াছি যে, সকল লেখা উপলক্ষ মাত্র—তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে তার একজন রচনাকার আছে যাহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান। ফুৎকার বাঁশীর একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়া এক একটা সুর ভাসাইয়া তুলিয়াছে এবং নিজের কর্তৃত্ব উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিতেছে, কিন্তু কে সেই বিচ্ছিন্ন সুরগুলিকে রাগিণীতে বাঁধিয়া তুলিয়াছে? ফুঁ সুর জাগাইতেছে বটে, কিন্তু ফুঁ ত' বাঁশী বাজাইতেছে না? সেই বাঁশী যে বাজাইতেছে, তাহার কাছে সমস্ত রাগরাগিণী বর্তমান আছে, তাহার অগোচরে কিছুই নাই।...... এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালমন্দ, সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ

* রবীন্দ্রনাথ—'মানব সত্য,' প্রবাসী—১৩৪০, জ্যৈষ্ঠ।

লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবন-দেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া, বিশ্বের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎস্মৃতি তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা পশু-পক্ষীর সঙ্গে এমন একটি পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি, সেইজন্য এতবড় রহস্যময় প্রকাণ্ড জগতকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।'

এইজন্য রবীন্দ্রনাথের খণ্ড কবিতাগুলি বুঝিতে হইলে রবীন্দ্রকাব্যের সমগ্রতার সাহায্যে বুঝিতে হইবে। পরিণাম না জানিয়া একটির পর একটি কবিতা কবি যোজনা করিয়াছেন ; নানা রসের ঘাটে, নানা অভিজ্ঞতার সোপানে, নানা অনুভূতির সুরে নব নব গান রচনা করিয়াছেন ; কিন্তু প্রত্যেকের মধ্য দিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখেন, কিন্তু সুরটা ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বগত হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'আমার পটে একটা ছবি দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে যে একটা রং ফলিয়া উঠিল, সেই রং ও রঙের তুলি ত আমার হাতে ছিল না।'

এই তুলি ও রঙ 'জীবন-দেবতা' জোগাইয়াছে—তাই তিনি বিশ্বানুভূতি জীবন-দেবতার ইঙ্গিতে অনুভব করিয়াছেন। এই জীবনদেবতা তাঁহার জীবনের ক্ষুদ্রতাকে, বন্ধনকে, সীমাকে ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন ; বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা, আনন্দের দ্বারা বিপুলের সহিত, বিরাটের সহিত, মহতের সহিত তাঁহাকে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। জীবন-দেবতার এই লীলা তাঁহার কাছে স্পষ্ট না হইলেও গোপন থাকে নাই। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

'আমার চোখে যে আলো ভালো লাগিতেছে, প্রভাত-সন্ধ্যায় যে মেঘের ছটা ভাল লাগিতেছে, প্রিয়জনের যে মুখচ্ছবি ভাল লাগিতেছে,—সমস্তই সেই প্রেমলীলার উদ্বেল তরঙ্গমালা। তাহাতেই জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখের সমস্ত আলো-অন্ধকারের ছায়া খেলিতেছে।'

তাই যে-শক্তি জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখকে, সমস্ত ঘটনাকে তাৎপর্য দান করিয়াছে, রূপ-রূপান্তর—জন্ম-জন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিয়াছে, বিশ্বচরাচরের

ভিতর ঐক্যভাব আনিয়া দিয়াছে, তাহাকে 'জীবনদেবতা' নাম দিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস
আসি অন্তরে মম ?
দুঃখসুখের লক্ষধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম।
কত যে বরণ, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন
বাসর শয়ন তব।
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলায় লাগিয়া
মূরতি নিত্য নব।'

নিজের জীবনের মধ্যে এই যে শক্তির আবির্ভাব, নিজের অন্তরে এই যে প্রেরণা, ইহা কবিকে কালমহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাই জীবন-দেবতা বিশ্বদেবতা নহে, কোন বিশিষ্ট রূপের স্রষ্টা নহে। ইহা কবিকে গতি দিয়াছে, কাব্যরসে বৈচিত্র্য আনিয়া দিয়াছে, কবির দৃষ্টিকে সার্থক করিয়াছে, কবির অন্তরে বিশ্বানুভূতি দিয়াছে। এই জীবন-দেবতা কবিকে চঞ্চল করিয়াছে, রবীন্দ্র-কাব্যে দ্বৈতবাদ আনিয়াছে, মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বিচিত্র-রূপিণী রূপে দেখাইয়াছে। এই যে গতি, এই চঞ্চলতা, ইহার রহস্যে আবৃত হইয়া কবি বলিতেছেন—

'একি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী !
যেদিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই ?

গ্রামের যে পথ ধায় গৃহ পানে
চাষিগণ ফিরে দিবা-অবসানে,
গোঠে ধায় গরু, বধূ জল আনে
শতবার যাতায়াতে,
একদা প্রথম প্রভাত বেলায়,
সে পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে ;—
পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক্
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে ;
কখনো উদার গিরির শিখরে
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের 'পরে
চলেছি পাগল বেশে।'

রবীন্দ্র-কাব্যের প্রথম সমালোচক মোহিতচন্দ্র সেন বলিয়াছেন—

'এই জীবনদেবতা কে ? কাহাকে লইয়া তিনি মিলন উৎসবে মগ্ন এবং কে তাঁহার মুখের ভাষা কাড়িয়া কথা কহিয়াছেন, 'মিলায়ে আপন সুরে ?' ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রই এই জীবন-দেবতার সহিত বিশ্বদেবতার সৌসাদৃশ্য কল্পনা করিবেন। কিন্তু ইহাকে বিশ্বদেবতা বলিলে কবির আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভোগের যথার্থ তাৎপর্য বুঝা যায় না।' *

এই জীবন-দেবতা রহস্যময় হইলেও কবির কাছে অস্পষ্ট নয়, সেই কারণেই তিনি বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই—

'আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভালবেসেছি।
জনতা বহিয়া চিরদিন ধরে,
শুধু তুমি আমি এসেছি।

---

* 'Jibandebata' is personal—the presiding deity of the poet's life—not quite that even—it is the poet himself—the Inner Self of the poet, who is more than this earthly incarnation.'—Prasanta Mahalanobis.

চেয়ে চারিদিক পানে
কি যে জেগে ওঠে প্রাণে,
তোমার আমার অসীম মিলন
যেন গো সকল খানে।
কতদিন এই আকাশে যাপিনু
সে কথা অনেক ভুলেছি,
তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে
সে আলোকে দোঁহে দুলেছি।
তৃণ-রোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব-আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে ?
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী—
মূক-মেদিনীর মর্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি
এই প্রাণে ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি ?'

* * * *

'হে চির-পুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নতুন করিয়া,
রবে চিরদিন ধরিয়া।'

বহু সমালোচক রবীন্দ্র-কাব্যের এই 'জীবন-দেবতা' র মূল সুরটী ধরিতে পারেন নাই। অজিতকুমার চক্রবর্তী বলিয়াছেন—

'জীবন-দেবতার স্বরূপই হইতেছে বিশ্ববোধ। তিনি কিনা জীবনের সমস্ত ভালমন্দ সমস্ত ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়া জীবনকে একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছেন এবং তিনিই আবার কবির কাব্যে উপস্থিতকে

চিরন্তনের সঙ্গে, ব্যক্তিগত জিনিসকে বিশ্বের সঙ্গে, খণ্ডকে সম্পূর্ণের সঙ্গে মিলিত করিয়া কাব্যকেও তাহার ভাবী পরিণামের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন।'

তাই তিনি 'চিত্রা'-কাব্যের 'উর্বশী' ও 'বিজয়িনী' কবিতাকে জীবন-দেবতার অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়াছেন, কারণ উক্ত দুইটি কবিতায় সমস্ত মানব সম্বন্ধের বিকাশ হইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সংকীর্ণ সীমা হইতে দূরে তাহার বিশুদ্ধতায়, তাহার অখণ্ডতায় উপলব্ধি করিবার তত্ত্ব আছে। ক্ষণিকের মধ্যে, বিচ্ছিন্নতার মধ্যে, অখণ্ডের উপলব্ধি জীবন-দেবতার ভিতরের কথা। অনিত্য স্নেহ প্রীতির সম্বন্ধকে অনন্ত রহস্যময় করিয়া দেখিবার কথা 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতাটিতে বলা হইয়াছে বলিয়া তাহা জীবন-দেবতার ভাবের অন্তর্ভুক্ত কথা। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে জীবন-দেবতার পূর্ণ পরিচয় ব্যাহত হইবে। আমি বিশ্বাস করি যে কবি জীবন-দেবতার প্রেরণায় তাঁহার কাব্যে বিশ্বানুভূতি উপলব্ধি করিয়াছেন, বিচ্ছিন্নতাকে ত্যাগ করিয়াছেন, অখণ্ড পূর্ণ বিশ্বময় জীবন কল্পনা করিয়াছেন। কবির দৃষ্টি গানের দৃষ্টি ; এবং খণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ডকে তিনি দেখিয়াছেন। এই অনির্বচনীয়তা বোধ, এই অপরূপকে দেখিবার চেষ্টা জীবন-দেবতার ইঙ্গিতে সম্ভব হইয়াছে বটে কিন্তু এই সর্বানুভূতি ও বিশ্ববোধ জীবন-দেবতা নহে। অজিতকুমার জীবন-দেবতার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে,

'ডারুইনের মতে প্রত্যেক জীবকোষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, সুতরাং একই মানুষের মধ্যে অগণ্য ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটিয়াছে। কবি তাঁহার দৃষ্টিতে অনুভব করিলেন যে, বিশ্ব অভিব্যক্তির নানা ধারায় তাঁহার যুগযুগান্তরের জীবন প্রবাহিত হইয়াছে। সেই নানা জীবনের নানা ব্যক্তিত্ব তাঁহার মধ্যে আসিয়া মিলিয়াছে—একই অখণ্ড জীবন-দেবতা তাহাদের সকলকে আপনার অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। ফেক্‌নারের চৈতন্যময় বিশ্বপুরুষের আইডিয়ার সঙ্গে গীতার বিশ্বরূপের এবং উপনিষদীয় 'সর্বভূতান্তরাত্মা'র ভাবের সম্পূর্ণ মিল আছে—ইহাই জীবন-দেবতা।'

Dr. Edward Thompson বলেন—

'Rabindranath proved his greatness, both as poet and man, by rising completely above the 'Jibandebata' phase, so that the thought faded out from his work—faded out

gradually, till it was lost in his strong religious experience and absorbed into his general system of thought. The doctrine is of interest because it is not shot through with guesses, some of them psychologically profound; and, while it lasted, it coloured a great deal of fine poetry'.

(Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist)

Dr. Thompson রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা-বাদকে রবীন্দ্র-কাব্যের একটি স্তর হিসাবে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, জীবন-দেবতা অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল 'সোনার তরী'তে। 'বলাকা'তেও তিনি জীবন-দেবতাকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াছেন। কাব্যকে যাঁহারা খণ্ডহিসাবে বিচার করিতে চান, তাঁহারাই কোন্ কোন্ কাব্য জীবন-দেবতা বিষয়ক, সে-দিকে ঝোঁক দেন বেশি। রবীন্দ্র-কাব্যে জীবন-দেবতার লীলা দেখিতে হইলে সমস্ত কাব্যকে বিচার করিতে হইবে, কিন্তু তাহা খণ্ডভাবে নয়, সমগ্রভাবে। ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্ত* এডয়ার্ড টম্‌পসনের মতকে সমর্থন না করিলেও 'জীবন-দেবতা'র মূল কথাকে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে,

'কোন্ কবিতা বাস্তবিক জীবন-দেবতা বিষয়ক, ইহা বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে, কোন্ কাব্যের প্রেরণা আসিয়াছে দেবতার সহিত মিলন বা সেই মিলনের আকাঙ্ক্ষা হইতে। বাস্তবিক সেই সকল কবিতাই এই শ্রেণীর মধ্যে পড়িবে, যাহাদের মধ্যে কবি দেবতার সহিত তাহার সম্পর্কের কথা প্রকাশ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন—এই দেবতা প্রধানতঃ তাহার স্বীয় দেবতাই হউন, অথবা তিনি বিশ্বের দেবতাই হউন, আসল কথা এই, তিনি হইবেন দেবতা।'

জীবন-দেবতার এই সংকীর্ণ ব্যাখ্যার আমি পক্ষপাতী নহি। একথা ঠিক যে, কবির প্রথম বয়সের কবিতায় জীবন-দেবতার রূপ অস্পষ্ট ও রহস্যময় ছিল। ক্রমে ক্রমে কবি এই জীবন-দেবতায় বিশ্বাসী হইয়াছেন। কবির হৃদয়ে বৈচিত্র্য আছে, তাই কবি মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই—তাই অজ্ঞাত থাকিয়া তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন এবং চিরকাল তিনি হৃদয়ে নানা লীলায় প্রকাশিত হইতেছেন। কবি কখনো জীবন-দেবতাকে রমণীরূপে এবং কখনো পুরুষরূপে দেখিয়াছেন। 'তাঁহার বিচিত্ররূপ—তিনি কখনও তাঁহার প্রেয়সী, 'মর্মের গেহিণী,'

* 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যে জীবন-দেবতা'—ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্ত। উদয়ন—জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, ১৩৪১।

'মানসরূপিণী,' কখনও তাঁহার অনির্বচনীয় জীবন-দেবতা। তাঁহার দ্বৈতভাব 'অন্তর্যামী,' 'জীবন-দেবতা'র মধ্যে স্পষ্টভাবে, 'সিন্ধুপারে'র মধ্যে রূপকচ্ছলে প্রকাশ পাইয়াছে।'* এই বিচিত্র সুর আসিয়া পড়ে বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে কথা বুঝিনি জাগে সেই ব্যথা,
জানিনা এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।'

জীবন-দেবতা তাঁহার আলেয়ার আলো, তাহার সংকেতে তিনি সম্মুখে চলিতেছেন, তাই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় তিনি বলিলেন—

'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি,
বল কোন পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু মধুরহাসিনী,
বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে তোমার মনে।'

এই নিরুদ্দেশ যাত্রা হইতেছে মানব-জীবনের চরম গতি। যাহার ইঙ্গিতে এই গতি, সে কথা না বলিয়া শুধু মধুর হাসি হাসে। তাই 'তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে কথা না বলে,' এই ভাবিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজের চঞ্চল চিত্তকে শান্ত করিয়াছেন। প্রভাতকুমার বলিয়াছেন—

'কবি যে অশান্ত, বিরামবিহীন ও চঞ্চল, একথা মোটেই কবিতা নহে, বর্ণে বর্ণে সত্য।'

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ও 'প্রভাতসঙ্গীত'-এর যুগ হইতে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে বিশ্বের আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। এই নিষ্ক্রমণ †—যাহা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'

---

* শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'রবীন্দ্র-জীবনী'—'রবীন্দ্রনাথ যে 'অন্তর্যামী' কবিতাটি লেখেন, সেখানে তিনি অন্তর্যামী অর্থে ঈশ্বরকে বোঝান নাই। লৌকিক ভাষায় আমরা ঈশ্বরকে অন্তর্যামী বলি—তাই অনেক সমালোচক জীবনদেবতাকে দেবতা বা ভগবান বলিয়া ভাবেন।'

† ইহাকে অনেকে শুধু poetic henotheism বলিয়া ধরেন—

'In the Bengali tragedy ('Prakritir Protisodha'), the Sannyasi struggles with a feeling of tenderness for a lovely child of Nature, the stir of a fatherly instinct, the inner workings of the heart for an outlet to its pent-up affections. Hence, the conflict is between an individualistic search after truth, in the fashion of the Indian ascetic idealism, and the

কবিতাতে দেখি, অর্থাৎ সীমা উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া চলা, ইহা রবীন্দ্রকাব্য-সাধনার মূল সুর। সেই অনুভূতির প্রেরণায় তিনি লিখিয়াছেন—

'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।'

এই নিষ্ক্রমণের বেগে 'মানসী'-যুগে তিনি যে মানস-সুন্দরীর ইঙ্গিতে চলিয়াছিলেন তাহাকেই জীবন-দেবতার অগ্রদূত বলা যাইতে পারে।* কম্পিত অন্তরে কবি ভাবিতেছেন—

'কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া
এসেছি ভুলে',
তবু একবার চাও মুখপানে
নয়ন তুলে।'

কিন্তু তাঁহার সাহস হইতেছে না। দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—

'চারিদিক হতে বাঁশী শোনা যায়,
সুখে আছে যারা তারা গান গায়;
আকুল বাতাসে, মদির সুবাসে,

---

necessity of individualistic affection, and does not rise to the high platform of a representative struggle of the race between the ideal goals of infinite knowledge and infinite love...The same limitation characterises the author's Prabhat-Sangita and Sandhya-Sangita (Songs of Sunrise and of Sunset). Along with the rays of the waxing or waning light, of the rising or setting sun, come floating to the poet's soul, gossamer-like, underneath the grey skies, aerial fascinations and somnolescences, dissolving phantasms and sleepy enchantments, twilight memories of days of fancy and fire, ghostly visitings of radiant effulgences, or the lightning-flashes of Maenad-like inspiration, which the poet transfixes and crystalises for us in many a page of delicate, silver-lined analysis, of subtly-woven, variegated imaginative synthesis. In these songs it is that Bengali poetry rises to the pitch of the new-romantic lyric. Two of the constituent elements, the criticisn of life, whether negative or reconstructive, and the mythopoeia, are almost wholly wanting, and the third element, the transfiguration, is all in all.........A mood or emotion is transfigured and for the moment raised to the infinite and the absolute. By an unconscious synthesis of the poetic imgination, the entire Universe assumes for the moment the hue of this mood or feeling, giving rise to a kind of universal hallucination which may be aptly termed, poetic henotheism'.—Dr. Brojendranath Seal-প্রণীত 'New Essays in Criticism.'

* শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়-প্রণীত—'রবীন্দ্র-জীবনী।'

বিকচ ফুলে,
এখনো কি কেঁদে চাহিবেনা কেউ
আসিলে ভুলে ?'

কবি নিজেকে আশ্বস্ত করিয়া 'পূর্বকালে' কবিতায় বলিয়াছেন—

'অনাদি বিরহ বেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ।'

তাই আবার বলিয়াছেন 'অনন্ত প্রেম' কবিতায়—

'তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।'

কিন্তু আবার 'আশঙ্কা' জাগিয়াছে, তাই লিখিয়াছেন—

'সকল গান সকল প্রাণ
তোমারে আমি করেছি দান
তোমারে ছেড়ে বিশ্বে মোর
তিলেক নাহি ঠাঁই।'

তাই এত আকুলতা, অথচ দ্বন্দ্ব আছে; এত বিরামহীন চঞ্চলতা, অথচ তাঁহার বিশ্বাস আছে—কারণ, 'যতদূর হেরি দিগদিগন্তে, তুমি আমি একাকার।' রবীন্দ্রনাথ ভাবিয়াছিলেন যে, এই গতির, এই পরিবর্তনের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া তিনি একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমিতে দাঁড়াইতে পারিবেন,* কিন্তু কবি যদি এমনই একটা জায়গায় পৌছান, সেখান হইতে তিনি স্থানচ্যুত হইবেন না, তাহা হইলে সেটা হইবে কাব্যের মরণ; তাহাতে সাধন-ধর্মের জয় হইতে পারে। সেই সংশয়িত চঞ্চল জীবন রবীন্দ্র-কাব্যে সর্বথা দেখা যায়। এইখানেই কবিধর্ম ও সাধনধর্মের পার্থক্য।

---

* অবিশ্রাম পরিবর্তন দেখলে ভয় হয় যে এতকাল ধরে যে লিখলুম, সেগুলো কিছুই হয়ত টিকবে না। আমার নিজের যেটা যথার্থ চরম অভিব্যক্তি, সেটা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ ওগুলো কেবল tentative ভাবে আছে। বাস্তবিক কোনটা সত্য কোন্‌টা মিথ্যে কবে যে ধরা পড়বে তার ঠিক নেই কিন্তু আমি দেখেছি, যদিও এক এক সময়ে সন্দেহের অন্ধকারে মন আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং আমার পুরাতন সমস্ত লেখার উপরেই অবিশ্বাস জন্মে, তবু মোটের উপর মন থেকে এই আত্মবিশ্বাসটুকু যায় না যে, যদি যথেষ্টকাল বেঁচে থাকি, তাহলে এমন একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমিতে গিয়ে পৌঁছিব, যেখান থেকে কেউ আমাকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না।' (প্রমথ চৌধুরীর নিকট লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, সবুজপত্র—১৩২৪)

'সোনার তরী'-কাব্যে জীবন-দেবতার রূপ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'মানসী'-যুগে যে মানস-সুন্দরী অস্পষ্টতায় আবৃত ছিল, 'সোনার তরী'তে সে সুস্পষ্ট; তাই তিনি বলিয়াছেন—

'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।'

'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথের সাধন-তরী। জীবনকে খণ্ডিত করায় মিথ্যা ও ব্যর্থতা আছে। 'আমাকে লহ করুণা করে'—ইহা সাধনার কথা। সমস্ত কামনা ও বাসনা ত্যাগ করিয়া কবি আত্মদান করিয়াছেন। সর্বশেষে জীবন-দেবতার দ্বারা কবির প্রত্যাখ্যানের কারণ এই যে, সকল কামনা বিসর্জনের পরেও মানবের সাধনার এবং অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন থাকে। 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী'—এখানে জীবন দেবতার* সেই ইঙ্গিত আছে। তিনি কবির কর্মকে গ্রহণ করিলেন, কবিকে মুক্তি দিলেন না।

সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী-যুগে রবীন্দ্রনাথ জীবন-দেবতাকে প্রণয়ীরূপে দেখিয়াছেন। জীবন-দেবতা স্পষ্ট হইলেও তাহার রহস্য অন্তর্হিত হয় নাই। 'মানস-সুন্দরী' কবিতাতে কবি বলিতেছেন—

'হাসিতেছ ধীরে
চাহি মোর মুখে, ওগো রহস্যমধুরা,
কী বলিতে চাহ মোরে প্রণয়বিধুরা
সীমন্তিনী মোর। কী কথা বুঝাতে চাও।
কিছু বলে কাজ নাই, শুধু ঢেকে দাও
আমার সর্বাঙ্গমন তোমার অঞ্চলে,
সম্পূর্ণ হরণ করি লহগো সবলে
আমার আমারে। (সোনার তরী)

এই সুন্দরী, 'বাসনা-বাসিনী' তাঁহার 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র আকর্ষণে কবিকে মুগ্ধ করিয়া জানা হইতে অজানার দিকে লইয়া যাইতেছেন; ইহাতে নব নব পরিচয়, নব নব অভিব্যক্তি লাভ করা যায়, কিন্তু ইহার শেষ নাই। কারণ, সুন্দরী শুধু হাসেন, শুধু মুগ্ধ করেন, কিন্তু তাঁহার বাণী নাই; তাঁহার ইঙ্গিত

---

* 'It is Jibandebata entering his work; the genius of his life and effort crossing the world-stream in his Golden-Boat'—E. J. Thompson-প্রণীত 'Rabindranath Tagore.'

আছে, প্রেরণা আছে কিন্তু কোন স্থূল দৃষ্টি নাই। তাই কবি প্রণয়কাতর হইয়া 'প্রত্যাখ্যান' কবিতায় বলিয়াছেন—

'কি ধন তুমি এনেছ ভরি দুহাতে।
অমন করি যেওনা ফেলি' ধূলাতে।
এ ঋণ যদি শুধিতে চাই,
কী আছে হেন, কোথায় পাই,
জনম তরে বিকাতে হবে আপনা,
অমন দীন নয়নে তুমি চেয়োনা।
(সোনার তরী)

কিন্তু কবি আবার বলিতেছেন—

দে দোল্ দোল্
দে দোল্ দোল্
ঐ মহাসাগরে তুফান তোল্।
বঁধুরে আমার পেয়েছি আবার ভরেছে কোল।
(সোনার তরী)

'সোনার তরী'-কাব্যে এই তন্ময়তা, জ্ঞান অপেক্ষা ভাব এবং সেই ভাবের মধ্যে গূঢ়তা আছে। তাই জীবন-দেবতা সম্বন্ধে এই ভাবময় ধারণা—প্রণয়ীরূপে, রহস্যময়ীরূপে, না-পাওয়ারূপে।

'চিত্রা'-কাব্যে জীবন-দেবতা ভাবের কবিতা—অন্তর্যামী, সাধনা, জীবন-দেবতা, সিন্ধুপারে, আত্মোৎসর্গ, শেষ উপহার।* 'চিত্রা' কবিতায় কবি তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে বর্ণনা করিয়াছেন। যাহার পরিচয় কবি অন্তরে পাইয়াছেন, তাহাকেই তিনি অনন্ত বিচিত্ররূপে দেখিতে চাহেন—তাই তাহার সুদূর আকাশে মুখর নূপুরের রিণিঝিনি, মৃদুবাতাসে অলকগন্ধ, নিখিল-চিত্তে নানা রাগিণী। কবির কাব্য-প্রেরণা এই 'বিচিত্ররূপিণী' হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই বৈচিত্র্যকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া কবি বলিতে পারিয়াছেন—

'আমি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র করে তুলেছে, আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে জানছি নানা ভাবে। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা আমার আত্মবোধ সর্বদা উৎসুক হয়ে থাকে। বাইরের অবস্থা একঘেয়ে হ'লে মানুষকে মনমরা করে, আমাতে যে আছে সেও নিজেকে বহুর মধ্যে পেতে চায়,

* চারু বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 'রবি-রশ্মি'।

উপলব্ধির ঐশ্বর্য সেই তার বহুলত্বে। আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে বহুর ধারা, রূপে রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে ; তারই প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলেছে —'আমি আছি' এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ, অস্পষ্টতাতেই অবসাদ।'

তাই কবি জীবন-দেবতাকে বলিতেছেন—

'ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আন নব রূপ আন নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবন ডোরে।'

উপলব্ধির এই ঐশ্বর্য আছে বলিয়াই কবির অন্তরে বিচিত্র ভাব খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। 'চিত্রা'-কাব্যে অনুভূতির এই বিচিত্রতা রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। সংসারের যে সাধারণ একজন মানুষ, সে অসংখ্যের মাঝে মাত্র একজন—সেখানে তাহাকে ক্ষুদ্র ভার বহিতে হয়, কত অনুগ্রহ, কত অবহেলা সহিতে হয়। এই পরিচয়হীন প্রবাহ অতি তুচ্ছ। কিন্তু কবি যে-প্রেমিকার ইঙ্গিতে চালিত হইতেছেন, তাহারই প্রেমের ঐশ্বর্যে যত দৈন্য, লাজ, ক্ষুদ্রতা, সব অবসান হইয়াছে। তাহারই হাত ধরিয়া তিনি প্রেমের 'নন্দনভূমি অমৃত আলয়ে' পৌছিয়াছেন এবং সেখানে তিনি 'জ্যোতিষ্মান অক্ষয় যৌবনময় দেবতাসমান'। তাই কবি 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাতে বলিতে পারিয়াছেন—'তুমি মোরে করেছ সম্রাট, তুমি মোরে পরায়েছ গৌরব মুকুট'। এই প্রেমকে আরও নিবিড়ভাবে পাইবার জন্য তিনি তাঁহার নিজের কণ্ঠমালা ত্যাগ করিয়া, নিজের রাজটীকা বিসর্জন দিয়া তাঁহার অন্তরের প্রেমিকাকে তিনি নিজে সাজাইতে চাহেন। তাই কবি 'আবেদন' কবিতায় তাঁহার সৌন্দর্যলক্ষ্মীর কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন যে, 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।' অন্তরের এই পূজার একাগ্রতা, প্রয়োজনের বাহিরে গিয়া আনন্দ আহরণ এই কবিতায় বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কবি-জীবনের আদর্শ এই বিশ্বসৌন্দর্যকে সেবা করা ; তিনি মহারাণীর কাছে নিঃসংকোচে পুরস্কার চাহিলেন—

'প্রত্যহ প্রভাতে
ফুলের কঙ্কণ গড়ি,' কমলের পাতে

আনিব যখন,—পদ্মের কলিকাসম
ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি করে ধরি মম
আপনি পরায়ে দিব এই পুরস্কার।
অশোকের কিশলয়ে গাঁথি দিব হার,
প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে
চিত্রি' পদতল, চরণ অঙ্গুলি-প্রান্তে
লেশমাত্র রেণু, চুম্বিয়া মুছিয়া লব,
এই পুরস্কার।'

ইহাই 'জীবন-দেবতার' আরতি *—ইহাতে সম্পত্তির প্রতি লোভ নাই, তথাকথিত প্রয়োজনের তাগিদ নাই, কোন পার্থিব দাবি নাই—এখানে কবি রস-পিপাসু, সৌন্দর্যের লুণ্ঠনকারী ও ভিখারী। কিন্তু মাঝে মাঝে আবার কবির মনে হয় যে, যে-লক্ষ্মীকে তিনি সেবা করিতেছেন, যে-লক্ষ্মীর সেবায় তিনি ঐশ্বর্যবান হইয়াছেন, হয়তো সর্বত্র তাহাতে একটা বিফলতা আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া আছে। তাই দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহার 'ব্যর্থ-সাধনা' তিনি আনিয়াছেন দেবীর চরণে অর্পণ করিয়া তাহা সফল করিয়া লইতে। তিনি পথে খেলা করিয়া দেবীকে অবহেলা করেন নাই, তিনি সারাবেলা তাঁহারই সাধনা করিয়াছেন, সুতরাং কবি 'সাধনা' কবিতাতে বলিতে পারিলেন—

'যা কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠধন
দিতেছি চরণে আসি'
অকৃত কার্য, অকথিত বাণী, অগীত গান
বিফল বাসনা রাশি।

** ** ** **

'তুমি যদি দেবী লহ কর পাতি,'
আপনার হাতে রাখো মালা গাঁথি,

* 'হৃদয়-অরণ্য' হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া কবি নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের সুন্দর প্রভাতের সুর অতিক্রম করিয়া মানসীযুগের ভিতর দিয়া সোনার তরীর যুগের যে অন্তর-দেবতার বা জীবন-দেবতার সন্ধান পান, চিত্রার যুগে তাহারই স্তব্ধ অতল স্নিগ্ধ নীলিমার বিচিত্ররূপের কাছে কবি আজ দীন সেবক; কিন্তু সোনার তরীতে যে জীবন-দেবতাকে উদ্‌ভিদ্যমান ব্যক্তিত্ব হিসাবে দেখিয়াছেন, এখানে তাহাকেই আবেশপূরিত রসাপ্লুত অন্তরের নিবিড়তা দিয়া পরাণ-বঁধুয়ারূপে আরতি করিতেছেন।'—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 'রবি-রশ্মি'।

নিত্য নবীন র'বে দিনরাতি সুবাসে ভাসি'

সফল করিবে জীবন আমার বিফল বাসনারাশি।'

চৈতালী-কাব্যেও রবীন্দ্রনাথ পরাণ-বঁধুয়াকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

'লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল

জীবনের সকল সম্বল

নীরবে নিতান্ত অবনত

বসন্তের সর্ব-সমর্পণ,

হাসিমুখে নিয়ে যাও যত

বনের বেদন নিবেদন।'

ইহাতে পূর্ণতা আছে, এবং স্নিগ্ধ শান্তিও আছে। তাই কবির দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ধরিয়াছে এবং 'পরিপূর্ণ বেদনার ভারে' ফাটিয়া পড়িতেছে।

'চৈতালী'র পর হইতে রবীন্দ্র-কাব্যের দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইল। এই যুগকে সূচনা করিয়াছে 'কল্পনা,' 'কথা,' 'কাহিনী.' 'ক্ষণিকা' ও উৎসর্গ' এবং ইহা পরিণতি লাভ করিয়াছে 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি,' 'খেয়া,' 'গীতিমাল্য'-কাব্যে। 'কল্পনা'-কাব্যে ১৩০৪-১৩০৬ সালের ভিতর যে খুচরা কবিতা ও গান রচিত হইয়াছিল, তাহাই একত্র করিয়া পরিবেশিত হইয়াছে—তবুও 'কল্পনা' কাব্যে 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র জীবনের নিকট হইতে বিদায়ের সুর আছে। অজিত চক্রবর্তী বলেন যে, 'কল্পনা'-কাব্যে পূর্ব জীবনকে বিদায় দিবার দীর্ঘনিশ্বাস সকল কবিতার মধ্যেই আছে। সেই বিদায়ের বিষাদসুর 'দুঃসময়' কবিতায় সুস্পষ্ট। কবির মনে হইতেছে যে, তিনি 'সঙ্গীহীন,' ক্লান্তি অঙ্গে নামিয়া আসিয়াছে, আশাহীন, গৃহহীন, কোথাও স্নেহ-মোহবন্ধন নাই; তবুও মনে হইতেছে—

'ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি' অঙ্গুলি

ইঙ্গিত করি' তোমাপানে আছে চাহিয়া।

নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি'

শত তরঙ্গে তোমা পানে উঠে ধাইয়া।

বহুদূর তীরে কা'রা ডাকে বাঁধি' অঞ্জলি

এসো এসো সুরে করুণ মিনতি-মাখা

ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,

এখনি, অন্ধ, বন্ধ করোনা পাখা।'

কারণ, কবি জানেন যে, তাঁহার পাখা আছে, আর আছে, 'উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা মহানভঅঙ্গন'। অতএব পাখা বন্ধ করিলে চলিবে না, তাই কবি বিদায়ের বেদনা অতিক্রম করিয়া নূতন সুরে বাজিয়া উঠিলেন। সেই সুরের সঙ্গে পরিচয় লাভ ঘটে 'নৈবেদ্য,' 'গীতাঞ্জলি,' 'খেয়া,' 'গীতিমাল্য'-কাব্যে। হতাশার সুরে 'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতায় কবি বলিতেছেন—

'রয়েছি বিজন রাজপথপানে চাহি'
বাতায়নতলে বসেছি ধূলায় নামি,'
ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি ॥

কিন্তু হতাশার ভিতরেও কবি তাঁহার জীবন-দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

'তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া,
এ কি সত্য।
আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে
চির জনমের বিরাম লভিলে পলকে,
এ কি সত্য।
মোর সুকুমার ললাট-ফলকে
লেখা অসীমের তত্ত্ব,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য ॥"

'অশেষ' কবিতায় কবি আবার জীবন-দেবতার আহ্বান শুনিতেছেন—এখানে কবি তাহাকে মোহিনী, নিষ্ঠুরা, রক্তলোভাতুরা, কঠোর স্বামিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, কারণ এই মোহিনী তাঁহাকে শ্রান্তি দিতেছে না। তাই কবি বলিতেছেন, হে জাগ্রত রাণী, তোমার সন্ধ্যাকালে কি বৈরাগ্যের বাণী বাজে না, সেখানে কি পাখীরা ঘুমায় না, সেখানে কি ক্লান্তি নাই, লতাবিতানের তলে নিভৃত শয়ান নাই? সব সেবকই ছুটি পাইয়াছে, শুধু আমি পাই নাই। নিরন্তর আমি তোমার আহ্বান শুনিতেছি। কবি সেই আহ্বানকে অগ্রাহ্য করেন নাই, করিতে পারেন না এবং সেই আহ্বানের গর্বে তিনি সারারাত্র অনিদ্র নয়নে থাকেন। ক্লান্তির অবসাদ দূর করিয়া কবি বলিতেছেন—

'বলো তবে কী বাজাব, ফুল দিয়ে কী সাজাব
তব দ্বারে আজ,
রক্ত দিয়ে কী লিখিব, প্রাণ দিয়ে কী শিখিব,
কী করিব কাজ।
যদি আঁখি পড়ে ঢুলে, শ্লথ হস্ত যদি ভুলে
পূর্ব নিপুণতা,
বক্ষে নাহি পাই বল, চক্ষে যদি আসে জল,
বেধে যায় কথা,
চেয়োনাকো ঘৃণাভরে, করোনাকো অনাদরে
মোরে অপমান,
মনে রেখো, হে নিদয়ে, মেনেছিনু অসময়ে
তোমার আহ্বান ॥

** ** **

হবে, হবে, হবে জয় হে দেবী করিনে ভয়,
হব আমি জয়ী
তোমার আহ্বান বাণী সফল করিব রাণী
হে মহিমময়ী।'

সেই আহ্বানকে সফল করিবার জন্য কবি নূতন যাত্রাপথে আবার বাহির হইলেন—প্রভাতের পাখীর কলরব সেখানে থেমে যাক, প্রভাতের ফুলগুলি, প্রভাতের সচঞ্চল বায়ু এখন বন্ধ হোক; শুধু 'নীরবে উদয় হোক্, অসীম নক্ষত্রলোক, পরম নির্বাক।' কবির আধ্যাত্মিক জীবনের ইহাই পূর্বসূচনা। অজিতকুমার * বলিয়াছেন—

'দুঃখসুখ আশা ও নৈরাশ্যের দ্বারা ক্রমাগত জীবনকে খণ্ডিত করিয়া আপনার দিকে তাহাকে টানিয়া রাখিবার যে বেদনা কবিকে পীড়ন করিতেছিল, সেই আপনার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য সমস্ত 'কল্পনা'র কবিতাগুলির মধ্যে কি কান্না! সেই আপনার সমস্ত সুখদুঃখের উপরে বৈশাখের রুদ্র-রৌদ্র-বিকীর্ণ

* 'রবীন্দ্রনাথ'—এই গ্রন্থে কল্পনা-কাব্যের সম্যক ব্যাখ্যা আছে। কবির আধ্যাত্মিক জীবনের সেতু হিসাবে কল্পনা-কাব্য গৃহীত হইবে এবং জীবন-দেবতার আহ্বানেই তিনি সেই জীবনের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন; তাই তিনি বলিয়াছেন—'মোর শেষ কণ্ঠস্বরে, যাইব ঘোষণা করে, তোমার আহ্বান।' ইহা অর্থহীন নহে।

বিস্তীর্ণ বৈরাগ্যের গেরুয়া অঞ্চল পাতিয়া দিয়া আপনাকে দগ্ধ করিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিবার আকাঙ্ক্ষাই 'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখের' গম্ভীর ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বদেশের প্রতি অনুরাগের এবং তাহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিবার আকাঙ্ক্ষার আভাস 'কল্পনা'র অনেক কবিতার মধ্যে বিদ্যমান। 'মাতার আহ্বান', 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ' প্রভৃতি কবিতা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বদেশ-বোধ এখনও অতি ক্ষীণ। কেবল আপনার পূর্বজীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ-জনিত যে বিষাদ ও বৈরাগ্য কবির অন্তরে নামিয়াছে—তাহাই যেন একটা বড় বাণী বলিবার উপক্রম করিতেছে—'বর্ষশেষে'র রুদ্রক্রন্দনছন্দে যে বাণীর খানিকটা পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।'

'কথা' ও কাহিনী'-কাব্যেও কবি ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন—ভারতবর্ষের ত্যাগধর্মকে বুঝিতে চেষ্টা করেন। এখানে কবির ঐতিহাসিক চেতনার সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়। এই দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছে 'নৈবেদ্য'-কাব্যে।

'ক্ষণিকা'-কাব্যেও রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের অয়োজন চলিতেছে এবং তিনি যৌবনের কাছে বিদায় লইলেন। 'ক্ষণিকা'র কবিতাকে মোহিতচন্দ্র সেন তাঁহার কাব্যগ্রন্থে 'লীলা' নাম দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই কৌতুকহাস্যের ভিতর গভীর অর্থ লুক্কায়িত আছে। তিনি 'ক্ষণিকা'র মধ্য দিয়া চিরন্তনের স্বাদ পাইয়াছেন। এই কাব্যে তিনি জীবন-দেবতাকে ফিরিয়া পাইলেন—

'পথে যতদিন ছিনু ততদিন
অনেকের সনে দেখা,
সব শেষ হ'ল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।'

এই জীবন-দেবতাকে কবি বারবার পাইয়াছেন, আবার হারাইয়াছেন, তাই এত বৈচিত্র্য। এই দেবতাকে তিনি গোপন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহারই ইঙ্গিতে তিনি বাহির হইয়া পড়েন। তাই তিনি 'কল্যাণী'-কে বলেন যে, সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ গান তোমার জন্যই আছে; এই কল্যাণীকেই আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

'যেমন আছ তেমনি এসো
আর করোনা সাজ।

বেণী না হয় এলিয়ে র'বে,
সিঁথে না হয় বাঁকা হবে,
নাইবা হোলো পত্রলেখায়
সকল কারুকাজ।
কাঁচল যদি শিথিল থাকে,
নাইক তাহে লাজ ॥'

কবি তাঁহার পরাণবঁধুকে বলিতেছেন, তোমার গৃহকাজ এখনও হয়নি, অতিথি যে আসিয়া পড়িল। অতিথি প্রশ্ন শুধাইলে তুমি দুয়ার-কোণে দাঁড়াইয়া থাকিও—কথা তুমি না-ই বলিলে। কিন্তু এখনও কি তোমার সন্ধ্যাসাজ হয় নাই?

এই অন্তরতমকে কবি আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন—

'আমি যে তোমায় জানি, সে তো কেউ জানেনা।
তুমি মোর পানে চাও, সে তো কেউ মানেনা।'

* * *

'বলিনে তো কারে, সকালে বিকালে
তোমার পথের মাঝেতে,
বাঁশি বুকে লয়ে বিনা কাজে আসি
বেড়াই ছদ্ম সাজেতে।
যাহা মুখে আসে গাই সেই গান,
নানা রাগিণীতে দিয়ে নানা তান
এক গান রাখি গোপনে।
নানা মুখপানে আঁখি মেলি চাই
তোমা পানে চাই স্বপনে।'

এই 'অন্তরতম', এই 'কল্যাণী', এই 'ক্ষণিকা' কবিকে নিতান্ত তুচ্ছতার মধ্য দিয়া সৌন্দর্যের মধ্যে লইয়া যাইতেছে। কবির ভোগের জীবন গতপ্রায়, তিনি মুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল, সহজ হইবার জন্য আকুল।

কারণ কবি বুঝিয়াছেন—

'কখন যে পথ আপনি ফুরাল
সন্ধ্যা হ'ল যে কবে,
পিছনে চাহিয়া দেখিনু, কখন
চলিয়া গিয়াছে সবে।'

তাই নূতন গানের সুরের জন্য কবি অধীর হইলেন—তিনি বিষাদের সুর অতিক্রম করিতেছেন। কবি বুঝিতেছেন যে, সংসারে কিছুই থাকিবেনা, মালাও শুকাইয়া যায় এবং যে-জন মালা পরে, সে-ও অমর থাকেনা। এই ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে উঠিয়া কবি বলিতেছেন—

'ফুলের দিনে যে মঞ্জরী,
ফলের দিনে যাক্ সে ঝরি'।
মরিস্‌নে আর মিথ্যে ভেবে,
বসন্তেরি অন্তে এবে
যারা যারা বিদায় নেবে
একে একে যাক্‌রে সরি।
হোক্‌রে তিক্ত মধুর কণ্ঠে,
হোক্‌রে রিক্ত কল্পলতা,
তোমার থাকুক পরিপূর্ণ
একলা থাকার সার্থকতা।'

তাই কবি ক্রমশঃই গভীরতর নিবিড়তর লোকে প্রবেশ করিতেছেন।* কবি-জীবনকে শেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করিতেছেন। 'উৎসর্গ'-কাব্যেও কবি সেই ইঙ্গিতে ছুটিতেছেন। তাই কবি শুধু তাঁহার জীবন-দেবতার মুখের দিকে চাহিয়া তিমির রাত্রে তরণীখানা বাহিয়া ছুটিতেছেন; কারণ—

'অরুণ আজি উঠেছে
অশোক আজি ফুটেছে,

* 'কবির অতীত জীবনের সুরু হইতে ভাবরাজ্যে যে সব স্তর পরপর অতিক্রম করিয়া তিনি আসিয়াছেন—কবিতাগুলির মধ্যে (ক্ষণিকা-কাব্যে) সবেরই চিহ্ন যেন রহিয়া গিয়াছে। যৌবনের চঞ্চলতা ধীরে ধীরে গ্রন্থের মাঝখানে স্বচ্ছ সরোবরের শান্ত সৌন্দর্যের মধ্যে সমাহিত হইয়া আসিয়াছে; সেখানকার কবিতাগুলি প্রথমদিকের কবিতা হইতে গভীর, স্নিগ্ধ। গ্রন্থের শেষদিকে আসিয়া দেখি কবি বিগত জীবনের অনেক ভ্রান্তি অনেক ক্লান্তি অনেক মোহকে বিসর্জন দিতে উদ্যত।' 'রবীন্দ্র-জীবনী'—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

অজিতকুমারও বলিয়াছেন যে, 'কল্পনা'র কারুখচিত প্রাচীনকালের সৌন্দর্যের সুনিপুণ রচনার নীচে এবং 'ক্ষণিকার' কৌতুক-হাস্যোজ্জ্বল তরল সৌন্দর্যপ্রবাহের তলায় পূর্বজীবনের আর্টের জীবনেরএকটি সমাধি তৈরী হইয়াছে।

না যদি উঠে, না যদি ফুটে,
তবুও আমি চলিব ছুটে,
তোমার মুখে চাহিয়া।'

কবি জানেন যে, তাঁহার কিছু ধন আছে সংসারে, আর বাকী ধন আছে 'নিভৃত স্বপনে'। জীবন-দেবতার লীলাকে কবি বুঝিতে পারিয়াছেন—বাহিরে হাসির ছটা থাকিলেও তিনি ভিতরকার 'আমি'র খবর রাখেন। সবই ছল, সবই লীলা, তাই জীবন-দেবতা যে-কথা বলিতে চাহেন, সে-কথা বলেন না, যে-পথে চলিতে চাহেন, সে-পথে চলেন না। কারণ—

'সবার চেয়ে অধিক চাই
তাই কি তুমি ফিরিয়া যাও ?
হেলার ভরে খেলার মত
ভিক্ষাঝুলি ভাসায়ে দাও ?
বুঝেছি আমি বুঝেছি তব ছলনা,
সবার যাহে তৃপ্তি হ'ল
তোমার তাহে হ'ল না।'

কবি জীবন-দেবতাকে চিনিয়াছেন বলিয়া, জীবন দেবতার ছল বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া 'আপন গন্ধে মম, কস্তুরী মৃগসম' পাগল হইয়া বনে বনে ফিরিতেছেন। তিনি যাহা চান, তাহা ভুল করিয়া চান এবং যাহা পান, তাহা চান না। এইরূপ অন্ধের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি জীবনের নানা রসের, নানা সৌন্দর্যের স্তর পার হইয়া সুদূরের দিকে ছুটিতেছেন। তাই তিনি 'সুদূরের পিয়াসী' হইয়াছেন, নিজের মনের বিরহিণী নারীকে আবিষ্কার করিয়াছেন, কুঁড়ির ভিতরে অন্ধ গন্ধকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন যে, দখিন পবন তোর কামনাকে জানিয়াছে—

'না জানি কারে দেখিয়াছি—
দেখেছি কার মুখ।
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি।
*　　*　　*
না বোঝা মোর লিখনখানি
প্রাণের বোঝা ফেলিল টানি'
সকল গানে লাগায়ে দিল সুর।'

কিন্তু এই সুর এখন ত্যাগের সহিত ধ্বনিত হইয়া উঠিতে চাহে। কবি এখন নিজেকে উৎসর্গ করিয়া জীবনকে বড় করিয়া পাইতে চাহেন—সেই সুর 'উৎসর্গ'-কাব্যে সুস্পষ্ট, এই আকুতিই 'খেয়া'-কাব্যে স্পষ্টতর হইয়াছে। তাই কবি বলিতেছেন—

'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।'

'উৎসর্গ'-কাব্যে রবীন্দ্রনাথ জীবন-দেবতাকে নানারূপে দেখিয়াছেন—কখনও কবি জীবন-দেবতার রাজসভায় বাঁশি বাজাইবার ভার পাইয়াছেন, কখনও প্রণয়ীরূপে তিনি কবির বাতায়নে আসিয়া গান শুনাইয়া যান, কখনও তিনি ললাটে বহ্নিলেখার মত তিলকরেখা দিয়া হাতে লৌহদণ্ড লইয়া ভীষণরূপ তাপসমূর্ত্তিতে দেখা দেন, কখনও সুন্দরী ও কল্যাণী নারীরূপে, কখনও বিদেশী পথিকরূপে। কবি বলিয়া উঠিলেন—

'সুমুখে যেমন পিছেও তেমন
মিছে করি মোরা গোল।
চিরকাল এ কি লীলা গো
অনন্ত কলরোল।'

একথা ঠিক যে, কবি বিচিত্রতার জীবনকে বিদায় দিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু কবির আধ্যাত্মিক সাধনার পথ তাঁহার নিজস্ব। আমরা ভাবি যে, সংসার করিতে হইলে আচারের বন্ধনকে স্বীকার করিতে হইবে এবং আধ্যাত্মিক জীবন অবলম্বন করিতে হইলে সংসারকে ত্যাগ করিয়া

সন্ন্যাসী হইতে হইবে। আমরা ধর্ম ও সমাজকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া লই। আমরা ভাবি সংসার-চিন্তা ও পরমার্থ-চিন্তা পরস্পর-বিরুদ্ধ। জীবনের এক একটি দিককে এই খণ্ডভাবে দেখিলে তুচ্ছতা, হীনতা আসিয়া ভাবধারাকে সংকীর্ণ করিয়া দেয়, এই সংকীর্ণতাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের পরমার্থচিন্তা এবং সংসার-চিন্তা প্রবাহিত হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ এই খণ্ডদৃষ্টির পক্ষপাতী নহেন এবং তাঁহার মতে ভারতের প্রাচীন তপস্যা এই খণ্ডভাব-প্রসূত নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন—

'জগতের সম্বন্ধগুলিকে ধ্বংস করিতে পারি না, তাহাদের ভিতর দিয়া গিয়া তাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইতে পারি। এই ভিতর দিয়া যাওয়াটাই সাধনা। গ্রহণ এবং বর্জন, বন্ধন এবং বৈরাগ্য, এ দুটাই সমান সত্য—একের মধ্যে অন্যটির বাসা, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া সত্য নহে।'

তাই ভোগকে অস্বীকার করিয়া নয়, ভোগকে অতিক্রম করিয়া ত্যাগের জীবন গ্রহণ করিতে হয়। এই সমন্বয় রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের মূল কথা। এই মূল সুর রণিত হইয়াছে 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি', 'খেয়া', 'গীতিমাল্য'-কাব্যে। ভারতবর্ষের সেই প্রাচীন সাধনাকে তিনি প্রচার করিয়াছেন কবির দৃষ্টিতে, অনুরঞ্জিত করিয়াছেন কবির ভাবে। রবীন্দ্র-কাব্যের এই আধ্যাত্মিক সুর য়ুরোপকে মুগ্ধ করিয়াছিল—কারণ ইংরাজী গীতাঞ্জলির মধ্যে বাংলা 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'নৈবেদ্য' ও 'খেয়া'-কাব্যের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কবিতা ও গানগুলি স্থান পাইয়াছে।

প্রমথ চৌধুরী বলেন :

'রবীন্দ্রনাথের বাণী ইউরোপের বহু লোকের মনে যে প্রবেশ করেছে ও স্থান পেয়েছে, এটা হচ্ছে ইউরোপের গৌরবের কথা। এ থেকে শুধু এই প্রমাণ হয় যে, ইউরোপের বহু লোক শিক্ষাদীক্ষার ফলে সেই মন লাভ করেছে, যে মন পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতের বড় কথা সাদরে গ্রহণ করতে পারে।' (সবুজ পত্র, ১৩৩৪, শ্রাবণ-ভাদ্র)।

ভারতবর্ষ যে-সাধনাকে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা হইল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত আত্মার যোগ।* 'নৈবেদ্য'-কাব্যে প্রাচীন ভারতের ও নবীন সভ্যতার

---

* Bergson রবীন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন যে, য়ুরোপীয় মন precise এবং ভারতীয় মন intuitive. বস্তুজগতের প্রতি য়ুরোপের অত্যন্ত মনসংযোগ—তাই precisionএর উদ্ভব, কিন্তু ভারতীয় মনীষা যে-তত্ত্বে উপনীত হইয়াছে তাহা প্রকৃত intuition হইতে।—'রবীন্দ্র-জীবনী'।

শাশ্বত সত্যের সমন্বয় ঘটিয়াছে। 'একদিকে দেশাত্মবোধ, অপরদিকে বিশ্ব-মানবের দুঃখে ক্ষুব্ধ মন; একদিকে প্রাচীন ভারতের তপোবন আদর্শ, অপরদিকে বাংলাদেশের বাস্তব জীবনের সহিত মিশিয়া তাহার স্বরূপ প্রকাশ; একদিকে উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান ও গুরুগৃহের আদর্শ, অপরদিকে পশ্চিমের বিজ্ঞান ও পরীক্ষিত সত্যের সন্ধান; এই সব বহু বিচিত্র ভাবতরঙ্গের মাঝে 'নৈবেদ্য' রচিত।' * প্রাচীন ভারত বড় হইয়াছিল বহুকে এক করিয়া। সে ধ্যান করিয়াছে এবং পরীক্ষা করিয়াছে; তাহার চিত্তবৃত্তি সচেষ্ট ছিল।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের কাব্যময় প্রকাশ 'খেয়া'-কাব্যে, 'নৈবেদ্য'-কাব্যে সেই স্বতঃ উৎসারিত কাব্যলোকের চেতনা পাই। এই 'খেয়া-কাব্যের প্রথম কবিতাতেই তিনি জীবন দেবতার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি গাহিলেন—

'ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘর পানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে;
ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তা'রে।
ফুলের বাহার নাইক যাহার ফসল যাহার ফল্‌ল না,
অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরালো সাঁজের আলো জ্বলল না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।'

মনের এই অবস্থায় মানুষ নিজেকে ত্যাগ করিয়া বৃহত্তর জীবনকে গ্রহণ করিতে চায়। কবি সেই ত্যাগের দিকে ছুটিয়াছেন; তাই তিনি বলিলেন—

'রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখ পথে,
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বল কী মতে?'

এই কাব্যে তিনি আঁধার ঘরের রাজাকে গভীর রাত্রিতে আসিতে দেখিলেন। সেই বিজয়ী বীর নিশীথে গোপনে আসিয়া চিত্ত জয় করিয়া লইয়াছেন। পরাণবঁধু পরশমধু দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহার গলার মালা সাহস করিয়া

* শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত—'রবীন্দ্র জীবনী'।

চাহিতে পারেন নাই। কবি তাঁহার দেবতাকে নানাভাবে দেখিলেন—দুঃখে, আনন্দে, প্রণয়ে, ঝড়ের রাতে, দিনের আলোতে। তাই তিনি বিদায় চাহিতেছেন কর্মের পথ হইতে। তিনি বলিতেছেন—'তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে, সে সব মিছে হয়েছে মোর কাছে।' তিনি পথের নেশা ছাড়িয়া বলিতেছেন—

'এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,
এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পারে খেয়ার তরী ভাসা।
জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি,
ছেড়েছি নব অকস্মাতের আশা।'

তাই কবি প্রতীক্ষা করিতেছেন—

'আমি এখন সময় করেছি—
তোমার এবার সময় কখন হবে?
সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি—
শিখা তাহার জ্বালিয়ে দেবে কবে?
নামিয়ে দিয়ে এসেছি সব বোঝা,
তরী আমার বেঁধে এলেম ঘাটে,—
পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজা
কেনা বেচা নানান হাটে হাটে।'

এই বিরতি, এই বিশ্রাম আধ্যাত্মিক সাধনার পক্ষে প্রয়োজন কিন্তু কাব্য-জীবনের পক্ষে প্রশস্ত নয়। 'গীতাঞ্জলি'তে কবি অধ্যাত্মসাধনার যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা এই যে, দুঃখের আঘাত ভিন্ন আমাদের জীবনের পূজা তাঁহার দিকে উচ্ছ্বসিত হয় না এবং এই অহংটিকে তাঁহার পায়ে বিসর্জ্জন না করিলে সমস্তই বেসুরা হইয়া যায়।* 'গীতিমাল্যে' তিনি ধন, মান, সৌন্দর্য কিছুই প্রার্থনা করেন নাই। শুধু চাহিয়াছেন—

---

* 'এই কাব্যে কবির অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম অভিজ্ঞতাগুলি পরে পরে বাহির হইয়া আসিয়াছে, বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যের স্পর্শে তাঁহার অপূর্ব পুলক, তাঁহার অপেক্ষা ও আশা, আপনার সঙ্গে আপনার দ্বন্দ্ব, প্রবল দুঃখ ও আঘাতের মধ্য দিয়া কেবলি জাগরণ, তাঁহার সুদূর পরিণামের দৃষ্টি সমস্ত স্তরে স্তরে পত্রে পত্রে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। শিল্পীর মত কেবল

'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো—আরো দাও প্রাণ।
আরো বেদনা আরো বেদনা
দাও মোরে আরো চেতনা।
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে
মোরে কর ত্রাণ মোরে কর ত্রাণ।'

** ** **

'সাজাও আমারে সাজাও
যে সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে
সেই সাজে মোরে সাজাও।
সন্ধ্যা মালতী সাজে যে ছন্দে
শুধু আপনারি গোপন গন্ধে
যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে
সেই সাজে মোরে সাজাও।'

** ** **

'আমার মুখের কথায় তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখ থুয়ে।'

** ** **

'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে।'

** ** **

'ওদের সাথে মেলাও, যারা
চরায় তোমার ধেনু।

নিজের শ্রেষ্ঠ ফলদান করিয়া কবি বিদায় লন নাই, তিনি এই কাব্যে আপনাকে সম্পূর্ণ করিয়া দান করিয়াছেন। এইখানেই গীতাঞ্জলির বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের জন্যই পশ্চিমে এই শ্রেণীর অন্যান্য সকল কাব্যের অপেক্ষা গীতাঞ্জলির সমাদর এত অধিক হইয়াছে। এই কাব্যে মানুষের জীবনের মধ্যে কবির সাধনা গিয়া আঘাত করিয়াছে।'—অজিতকুমার চক্রবর্তী।

তোমার নামে বাজায় যারা বেণু ॥
পাষাণ দিয়ে বাঁধা ঘাটে
এই যে কোলাহলের হাটে
কেন আমি কিসের লোভে এনু ॥'

* * * * *

'আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি,
আমার যতো বিত্ত প্রভু আমার যতো বাণী।
আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা।
সব দিতে হবে ॥'

এই গানগুলি কবির আধ্যাত্মিক সাধনার সুরে ধ্বনিত—ইহাতে শুধু নিজেকে লয় করিয়া দিবার বাসনা আছে, আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া সগর্বে প্রতিষ্ঠা করিবার অহংকার নাই। এই সুর 'নৈবেদ্য'-কাব্যে বাজিয়াছিল—তাহাই 'খেয়া'-কাব্য পার হইয়া 'গীতাঞ্জলি'তে 'সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে,' এই গান সম্ভব হইয়াছিল। এবং সেই সুর 'গীতিমাল্যে'র গানে প্রধান হইয়া উঠিল।

কবি গাহিতে পারিলেন—

'আমি আমায় করব বড়
এই ত আমার মায়া ;—
তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে
ফেলব রঙীন ছায়া।'

'গীতিমাল্যে'র পর রবীন্দ্রনাথের গানের যুগ চলিল—তাহা 'গীতালি' বলিয়া প্রকাশিত হইল। এই গীতালির গানগুলিতেও গীতিমাল্যের সুর আছে। কিন্তু তাহার পরেই 'বলাকা'র যুগ—ইহা রবীন্দ্র-কাব্যের তৃতীয় যুগ। আবার জীবন-দেবতা রবীন্দ্র-কাব্যে এক নূতন চঞ্চলতা আনিল, রবীন্দ্র-কাব্যে গতি দিল—বিচিত্রতা আসিয়া পুষ্পিত হইয়া উঠিল। যৌবনের গান,সবুজের অভিযান, বলাকার গতি কবিকে বিমুগ্ধ করিল। আধ্যাত্মিক সাধনা গতির কাছে আবার চাপা পড়িল—যে বিরতি আসিয়াছিল, তাহা নতুন সুরে আবার উন্মাদনা লাভ করিল। *

* এই যে গতিধর্ম ইহাকে অনেকে পশ্চিমের প্রভাব বলিয়া মনে করেন। 'সবুজপত্র'-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী বলেন—'ইউরোপের সাহিত্য, ইউরোপের দর্শন, মনের গায়ে হাত বুলোয় না, কিন্তু ধাক্কা মারে। ইউরোপের সভ্যতা অমৃতই হোক্, মদিরাই হোক্, আর হলাহলই হোক্,

রবীন্দ্র-কাব্যে সমাপ্তি নাই—ইহাই জীবন-দেবতার লীলা। দ্বিতীয় যুগের আত্ম-বিলোপের কাব্য-সাধনা আবার হংসবলাকার চঞ্চলগতি অনুসরণ করিয়া বিচিত্র বর্ণচ্ছায়ায় ঐশ্বর্যে রাঙিয়া উঠিল। গতির মত্ততায় কবি লিখিয়া গেলেন—

'শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও,
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লওয়া কিছু কর না সঞ্চয়,
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।
যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।'

এই প্রাণস্রোত, এই প্রাণবেগ, যাহা রবীন্দ্রনাথকে কাব্য সাধনায় থামিতে দিতেছে না, সেই শক্তিই জীবন-দেবতা। এই শক্তি বাধা মানিবে না, আঘাতে নুইয়া পড়িবে না। এই শক্তিই মৃত্যুসাগর মন্থন করিয়া অমৃতরস আনিতে চায়, সর্বনাশা ঝড়কে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত, কারণ 'রইল যারা পিছুর টানে, কাঁদবে তারা কাঁদবে।' এই যে গতি, ইহাও অনন্তকে পাইবার জন্য– আবার অন্তরের মধ্যে এই অন্তর্যামীকে পাইয়া তিনি গীতাঞ্জলির যুগে নিশ্চল, শান্ত, নিরঞ্জন হইয়াছিলেন। কবি গতির মধ্য দিয়া অচঞ্চলতাকে পাইয়াছিলেন; বিরোধের সাহায্যে তিনি সামঞ্জস্যকে পাইয়াছেন, কারণ তিনি জানেন যে পরিবর্তনশীল বর্ণচ্ছটার মূলে সেই স্থিরতা ও শান্তি বিরাজ করিতেছে। ধ্যানের মধ্যে যাহাকে পাওয়া যায়, তিনিই আবার প্রাণের সাড়া জাগাইয়া তোলেন; তাই কবি লিখিলেন—

'তোমায় পেয়েছি কোন্ প্রাতে
তারপর হারিয়েছি রাতে।

তার ধর্ম হচ্ছে মনকে উত্তেজিত করা, স্থির থাকতে দেওয়া নয়। এই ইংরাজী শিক্ষার প্রসাদে, এই ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে আমরা দেশসুদ্ধ লোক যেদিকে হোক্ কোনও একটা দিকে চল্‌বার জন্য এবং অন্যকে চালাবার জন্য আঁকুপাঁকু করছি। এক কথায় আমরা উন্নতিশীল হই, আর অবনতিশীল হই, আমরা সকলেই গতিশীল—কেউ স্থিতিশীল নই।'

তারপরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও ছবি, নও তুমি ছবি ॥'

এই পাওয়া ও হারানো রবীন্দ্র কাব্যসাধনার মূল প্রেরণা। কাব্য সাধনায় প্রাপ্তি হইল অবসান—সেখানে পাওয়াই চরম কথা নয়, কবির শ্রেষ্ঠ ধন নয়। কবি অজানার অভিসারে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যান—

'আমার শ্রেষ্ঠ সে তো শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয় মিলায় পলকে।
বলেনা আপন নাম, পথেরে শিহরি' দিয়া সুরে
চলে যায় চকিত নূপুরে।'

তাই 'বলাকা'র বিশিষ্ট সুর এই গতিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং কবি জীবন-দেবতাকে রূপ দিয়াছেন পুষ্পবনে, পুণ্য সমীরণে, তৃণপুঞ্জে, বসন্তের বিহঙ্গকূজনে, তরঙ্গ- চুম্বিত তীরে, মর্মরিত পল্লব-বিজনে—আবার দেখিয়াছেন 'পথ-চাওয়া প্রণয়ের বিচ্ছেদের রাতে' এবং 'অশ্রুপ্লুত করুণার পরিপূর্ণ ক্ষমার প্রভাতে'। আবার কখনও দেখিয়াছেন 'গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়, সূর্যাস্তের প্রলয় শিখায়, রক্তের বর্ষণে, অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।' তাই অনুভূতির এই প্রসারতা, কাব্যে এত গতি, ভাবের এত বিস্তৃতি। এই অনন্ত চঞ্চলতা চিরনবীনতা লাভের উপায়। 'পূরবী'-কাব্যেও সেই চিরনবীনতার অনুসন্ধান আছে। এই অনুসন্ধানের শেষ নাই, এই অচেনা রহস্যের নিরসন নাই। 'পূরবী'-তে আবার জীবন-দেবতার ছল, লীলা ফিরিয়া আসিল এবং কবি লিখিলেন—

'আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।
সে নারী বিচিত্র বেশে, মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া ॥
দীপখানি তুলে ধ'রে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি'
চিনেছে আমারে।
তারি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে ॥'

তাই কবি বলিতেছেন যে, তাহার কণ্ঠে আমার নাম শুনিলে, 'আমি আছি' বলিয়া গান গাহিয়া উঠি, কারণ সেই গানেই 'আমি বাঁচি'—

'তুমি মোরে চাও যবে, অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্বলে'
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গ'লে আসে
নৃত্য-কলরোলে।'

*　　*　　*　　*

'হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি,'
আপনার মনে,
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজি একা বসে জাগি,
নির্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌন বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি-পরশ।
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ-সুধারস।
নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি কবে আসিবে পরাণে
চরম আহ্বান।
মনে জানি, এজীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ তানে
মোর শেষ গান।'

কবি এই জীবন-দেবতার স্পর্শে জাগিয়া উঠেন এবং ইঁহারই স্পর্শে তাঁহার শেষ সংগীতও ধ্বনিয়া উঠিবে, এই বিশ্বাস তাঁহার আছে। এই জীবন-দেবতা না থাকিলে সাড়া জাগে না, গতি আসে না—আবার ইঁহারই আগমনে সমস্ত বাধা নিশ্চিহ্ন হইয়া বেগবান্ গতিতে তিনি ধাবিত হয়েন—তাঁহারই আরতির জন্য দীপ জ্বালিয়া ধরেন, পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করেন, নৈবেদ্যের থালা সাজাইয়া তোলেন, বরণের ডালা রচনা করেন। এই জীবন-দেবতাই কবিকে লুণ্ঠন করিয়া, রিক্ত করিয়া ধন্য করিবেন এবং কবি জানেন যে, ইঁহার হাত হইতে তাঁহার মুক্তি নাই। তাই কবি বলিলেন—

'ওগো মোর না-পাওয়া গো, কখন আসিয়া সঙ্গোপনে
আমার পাওয়ার বীণা কাঁপাও অঙ্গুলি পরশনে।
কার গানে কার সুর
মিলে গেছে সুমধুর
ভাল ক'রে কে লইবে চিনে।

এরা এসে বলে, 'একী,
বুঝাইয়া বল দেখি',
আমি বলি বুঝাতে পারিনে।'

ইহাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার রহস্য। তাই জীবন-দেবতাকে না বুঝিলে রবীন্দ্র-কাব্যকে হেঁয়ালী বলিয়া মনে হইবে। অনেক সময় কবি নিজেই সেই রহস্যকে ধরিতে পারেন না এবং তাঁহার কাব্যে সেই রহস্যময়ীর রহস্য বিদ্যমান। 'পরিশেষ'-কাব্যেও সেই অভিযোগ, জীবন-দেবতার ইঙ্গিতে তিনি চালিত। ইহার শ্রান্তি নাই—

'হে মহা পথিক
অবারিত তব দশদিক।
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম;
তীর্থ তব পদে পদে,
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে;
চঞ্চলের সর্ব্বভোলা দানে—
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে।'

এই 'পথিকে'র রহস্যে কবি আজীবন ঘুরিয়া মরিলেন—কখনো কবি 'শেষ গানে' জীবন দেবতার শেষ স্পর্শ লাভ করিলেন না। তখনই হইবে কাব্য-সাধনার অবসান, কারণ, কবি জানেন এবং বিশ্বাস করেন—

'কালের ঘায়ে সেই তো মরে
অটল বলের গর্বভরে
থাকতে যে চায় অচল হয়ে।
জানে যারা চলার ধারা
নিত্য থাকে নূতন তা'রা
হারায় যারা রয়ে রয়ে।'

কিন্তু এই চলা, এবং চলায় পাওয়া এবং হারানো, জীবন-দেবতার ইঙ্গিত ব্যতীত কি সম্ভব হইত? রবীন্দ্রনাথের উর্বর কাব্য-সাধনা ধর্ম-সাধনার ঊষর মরুভূমিতে কি লুপ্ত হইত না?

গতিধর্ম

রবীন্দ্র-কাব্যের গতিধর্ম সম্বন্ধে পূর্বে বলিয়াছি, কিন্তু তাহাকে সুস্পষ্ট করিয়া না বুঝিলে অনেক রহস্য আমরা ধরিতে পারিব না। সেই কথাটাই আবার এখানে বলিতে চাহি। রবীন্দ্র-কাব্য মুখ্যতঃ গীতধর্মী, কিন্তু অনেকে সংগীত বুঝেন না, অথবা সংগীতের সুর ও ঝংকার তাঁহাদের প্রাণের একতারাতে বাজিয়া উঠে না; তাঁহারা বীণার সুর চাহেন না; তাঁহারা উদাত্তকণ্ঠের বাণী প্রচার চাহেন। আমাদের দেশ এই বাণীর দেশ, শাস্ত্রের দেশ, আচারের দেশ। তাই আমাদের বিশ্বাস নাই, অথচ আমরা ভক্তি করি। যে-প্রাণে বাণীর অমোঘতা সহজে আঘাত করে, সে-প্রাণে বীণার সুর বাজিতে চায় না। তাঁহাদের প্রাণের তার ট্রামগাড়ীর তারের মত স্থূল—আঘাত করিলে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হয়, সে-তারে কোমল-নিখাদ নাই, তাই সংগীত হয় না। রবীন্দ্র-কাব্যে যেমন গীতধর্ম আছে, তেমন গতি-ধর্মও আছে। এই গতিতে যে-বেগ আছে, তাহা প্রাণকে সঞ্জীবিত করে, ভাবের বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য বাড়াইয়া দেয়। এই গতিধর্মই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সংগীতকে প্রাণহীন করে নাই, রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠককে ভাববিলাসী করিতে পারে না এবং দেশের চিত্তে ইহার প্রভাবকে চিরস্থায়ী করিতে চাহে এবং সর্বলোকে সর্বমানবের অন্তরে অমরতা প্রার্থনা করে। এই গতিতে ছন্দ এবং সুর আছে—তাই তাঁহার কাব্যসাধনা সার্থক হইয়াছে; তাই রবীন্দ্র-কাব্যে 'সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা এবং কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা'র পরিচয় লাভ করি, এবং অতীতের মহৎ স্মৃতি, বর্তমানের কামনা ও ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা তাহাতে ঝংকৃত হইয়া উঠে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে অন্ধ-বাউলের আদর আছে, কারণ তাঁহার চোখ না থাকিলেও দৃষ্টি আছে, প্রকৃতির সঙ্গে বাহিরের যোগ না থাকিলেও অন্তরের যোগ আছে, বিশ্বরূপের আকর্ষণ না থাকিলেও কানে রাগিণী বাজে, পথ না দেখিলেও পথিকের সহিত আগাইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা বধির বাউল অন্তরে ও বাহিরে, তাঁহাদের অভিযোগ পথিকের উপর, পথের উপর। যে-নিঃশব্দতা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া আছে, তাহা সুর ধরিবার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করে, কারণ তাঁহারা মুখব্যাদনের সংকেতে পথ আগাইয়া যান। তাই রবীন্দ্র-কাব্যের গীতধর্ম ও গতিধর্ম, দুই-ই তাঁহাদিগকে সঞ্জীবিত করিতে পারে না।*

---

* অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার বলেন—"আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে পরিমাণ মুগ্ধ হইয়াছি ততখানি সঞ্জীবিত হই নাই—ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ কি?...রবীন্দ্রনাথের কল্পনাশক্তির মূলে আছে—অন্তর ও বাহির, ভাব ও বস্তু, চিন্তা ও অনুভূতির সঙ্গতিমূলক এক

প্রভাত-সঙ্গীত-কাব্যে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাতে কবির যে স্বপ্ন ভঙ্গ হইল, যে জাগরণ হইল, তাহা রবীন্দ্র-কাব্যে গতির চঞ্চলতা আনিয়া দিয়াছে। এই জাগরণ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় দেখি, 'মানসী'-কাব্যে 'নিষ্ফল কামনা' ও 'ভৈরবী গান' কবিতায় দেখি, 'সোনারতরী' কাব্যে 'পুরস্কার' কবিতায় সেই সুর ধ্বনিয়া উঠিতে দেখি; আবার 'চিত্রা'-কাব্যে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবিকে জাগিয়া উঠিতে দেখি নূতন সাহসে, নূতন আশায় বলীয়ান হইয়া; সেই গতি 'কল্পনা'র "বর্ষশেষ" কবিতায় দেখিতে পাই; সেই সুর 'ক্ষণিকা'-কাব্যে ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে। আবার কবি জাগিয়া উঠিলেন 'বলাকা' যুগে—যখন 'বলাকা' ও 'পূরবী'-কাব্যে রবীন্দ্রনাথ গতির বেগে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছেন। তাই আমার মনে হয় যে, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ,' 'নিষ্ফল কামনা,' 'এবার ফিরাও মোরে' ইত্যাদি যুগের সঙ্গে 'বলাকা' যুগের গভীর যোগ আছে। কিন্তু সেখানেও গতি আসিয়া থামিয়া যায় নাই।

'মানসী' যুগে কবি বলিতেছেন—

'মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা,
এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ
দুর্গম উদয়-অস্তাচল,
এরি মাঝে পথ করি,
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চির সহচরে
চির রাত্রি দিন
একা অসহায় ?'

অপূর্ব গীতি-প্রবণতা; ইহাতে তাঁহার মনের মুক্তি; সেই মুক্তির আনন্দে তাঁহার কল্পনা সকল সংস্কার সকল বিরোধ উত্তীর্ণ হইয়া এমন এক রসভূমিতে অধিষ্ঠান করে যেখানে জীবনের সকল অসামঞ্জস্য, বাস্তবের সকল বৈষম্য কবির প্রাণে একটি ভাবৈক-পরিণাম রাগিণীতে সমাহিত হয়।......বঙ্কিমের উপন্যাসের চেয়ে বঙ্কিম বড়। সাহিত্য-রচনায় আত্মবিস্মৃত শিল্পী যে আনন্দ-মুক্তির স্বাদ পায়, বঙ্কিমের তাহাতে লোভ ছিল না। যে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইলে জাতির জীবনে উৎকৃষ্ট সাহিত্য আপনিই সম্ভব হয়, বঙ্কিম সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।' (আধুনিক বাংলা সাহিত্য)। কাব্য-বিচারে এই মাপকাঠির যাঁহারা পোষক, তাঁহারা প্রচারক, রসিক নহেন।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় কবি বলিয়াছেন যে, "শিখর হইতে শিখরে ছুটিব, ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব," কারণ কবির এত কথা, কবির এত গান, এত প্রাণ এত সুখ, এত সাধ আছে যে, তিনি খল-খল হাসিয়া কলকল করিয়া গান গাহিয়া তালে তালে তালি দিয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু মানসীযুগে সংশয় চাপিয়া ধরিল —তিনি কি পারিবেন ? তাই

'বৃথা এ ক্রন্দন।
বৃথা এ অনলভরা দুরন্ত বাসনা !'

সেই সংশয়-দোলায়িত চিত্তে কবি ভৈরবী গান গাহিয়াছেন—

'এই সংশয়-মাঝে কোন পথে যাই,
কা'র তরে মরি খাটিয়া।
আমি কা'র মিছে দুঃখে মরিতেছি, বুক
ফাটিয়া।
ভবে সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ
কে রেখেছে মত আঁটিয়া।
যদি কাজ নিতে হয়, কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে।
কাঁদে শিশির বিন্দু জগতের তৃষা
হরিতে।
কেন অকূল সাগরে জীবন সঁপিব
একেলা জীর্ণ তরীতে।'

কবি কি কাজ করিবেন এবং কি কাজে নিজেকে নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহা তিনি সোনার তরী-কাব্যে 'পুরস্কার' কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। কবির মনের ইচ্ছা সংশয়ের দোলা অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে ; 'বিশ্বনৃত্য' 'কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

'বিপুল গভীর মধুর মন্ত্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা,
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ

হৃদয় সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।'

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন—

"কিন্তু এতেও বাজনার সুর। যদিও এ সুর মন্দ্র বটে কিন্তু মধুর মন্দ্র। যাই হোক, কবিতার গতিটা এখানে প্রকৃতির ধাপ থেকে মানুষের ধাপে উঠ্‌চে। বিরাটের চিন্ময়তার পরিচয় লাভ করচে।"

মানুষের ধাপে উঠিয়া তিনি চিত্রা কাব্যে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় নিজেকে স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিলেন—সেখানে সংশয়ের দোলা নাই, নিজের গতি অন্বেষণের অনিশ্চয়তা নাই। সেখানে কবি জনতার মাঝে আসিয়া বলিতেছেন, আমাকে অবিশ্বাস করিয়ো না। আমি সৃষ্টিমাঝে বহুকাল বাস করিয়াছি, তাই আমার বেশ অপরূপ, আচার নূতনতর, আমার চোখে স্বপ্নাবেশ, আমার বুকে ক্ষুধানল। কবি বলিতেছেন—

'—যে দিন জগতে চলে আসি,'
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা।—সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে
কর্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি,—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।'

'চিত্রা'-কাব্যে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট হইল এবং কবি যেন সব বাধা অতিক্রম করিয়া প্রত্যয়ের আনন্দে নিজেকে পাইলেন। কল্পনা-কাব্যে 'বর্ষশেষ' কবিতায় সেই গতির ঝংকার রণিত হইয়া উঠিল; চৈত্রের ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কবি বলিয়া উঠিলেন যে, "ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত আঘাতে উড়ে হোক্ ক্ষয়, ধূলিময় তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত নিষ্ফল সঞ্চয়।" কবি এই রুদ্রমূর্তি দেখিয়া স্তব্ধ হইয়াছেন, তাহারই জয়গান গাহিলেন। এবার বীণার

তারে কোমলনিখাদ নয়—বাজিয়া উঠিল ঝড়ের সুর, বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা যেই সুরে উড়িয়া যায়। তাই কবি বলিতেছেন যে, তুমি এবার বসন্তের আবেশ হিল্লোলে পুষ্পদল চুম্বন করিয়া আস নাই—এবার আস নাই মর্ম্মরিত কূজনে গুঞ্জনে। এবার তুমি আসিয়াছ, "বিজয়ী রাজসম গর্বিত নির্ভয়।" তোমারই জয় হউক—হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন, পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করিয়া বিকীর্ণ করিয়া অপূর্ব্ব আকারে আসিয়াছ—তোমাকে প্রণাম। তাই কবি বলিতেছেন—

'চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি,'
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি'।

ক্ষণিকা-কাব্যের 'আবির্ভাব' কবিতাতে সেই একই সুর। কবি বলিতেছেন যে, সেইদিন তোমায় দেখিয়াছিলাম চম্পক আভরণে, যখন তুমি বনতল "ছুঁয়ে ছুঁয়ে" যাইতে এবং ফুলদল "নুয়ে নুয়ে" পড়িত। তখন মৃদু রিণি রিণি শুনিয়াছিলাম, তোমার ক্ষীণ কটি ঘেরিয়া কিঙ্কিণী বাজিয়াছিল; তোমার নিশ্বাস-পরিমল মুগ্ধ করিয়াছিল। আজ গগনে আঁচল লুটাইয়া আমার স্বপন ভাঙ্গিয়া আসিয়াছ, হৃদয় সাগর-উপকূল শ্যাম সমারোহে আকুল করিয়াছ।

এই উদাত্ত সুর, যাহা কবিকে 'চিত্রা' কাব্য হইতে পাগল করিয়াছে, তাহাই আবার 'বলাকা' কাব্যে ধ্বনিত হইল। সেই সবুজের অভিযান; কবি আধ-মরাদের ঘা দিয়া বাঁচাইতে বলিতেছেন; সংঘাতে তাহারা উঠিয়া আসিলে তাহাদের ঘুম ভাঙিয়া যাইবে। তাহাতে আপদ আছে কবি জানেন কিন্তু তাঁহার 'তাই জেনে তো বক্ষে পরান নাচে।' তাই নদীর নিরুদ্দেশ-সুর কবিকে উন্মত্ত করিয়াছে এবং সম্মুখের বাণী তাহাকে টানিয়া নিতেছে। 'বলাকা'র পাখার বাণী কবির অন্তরে বেগ আনিয়া দিল—

'পর্বত চাহিল হোতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি'

মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।'

তাই কবি শুনিতে পাইলেন যে, মানবের কত বাণী "দলে দলে অলক্ষিত পথে উড়ে চলে, অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।" এই গতিধর্ম তাঁহার ভিতর সমগ্রতাবোধ জাগাইয়াছে। এই অনন্ত প্রবাহস্পন্দন জীবনের সমস্ত খণ্ডকে অর্থপূর্ণ করিয়াছে। সমস্ত বন্ধন ছুটিয়া চলা হইল এই বিশ্বপ্রবাহের তালের গতির সঙ্গে সংগতি রাখা—তাই পথ চলায় এত আনন্দ, এত সার্থকতা। কবি সেই অখণ্ড দৃষ্টির সাহায্যে বলিতে পারিলেন—

'যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হ'তে প্রাণে।
নিশীথে প্রভাতে
যা কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হ'তে দানে,
গান হ'তে গানে।'

কবি দিবারাত্র সেই বাণীর পিছনে ছুটিলেন। 'পূরবী'-কাব্যে 'আহ্বান' কবিতায় তিনি তাঁহার কল্যাণীর জন্য এই চাঞ্চল্য অনুভব করিলেন। এই গতির শেষ নাই। 'মহুয়া'-কাব্যে তিনি তাঁহার পরাণবঁধুকে বলিতেছেন—তোমার সঙ্গে দেখা হইল বটে কিন্তু ইহাও অসমাপ্ত। কবি অভিমানিনীর সুরে সরম-বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন—

'বোলো তারে আজ
অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ।
কিছু হয় নাই বলা, বেধে গিয়েছিল গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ।
আমার বক্ষের কাছে পূর্ণিমা লুকানো আছে,
সেদিন দেখেছ শুধু অমা।'
দিনে দিনে অর্ঘ্য মম পূর্ণ হবে, প্রিয়তম,
আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা॥"

"পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি"—তাই চলার শেষ নাই। যে-প্রেম, যে-সাধনা, যে-মন্ত্র সম্মুখ দিকে টানিতে পারে না, কবির কাছে তাহা অর্থশূন্য। রবীন্দ্র-কাব্য শুধু গীতধর্মী নয়, গতিধর্মীও বটে।*

বিশ্বৈক্যানুভূতি

রবীন্দ্র-কাব্যের মূল প্রেরণাকে আলোচনা করিবার পর তাহার মূল সুরকে ধরিবার সুবিধা হয়। রবীন্দ্র-কাব্যে বিশ্বৈক্যানুভূতিই হইল একটি প্রধান সুর। সমস্ত বিশ্বজগতের সঙ্গে কবি একটি অন্তরতম যোগ অনুভব করেন; তিনি বিশ্বাস করেন যে, খণ্ড জীবনের মধ্যে চিরন্তন জীবন আছে। তাই কবি অখণ্ড বিশ্ব-চৈতন্যলাভপ্রয়াসী সত্তা তাহার মধ্যে অনুভব করিয়াছেন—এবং সেই সত্তা সকল ভেদসীমা, সকল ক্ষুদ্রতা দূর করিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনায় অপরূপ অনির্বচীয়তা দান করিয়াছে। এই বিশ্বসমষ্টিবোধ রবীন্দ্র-কাব্যের বিশিষ্ট রূপ। অজিতকুমারের মতে, রবীন্দ্র-কাব্যে এই বিশ্বযাত্রা পশ্চিমদেশের চিন্তাধারার উত্তাপে বিকাশলাভ করিয়াছিল। তিনি বলেন—

* রবীন্দ্র-কাব্যের এই গতিধর্মের আকৃতি, প্রবৃত্তি ও ভঙ্গিমা অনেক সমালোচকের কাছে ধরা দেয় নাই। অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার বলেন—"এইরূপ নিরুদ্দেশ নিত্যগতি প্রবাহে ভাসিয়া যাওয়া যে অবস্থা, তাহা জড় প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হওয়ার যে শিবত্ব তাহারই বিপরীত মাত্র, ইহার কোনটাই অমৃতপদ নহে। উভয়ের মধ্যেই বিরাট শূন্য মুখব্যাদন করিয়া আছে।" (সাহিত্য-কথা)। কিন্তু এই গতিধর্মের জন্য ব্যক্তি ও বিরাটের, মৃত্যু ও অমৃতের, নিত্য ও অনিত্যের লীলা-চাতুরীর অপূর্ব রস রবীন্দ্র-সাহিত্যে সঞ্চিত হইয়াছে; তাহা অধ্যাপক মজুমদারের কাছে ধরা দেয় নাই, কারণ তিনি কাব্য-সাধনা ও ধর্ম-সাধনার যে বিভিন্ন পথ আছে, তাহা স্বীকার করিতে বোধহয় কুণ্ঠাবোধ করেন। কাব্য-সাধনায় "শাশ্বত" পুরুষের মুখশ্রী" পরিস্ফুট না থাকিলেও তাহা অমরত্ব দাবি করিতে পারে, এবং অমরতা প্রার্থনার প্রধান দাবি হইল বিশ্ববস্তু ও বিশ্বরসের উপলব্ধি প্রকাশ করা। একথা অবশ্য মানিতে হইবে যে, এই গতিধর্ম পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা হইতে গৃহীত। ভারতীয় দর্শনের ভূমানন্দের সঙ্গে মিলন-সাধন ও চিত্তের সমাহিত অবস্থা কাম্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের গতিধর্ম সেই ধর্মসাধনাকে আশ্রয় করিয়া স্থির থাকিতে পারে নাই—কাব্য-সাধনার পক্ষে এই গতিধর্মই প্রশস্ত। তুলনীয়—"What a frightful thought! No further struggles,—that would be death. It wasn't victory then that I was wanting"—Strindberg-প্রণীত "Master Olaf" নাটক।

'আমাদের এই বহুদিনের সুপ্তদেশ একদিন সহসা বৃহৎ পৃথিবীর আঘাত পাইয়াছে। যে পশ্চিম মহাসমুদ্রতীরে মানুষের মন সচেতন ভাবে ঘুরিতেছে, চিন্তা করিতেছে ও আনন্দ করিতেছে, সেইখানকার মানসহিল্লোল আমাদের নিস্তব্ধ মনের উপর আসিয়া যখন পৌঁছিল তখন সে কি চঞ্চল না হইয়া থাকিতে পারে। আমাদের মনের এই যে প্রথম উদ্বোধনের চঞ্চলতা, ইহা ত নীরব থাকিবার নহে। যতদিন সুপ্ত ছিলাম ততদিন আপনার মনের নানা অদ্ভুত স্বপ্ন লইয়া দিব্য রাত কাটিতেছিল, কিন্তু যখন জাগিলাম, যখন শয়ন ঘরের জানালার ফাঁকের মধ্য দিয়া দেখিলাম জীবনের উদার বিস্তীর্ণ লীলাভূমিতে মানুষ দিকে দিকে আপনার বিচিত্র শক্তিকে আনন্দে পরিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তখন স্বপ্নের বন্ধন ও পাথরের দেয়ালে আর ত বাঁধা থাকিতে ইচ্ছা হয় না। তখন বিশ্বের ক্ষেত্রে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে।'

এই ব্যাকুলতায় কবির প্রাণ জাগিয়া উঠিয়াছে, প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ অবরোধ মানিতে চায় না। তাই—

'মহা উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,
প্রভাত কিরণে পাগল হইয়া
জগৎ মাঝারে লুটিতে চায়।'

ইহার ভিতর পশ্চিমের প্রভাব অনুভব করিয়া অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন বলিয়াছেন—

'The German philosopher Fichte's conception of the ego, of its constant striving to pass beyond its limits, which gave a philosophical explanation to some of the most pronounced impulses of the Romantic Movement in European literature in the nineteenth century, has an interesting paralled in these lines. It may be pointed out in this connection that the idea in its expression is subtly differentiated from the traditional Hindu view of identifying the individual with the Being that is in the universe, of realising oneself. It is equally different from the Lord's identifying Himself with all that is best in the world as expressed in the well-known lines of the Gita, 'Visva-rupa-darshana.' Man feels not merely that he is free from

shackles but that he has a more positive quality, life abounding, life pulsating in a full measure, never checked or retarded by any consideration. (Western Influence In Bengali Literature)

রবীন্দ্র-কাব্যে এই বিশ্ব-অভিসার যাত্রা থাকিবার দরুন মানুষের জীবনকে নানাদিক দিয়া, নানা রসের ভিতরে, নানা বর্ণে ও রূপে উপলব্ধি করিবার ব্যাকুলতার অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। বরঞ্চ এই বৈচিত্র্যই রবীন্দ্র-কাব্যের ভিত্তি—এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বযাত্রার জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে। তাই সীমার ভিতরে অসীম—এই ভাব তাঁহার কাব্যের মূল সুর হইয়া উঠিয়াছে। কবি বিচিত্র রাগিণীর ভিতর পরম ঐক্য আনিতে পারিয়াছেন, কারণ এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে তিনি নিজের যোগ উপলব্ধি করিয়াছেন; তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার ভিতরে যে সৃজন চলিতেছে, তাহা সুখ-দুঃখ বিচ্ছিন্ন হইলেও এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'আমি আমার চলা-ফেরা কথাবার্তায় প্রতি মুহূর্তে নিজেকে প্রকাশ করিব; সেই প্রকাশ আমার আপনাকে আপনার সৃষ্টি। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যে যেমন আছি, তেমনি সেই প্রকাশকে বহুগুণে আমি অতিক্রম করেছি। আমার এক কোটিতে অন্ত, আর এক কোটিতে অনন্ত। আমার অব্যক্ত-আমি আমার ব্যক্ত-আমির যোগে সত্য।'

একথা ঠিক যে, 'হীরার টুক্‌রা যেমন আকাশের আলোককে প্রকাশ করার দ্বারাই আপনাকে প্রকাশ করে তেমনি মানুষের হৃদয় কেবল নিজের ব্যক্তিগত সত্তায় প্রকাশ পায় না, সেখানে সে অন্ধকার। যখনই সে আপনাকে দিয়া আপনার চেয়ে বড়কে প্রতিফলিত করিতে পারে তখনি সেই আলোতে সে প্রকাশ পায় ও সেই আলোকে সে প্রকাশ করে।' রবীন্দ্রনাথ কবি য়েট্‌সের কাব্যসম্বন্ধে এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। কবি স্বীকার করেন যে, জগতের উপর মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপরে বিশ্বমনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি। মানুষের মন নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহে, বাহিরের সহিত নিজের যোগস্থাপন করিতে চাহে। এই যোগ বুদ্ধির যোগ নহে, প্রয়োজনের যোগ নহে—আনন্দের যোগ। অর্থাৎ হৃদয়ের সম্পর্ক—সেখানে আদান-প্রদান আছে। এই রসবোধ তাহাকে বেহিসাবী করিয়া তোলে, তাহাকে দেউলে করিয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেন,

'আমাদের হৃদয়লক্ষ্মী জগতের যে কুটুম্ববাড়ি হইতে যেমন সওগাদ পায়, সেখানে তাহার অনুরূপ সওগাদটি না পাঠাইতে পারিলে তাহার গৃহিণীপনায় যেন ঘা লাগে। এইরূপ সওগাদের ডালায় নিজের কুটুম্বিতাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহাকে নানা মাল-মসলা লইয়া, ভাষা লইয়া, স্বর লইয়া, তুলি লইয়া, পাথর লইয়া সৃষ্টি করিতে হয়। সে দেউলে হইয়াও আপনাকে ঘোষণা করিতে চায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এই যে প্রকাশের বিভাগ - ইহাই প্রধান বাজে খরচের বিভাগ—এইখানেই বুদ্ধি-খাতাঞ্চিকে বারংবার কপালে করাঘাত করিতে হয়।'—(সাহিত্য)

এই হৃদয়ধর্ম হইতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। বিশ্বজগতেও এই হৃদয়ধর্ম বিরাজ করে– তাই এত ঐশ্বর্য ও এত সৌন্দর্য, তাই মানুষের হৃদয়ধর্মের সঙ্গে বিশ্বের এতটা যোগ। 'ফুল কেবলমাত্র বীজ হইয়া উঠিবার জন্য তাড়া লাগাইতেছে না, নিজের সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া সুন্দর হইয়া ফুটিতেছে; মেঘ কেবল জল ঝরাইয়া কাজ সারিয়া তাড়াতাড়ি ছুটি লইতেছে না, রহিয়া-বসিয়া বিনা প্রয়োজনে রঙের ছটায় আমাদের চোখ কাড়িয়া লইতেছে; গাছগুলা কেবল কাঠি হইয়া শীর্ণ কাঙালের মতো বৃষ্টি ও আলোকের জন্য হাত বাড়াইয়া নাই, সবুজ শোভার পুঞ্জ পুঞ্জ ঐশ্বর্যে দিগ্বধূদের ডালি ভরিয়া দিতেছে; সমুদ্র যে কেবল জলকে মেঘরূপে পৃথিবীর চারিদিকে প্রচার করিয়া দিবার একটা মস্ত অফিস তাহা নহে, সে আপনার তরল নীলিমার অতলস্পর্শ ভয়ের দ্বারা ভীষণ; এবং পর্বত কেবল ধরাতলে নদীর জল জোগাইয়া ক্ষান্ত নহে, সে যোগনিমগ্ন রুদ্রের মত ভয়ংকরকে আকাশ জুড়িয়া নিস্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে।' তাই জগতের মধ্যে হৃদয়-ধর্মের পরিচয় পাই। এই আত্মপ্রকাশে, যেখানে মানুষের প্রাচুর্য প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠে এবং সংসারের মধ্যে ফুরাইয়া যায় না, তাহার পরিচয় আমরা সত্যই পাই। জগৎ রসময় বলিয়াই মানুষের হৃদয় এই জগতের মধ্যে নিজেকে পাইতে চায়; এই আদর্শ সাহিত্যে সঞ্চিত হয়। এই আদর্শ, এই সকলের মধ্যে নিজেকে জানা, খণ্ডের ভিতর অখণ্ডকে উপলব্ধি করা, সীমার মাঝে অসীমের মিলন, ইহাই রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যের প্রধান কথা। বাহিরের জগতের অণুপরমাণুর ভিতর যে প্রকাশের আবেগ দেখিতেছি, নিজের অন্তরেও সে আবেগ আমরা অনুভব করি। এবং সাহিত্য সেই আবেগের, সেই আনন্দময় প্রকাশের ক্ষেত্র। 'যেখানে সাহিত্য-রচনার লেখক উপলক্ষ

মাত্র না হইয়াছে, সেখানে তাহার লেখা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; যেখানে লেখক নিজের ভাবনায় সমগ্র মানুষের ভাব অনুভব করিয়াছে, নিজের লেখায় সমগ্র মানুষের বেদনা প্রকাশ করিয়াছে, সেইখানেই তাহার লেখা সাহিত্যে জায়গা পাইয়াছে।' রবীন্দ্র-সাহিত্য এই নিত্যকালীন ও বিশ্বজনীন আদর্শে ধনী।

ঘরের মধ্যে থাকিয়া যে আকাশ দেখা যায়, তাহা খণ্ডাকাশ—তাহা লইয়া বিষয়ধর্ম, ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতা। কিন্তু বাহিরের যে আকাশ, তাহা মুক্ত মহাকাশ—অসীম ও বিশ্বব্যাপী। রবীন্দ্র-কাব্য এই বিশ্বব্যাপী আকাশে ছুটিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল—সেই অসীমত্ব তিনি তাঁহার খণ্ডাকাশের ভিতর দেখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার এই ভাবকে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

'আমারই মধ্যে দুটো দিক আছে—এক আমাতেই বদ্ধ, আর এক সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুই-ই যুক্ত এবং এই উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সত্তা। তাই বলেছি, যখন আমরা অহংকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরি, তখন আমরা মানবধর্ম-বিচ্যুত হ'য়ে পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাট পুরুষ যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন, তার সঙ্গে তখন ঘটে বিচ্ছেদ।'

রবীন্দ্রনাথ এই মহামানবের ডাক শুনিতে পাইলেন—সমস্ত মানবের ভিতর দিয়া, সংসারের ভিতর দিয়া, ভোগ ত্যাগ কিছুই অস্বীকার না করিয়া, সমস্ত স্পর্শ অনুভব করিয়া সেই মহামানবের দিকে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাতে ছুটিয়া চলিলেন—তারই পদপ্রান্তে জীবন টুটিতে চাহিলেন। তাই অনেকে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবি-প্রতিভার আত্মজীবন-চরিত হিসাবে গণ্য করেন—ইহা কবি-প্রতিভার স্বপ্নভঙ্গ বা জাগরণ। রবীন্দ্র-কাব্যের বিশ্বানুভূতি এই কবিতার মধ্যেই প্রথম প্রকাশ। কবি 'প্রভাত উৎসব' কবিতায় গাহিলেন—

'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'!
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মম, হাসিছে গলাগলি।
এসেছে সখাসখী বসিয়া চোখোচোখী
দাঁড়ায়ে মুখোমুখী হাসিছে শিশুগুলি॥'

বাল্যকালেই তাঁহার অন্তরে এই অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল—সেই কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন—

'The unmeaning fragments lost their individual isolation and my mind revelled in the unity of a vision. In a similar manner on that morning in the village the facts of my life suddenly appeared to me in a luminous unity of truth. All things that had seemed like vagrant waves were revealed to my mind in relation to a boundless sea. I felt sure that some Being who comprehended me and my world was seeking his best expression in all my experiences, uniting them into an ever-widening individuality which is a spritual work of art'—(Religion of Man)

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন যে, একটু নিবিষ্ট চিত্তে স্থির হইয়া চেষ্টা করিলে জগতের সমস্ত সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে (harmony) মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে তর্জমা করিয়া নিতে পারা যায়। তিনি সমস্ত বিশ্বস্পন্দনকে সংগীতের সুরে পুরিয়া এক অভিনব অনুভূতির চেতনালাভ করিতে চাহেন, তাই তিনি 'প্রতিধ্বনি'কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

'দেখা তুই দিবি নাকি? না হয় না দিলি
একটি কি পূরাবিনা আশ?
কাছে হতে একেবারে শুনিবারে চাই
তোর গীতোচ্ছ্বাস।
অরণ্যের, পর্বতের, সমুদ্রের গান
ঝটিকার বজ্রগীতস্বর,
দিবসের, প্রদোষের, রজনীর গীত,
চেতনার নিদ্রার মর্মর,
বসন্তের বরষার শরতের গান
জীবনের মরণের স্বর,
আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
ব্যাপ্ত করি বিশ্ব চরাচর,
পৃথিবীর, চন্দ্রমার, গ্রহতপনের
কোটি-কোটি তারার সঙ্গীত
তোর কাছে জগতের কোন্ মাঝখানে
না জানিরে হতেছে মিলিত।

সেইখানে একবার বসাইবি মোরে,
সেই মহা আঁধার নিশায়,
শুনিব রে আঁখি মুদি বিশ্বের সঙ্গীত
তোর মুখে কেমন শুনায়।'

এই বিশ্বের সংগীত তিনি গাহিয়াছেন। তিনি এই বিশ্বকে ভালবাসিয়াছেন; তাহার বুকে প্রাণ ঢালিয়াছেন; তাহাতেই তাঁহার গান জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার গানের গোপন ইতিহাস এই—একথা তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন—

'আকাশ-ভরা সূর্য্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান।
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরি দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি,
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।'

বিশ্বের দোলার সহিত কবির প্রাণ দুলিতে থাকে, বিশ্বের প্রবাহের আঘাতে তাঁহার প্রাণে গান উথলিয়া উঠে—বিশ্বের সঙ্গে এই গভীর ও নিবিড় যোগ রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই—

'আকাশ হ'তে আকাশ পথে হাজার স্রোতে
ঝরছে জগৎ ঝরণা ধারার মতো,
আমার মনের অধীর ধারা তা'রি সাথে বইচে অবিরত
দুই প্রবাহের ঘাতে ঘাতে
গান উথলায় দিনে রাতে
গানে গানে আমার প্রাণে ঢেউ নাড়া দেয় কত।
চিত্ত-তটে চূর্ণ সে গান ছায়ায় শত শত;
আকাশ-ডোবা ধারা দোলায় দুলি অবিরত।'

বিশ্বকে পাইবার জন্য যে ক্রন্দন, তাহা হইতে পারে দুরাশা, হইতে পারে 'নিষ্ফল কামনা,' কিন্তু সেই বাসনায় তিনি রঞ্জিত, সেই অনুভূতিতে তিনি পূর্ণ। কবি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

'সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস।
কী আছে বা তোর,
কী পারিবি দিতে।
আছে কি অনন্ত প্রেম,
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব।'

এই সমগ্র মানবকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা, অখণ্ড বিশ্বের সহিত আত্মার যোগ-স্থাপন—রবীন্দ্র-কাব্যে এই ব্যাকুলতা, এই ভাবময় আবেগ, এই অফুরন্ত রসের সন্ধান বিশিষ্ট রূপ দান করিয়াছে। বিচ্ছিন্নতাকে, ক্ষুদ্রতাকে এই অসীমের মধ্যে, সমগ্রতার মধ্যে, সম্পূর্ণতার মধ্যে তিনি পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাই কন্যার 'যেতে নাহি দিব' আবদার অপেক্ষা করিবার জন্য পিতা সমস্ত ধরণীতে সেই অবোধ বাণী শুনিতে লাগিলেন—

'চলিতেছি যতদূর
'শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর
'যেতে আমি দেব না তোমায়।' ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে
'যেতে নাহি দিব।'

*　　*　　*

'তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্মরে
এত ব্যাকুলতা, অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্তবায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে। বেলা ধীরে যায় চ'লে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশ্বত্থের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তের মাঝে।'

এই যে একটা অবিচ্ছিন্ন ঘটনার ভিতর অনন্তের সুর ও সমবেদনা অনুভব করা, এই যে ক্ষুদ্রের ভিতর বৃহৎকে পাইবার আকুলতা, ইহাকে গ্রহণ করিতে না পারিলে রবীন্দ্র কাব্যের প্রকৃত সুর ধরা যাইবে না—তাঁহার কাব্যে অনির্ব্বচনীয়তা থাকিবে না। ক্ষুদ্র ঘটনাকে অতিক্রম করিয়া অনন্তের রহস্যের দ্বারে বারবার তিনি করাঘাত করিয়াছেন—এই রহস্যময়ের পূজা করিয়াছেন, আরতি করিয়াছেন। কোথাও তিনি বেড়া দিয়া সংকীর্ণতাকে সংকীর্ণতর করেন নাই, সর্বদাই বিশ্বব্যাপ্ত মহাকাশে নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি সহজসুরে বলিয়াছেন—'মহাবিশ্ব-জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে নির্ভয়ে ছুটিতে হবে।' তিনি ক্ষুদ্রতার আবেষ্টনে থাকিতে চাহেন নাই, তাই তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন—

'নিমেষতরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে' যাইতে ছুটে' জীবন উচ্ছ্বাসে।
শূন্যব্যোম অপরিমাণ মদ্যসম করিতে পান,
মুক্ত করি' রুদ্ধ প্রাণ ঊর্দ্ধ নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্রকোণে আম্রবন ছায়ে,
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে গুপ্ত গৃহবাসে।'

ধরণীর রূপরসগন্ধ যাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে, সে কি করিয়া প্রাচীরের মধ্যে বাস করিতে পারে? ধরণীর দিকে বহুমানবের দিকে, মহামানবের আকর্ষণে কবি চলিতেছেন—তিনি নিজেকে অতিক্রম করিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছেন—

'শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে
সমস্ত প্রাণে, কেন-যে কে জানে
ভ'রে আসে আঁখি জল,
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুঃখে আঁকা,
লক্ষযুগের সঙ্গীতে মাখা,
সুন্দর ধরাতল।

রবীন্দ্র-কাব্যে এই সর্বানুভূতি আছে বলিয়াই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।

পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়, তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া ॥'

তাহার জন্য তিনি দূরকে নিকট করিতে পারিয়াছেন, অনাত্মীয়কে আত্মীয় করিয়াছেন, এবং নিজকে বিশ্বময় করিতে পারিয়াছেন। তিনি প্রণাম করিয়াছেন—

'নিখিলের অনুভূতি
সঙ্গীত সাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকুতি।
এই গীতিপথপ্রান্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে, একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্ম বাঁশি—এই মোর রহিল প্রণাম।'

প্রকৃতির সহিত যোগ

রবীন্দ্রনাথ কাব্যের মধ্য দিয়া বিশ্বের ক্ষেত্রে নিজেকে বিস্তার করিয়া দিলেন, এবং এই বিশ্বযাত্রার জন্য প্রকৃতির প্রতি তাঁহার একটি গভীর প্রেম জাগিয়া উঠিল; প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা, জগতের সমস্ত অণুপরমাণুর সহিত সগোত্রভাব এবং ধরণীর সহিত নিবিড় সংযোগ—ইহা তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন। এই বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানুষের নিগূঢ় সম্বন্ধ, ইহা রবীন্দ্র সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সুর। এই সুর বাজিয়া উঠিল নিজেকে বিশ্বময় করিয়া দেখিবার প্রচেষ্টায়। যে প্রেরণায় জীবনের সকল বিচিত্রতার ভিতর দিয়া ক্ষুদ্রতার গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া বিরাটের সহিত মিলিত হইবার বাসনা উদ্রেক হইয়াছে, তাহারই তাগিদে কবি প্রকৃতির সহিত, ধরণীর রূপরসের সহিত নিগূঢ় যোগ অনুভব করিয়াছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ জলে-স্থলে আকাশে-বাতাসে তাঁহার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন—কোথাও যেন তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের গর্ব নাই, শুধু নিজেকে দান করিবার, লয় করিবার, সংযুক্ত করিবার পালা। 'বসুন্ধরা' কবিতায় তিনি শুনিয়াছেন—"ডাকে যেন মোরে অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার ক'রে সমস্ত ভুবন।' কারণ তিনি সকলের সহিত সংযুক্ত হইয়া নিখিলের বিচিত্র আনন্দ আস্বাদন করিতে চাহেন। তিনি নিখিলের সমস্ত কিছুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহেন তাঁহার বক্ষের কাছে,

বিশ্বের সকল পাত্র হইতে আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে পান করিতে চাহেন—সর্বলোকের সহিত দেশদেশান্তরে স্বজাতি হইয়া থাকিতে চাহেন। তিনি বলিয়াছেন—

'ওগো মা মৃণ্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো। বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধকারাগার, হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হ'তে প্রান্তভাগে, উত্তরে দক্ষিণে
পূরবে পশ্চিমে। শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন-রসে।'

এই জলস্থল, তরুলতা, পশুপক্ষী, চন্দ্র সূর্য, বিশ্বের সমস্ত রূপ ও সমস্ত স্পর্শ কবির অন্তরবীণায় নব নব সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছে। সবুজ ঘাস, শরতের আলো, সূর্য্যকিরণ কবির অন্তঃকরণে আনন্দের বন্যা আনিয়া দিয়াছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই চেতনা-প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে, তাই সমস্ত জড়জগৎ জীবনের আবেগে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন—

'প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব করি বলিয়া। এই তৃণগুল্মলতা, জলধারা, বায়ুপ্রবাহ, এই ছায়ালোকের আবর্তন, জ্যোতিষ্কদলের প্রবাহ, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীপর্য্যায়, এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ী-চলাচলের যোগ রয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো, তাই এই ছন্দের যেখানেই যতি পড়চে সেখানে ঝঙ্কার উঠ্‌ছে, সেখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে।'

কবি 'প্রবাসী' কবিতায় লিখিয়াছেন—

'হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল কিছুতেই নাই ভাবনা।
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে অন্তবিহীন আপনা॥
বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে প্রতিকণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগত শতকোটি কর হানিছে॥

** ** *

জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চিরগৌরব, একথা না যদি শিখিলে,
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে।'

কবি এই বিশ্বে প্রবাসী নহেন ; তিনি বলেন যে, 'জনমে জনমে মরণে' কোথাও তাঁহার প্রবাস নাই ; নিখিলের 'ধূলায় ধূলায়' প্রেম আছে, ছোট কণায়ও দরদ্ আছে ; তাই,

'ছিন্ন পত্র মোর গীতে
ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশ্বাস। ধরণীর অন্তঃপুরে
রবিরশ্মি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে
যে নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর অবনী অন্তরালে তারে দিনু উৎসারিয়া
এ বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে।'

কবি কোন বস্তুকে তুচ্ছ করিয়া দেখেন নাই, কাহাকেও অবহেলা করেন নাই। তিনি গাহিতে পারিয়াছেন—

'যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়
সকলি দুর্লভ ব'লে আজি মনে হয়॥
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।'

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, জগতের একটি প্রধান ধর্ম্ম পরার্থপরতা। যখনি আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য প্রাণপণ করা যায়, তখনই সুখের সীমা থাকে না,

তখনি অনুভব করা যায় যে, সমস্ত জগৎ তাহার স্বপক্ষে। 'আমি ছিলাম ক্ষুদ্র, হইলাম অত্যন্ত বৃহৎ। চন্দ্রসূর্য্যের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইল।' তাই—

'যদি চিনি যদি জানিবারে পাই,
ধূলারেও মানি আপনা।'

মানুষ মহামনবের সংগীত ভুলিতে পারে না, ভুলিলে সেখানে তাহার হৃদয়-ধর্ম্ম-স্খলন হইবে। যেমন, 'শঙ্খকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান ভুলিতে পারে না, উহা কানের কাছে ধরো, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের মর্মস্থলে তেমনি স্বর্গের গান বাজিতে থাকে। কেবল বধির তাহা শুনিতে পায় না। পৃথিবীর পাখীর গানে পাখীর গানের অতীত আরেকটি গান শুনা যায়, প্রভাতের আলোকে প্রভাতের আলোক অতিক্রম করিয়া আরেকটি আলোক দেখিতে পাই, সুন্দর কবিতায় কবিতার অতীত আরেকটি সৌন্দর্য্য-মহাদেশের তীরভূমি চোখের সম্মুখে রেখার মত পড়ে।'

মোহিতচন্দ্র সেন বলিয়াছেন—

'রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির সহিত তাহার অসীম অনুরাগ, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে তাহার একান্ত আত্মহারাভাব, প্রকৃতির মূলে যে বিরাট রহস্য বা মিষ্টেরী তাহার নিবিড়তম অনুভূতি। প্রকৃতি তাহার নিকট জড় নহে, ইহা প্রাণময়ী। ইহাকে কবি কখনও জননী, কখন প্রেয়সী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলীর মত মোটের উপর ইহার মধ্যে তিনি অনন্ত বিশ্বচৈতন্যের এক বিকাশ দেখিয়াছেন। মানুষের মধ্যে এই চৈতন্যের আর এক প্রকাশ। তাই মানুষ প্রকৃতির মধ্যে আপনার দোসরকে প্রাপ্ত হইয়া এত আনন্দ লাভ করে।'

এই সম্পর্কে একটা কথার আলোচনা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, অনেকের মতে আমরা ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে প্রকৃতির সহিত এক নূতন সম্পর্ক পাতাইয়াছি এবং প্রকৃতিকে নূতন আলোকে দেখিয়াছি—কারণ,

'Like Wordsworth, we make love to nature and extract a philosophy out of it. Like Shelly, we invest it with mystic metaphysics. Like Byron, we make it the cue for pouring forth passionate rhapsodies.'

পশ্চিমের প্রভাবের ফলে নাকি আধুনিক সাহিত্যে আমরা বিশ্বপ্রকৃতিকে প্রাণবান ও রূপবানের লীলাভূমি কল্পনা করিয়াছি। একথা ঠিক যে, প্রকৃতিকে প্রাণময়ী বলিয়া কল্পনা করা কাব্যের, বিশেষতঃ রোমান্টিক কাব্যের, ধর্ম।

অনেকে মনে করেন যে, ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের (যথা,—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীটস্‌ প্রভৃতি) নিকট হইতে প্রকৃতির ভিতর প্রাণের স্পন্দন রবীন্দ্রনাথ শুনিতে পাইয়াছেন। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন আমাদের সাহিত্যে পশ্চিম-প্রভাবের রূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন,

'Thus nature is no longer to be treated merely as a cold and beautiful abstraction, but as a sentient being; it is not a dead thing altogether but sometimes to be treated as having a soul.'

মানুষের জীবনে যেমন বিচিত্র প্রাণধারা প্রবাহিত হইয়াছে, বিশ্বপ্রকৃতিতেও তাহারই অনুরূপ একটি স্রোত বহিয়া গিয়াছে, এবং প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে একটা গভীর সংযোগ আছে—ইহা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ফুটিয়া উঠে নাই। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যে সেই সংযোগের পরিচয় লাভ করিয়া আমরা তাহার সহিত বিদেশীয় রোমান্টিক কাব্যের মিল খুঁজিয়া পাই। এই মিলনে যে পশ্চিমের প্রভাব নাই তাহা অস্বীকার করিলে ইংরাজী সাহিত্য আমাদের কি ভাবে অভিভূত করিয়াছিল তাহার রূপ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যাইবে না। কিন্তু পশ্চিমের প্রভাব থাকিলেও তাহাই চরম কথা নয়। আমার মনে হয় যে, প্রকৃতির সহিত, বিশ্বের সহিত মানুষের যে একটা গভীর সংযোগ আছে এবং মানুষ যে সেই সংযোগ স্থাপন না করিতে পারিলে অসম্পূর্ণ ও ব্যর্থ, এই রহস্য তিনি ভারতীয় দর্শন হইতে লাভ করিয়াছিলেন। এই বিশ্বানুভূতি যে নিতান্ত ভারতীয় বোধ হইতে উদ্ভুত, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

The West may believe in the soul of Man, but she does not really believe that the universe has a soul. Yet this is the belief of the East, and the whole mental contribution of the East to mankind is filled with this idea.' (Personality)

এই 'universal soul-এ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী এবং এই বিশ্বাসের জোরেই আমরা ব্যক্তি ও বিশ্বের সহিত ঐক্য (harmony) স্থাপন করিতে চাহিয়াছি। এই ঐক্য স্থাপন করিতে গিয়াই ভারতের ঋষিরা অনুভব করিয়াছেন যে, প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করিলে ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না। ভারতের সভ্যতা বনে উপবনে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাই প্রকৃতিকে তাঁহারা অবহেলা করিতে পারেন নাই; প্রকৃতিকে শুধু জড়সমষ্টি ভাবিয়া নিজের সাধনমন্ত্র প্রচার করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ

'Sadhana'-গ্রন্থে ভারতীয় সাধনার আদর্শকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমি কবির নিজের কথাই এইস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

'In India it was in the forest that our civilisation had its birth, and it took a distinct character from this origin and environment. It was surrounded by the vast life of nature, was fed and clothed by her, and had the closest and most constant intercourse with her varying aspects……The earth, water and light, fruits and flowers to her were not merely physical phenomena to be turned to use and then left aside. They were necessary to her in the attainment of her ideal of perfection, as every note nessary to the completeness of the symphony. India intuitively felt that the essential fact of this world has a vital meaning for us; we have to be fully alive to it and establish a conscious relation with it, not merely impelled by scientific curiosity or greed of material advantage, but realising it in the spirit of sympathy, with a larger feeling of joy and peace…… When a man does not realise his kinship with the world he lives in a prison-house whose walls are are alien to him. When he meets the eternal spirit in all objects, then he is emancipated, for then he discovers the fullest significance of the world into which he is born; then he finds himself in perfect truth, and his harmony with the all is established. In India men are enjoined to be fully awake to the fact that they are in the closest relation to things around them, body and soul, and that they are to hail the morning sun, the flowing water, the fruthful earth, as the manifestation of the same living truth which holds them in its embrace.'

উক্ত আদর্শে রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবিত বলিয়াই মনুষ্য-জীবনে এবং বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দনস্রোত ও সংযোগবোধ তাঁহার কাব্যে সমান বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করিয়াছে, যাহা ইংরাজী রোমান্টিক কাব্যেও দুর্লভ। রবীন্দ্র-কাব্যের বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য সত্যই বিস্ময়কর—তাঁহার রসপিপাসু চিত্ত সকল প্রকাশ হইতেই রস আহরণ করিয়াছে। ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্ত বলেন—

'বিশ্বের প্রাণের স্পন্দন রবীন্দ্রনাথ এত গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন যে,

কেহ এইরূপ মনে করিতে পারেন যে তিনি হয়ত প্রকৃতির বাহ্যরূপ সমৃদ্ধি সম্বন্ধে অনেকটা অচেতন হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাহা নহে। জগতের অন্যকোন কবি বহিঃপ্রকৃতির রূপরসগন্ধের এত বিচিত্র, এত বিলাস-সমৃদ্ধ চিত্র আঁকিয়াছেন কি না সন্দেহ। এই বিষয়ে কীটস ছাড়া অন্যকোন কবি তাঁহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। কালিদাসের কাব্যে এই প্রকারের সমৃদ্ধি আছে, কিন্তু অনুরূপ বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য নাই।' (রবীন্দ্রনাথ)

সংস্কৃত-কাব্যেও প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি কবিদের দরদ ছিল এবং মানবমনের সঙ্গেও প্রকৃতির আন্তর-যোগ তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন। ডক্টর সুশীল কুমার দে বলেন—

'One poem the Ritu-samhara, usually attributed to Kalidasa, reviews in six cantos the six Indian seasons in detail and explains elegantly, if not with deep feeling, the season's meaning for the lover. The same power of utilising nature as the background of human emotion is seen in the immortal Megha-duta in which the grief of the separated lovers, if somewhat sentimental, is nevertheless earnest in its intensity of recollective tenderness and in its being set in the midst of splendid natuarl scenery which makes it all the more poignant. The description of external nature in the first half of the poem is heightened throughout by an intimate association with human feeling ; while the picture of the lover's sorrowing heart in the second half is skilfully framed in the surrounding beauty of nature. In the same way, the groves and gardens of nature form the background not only to the pretty and fanciful love intrigues of the Sanskrit play, but also to the human drama played in the hermitage of Kanva, to the madness of Pururavas, to the pathos of Rama's hopeless grief for Sita in the forest of Dandaka, to the love of Krishna and Radha on the banks of Jumuna, dark with the shadow of rain-clouds.' (Treatment of Love In Sanskrit Literature)

কিন্তু প্রকৃতিকে প্রাণময়ী, রহস্যময়ী ও প্রেয়সী ভাবিয়া তাহার সহিত যে গভীর যোগ রসের যে বৈচিত্র্য, অনুভূতির যে বিস্তৃতি রবীন্দ্র-কাব্যে পাই, তাহা সংস্কৃত সাহিত্যে বা বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে ছিল না। প্রকৃতির সহিত কবির

এই গভীর যোগ আছে বলিয়াই তিনি প্রকৃতি-বর্ণনায় চিত্রকবি নহেন, গীতিকবি। প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া তিনি শুধু বাহিরকে দেখেন নাই—অন্তরের ঐশ্বর্যকেও অনুভব করিয়াছেন। ঋতু-উৎসবে তিনি যে শুধু মাতিয়া উঠিয়াছেন, তাহা নহে, ঋতুর নানা শোভা, নানা রঙ তাঁহার মনে রঙ ধরাইয়া দিয়াছে। তাই, বর্ষার সজল হাওয়া তাঁহার কানে কানে কত কথা বলিয়া যায়, হৃদয়ে নূতন ঢেউ আসিয়া কূল খুঁজিয়া পায় না এবং বাঁধনহারা বৃষ্টিধারায় কবি সমস্ত কথা ভুলিয়া যান। বর্ষার সন্ধ্যায়, আষাঢ়ের আঁধারে কবির শুধু বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে; তখন কথা নয়, শুধু অনুভব। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে কবি অনুভব করিতেছেন—

'অন্তরে আজ কি কলরোল,
দ্বারে দ্বারে ভাঙলো আগল।
হৃদয়-মাঝে জাগলো পাগল
আজি ভাদরে।
আজ, এমন করে কে মেতেছে
বাহিরে ঘরে।'

আকাশের বেদনার সহিত কবি হৃদয়ের রাগিণী মিল করাইয়াছেন, তাই প্লাবনের দিগন্তে জলধারার বেগে কবির প্রাণ অশান্ত বাতাসে শূন্যে শূন্যে অনন্তে ছুটিয়া গিয়াছে। তিনি উদাসী হইয়াছেন; কাননেন মাঝে যেন অসীম রোদন মর্মরিয়া উঠিয়াছে, শর্বরী বিরহকাতর হইয়া কবিকে ব্যথা দিয়াছে। কবি বলিতেছেন—'আমার প্রাণের রাগিণী আজি গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।' কবির হৃদয় এই বর্ষার তিমিরে, সমীরে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। শ্রাবণের পূর্ণিমাতে তিনি চোখের জল দেখিতে পান, শ্রাবণ হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে তিনি বেদনা অনুভব করেন। এই বেদনা পান বলিয়াই তিনি বলিলেন—

'বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণ প্রাতে॥'

কারণ—

'অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা॥

কিন্তু বর্ষার শেষে শরতের প্রথম প্রত্যুষে যে শুকতারা দেখা দেয়, সে-ও কবিকে ডাক দিয়া বলে, আয় আয় আয়। কবি শুনিতে পান—

'মালতীর বনে বনে
ঐ শোন ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশির বায়
আয় আয় আয়।'

শরতের অরুণ আলো তাঁহার অন্তরকে দুলাইয়া দেয়। শরতের নীরব ব্যথা তাঁহার অন্তরে পৌঁছিয়াছে। শরতের প্রভাত আলো দেখিয়া কবি মাতিয়া উঠিলেন, তিনি গাহিলেন —

'ওরে মন, খুলে দে মন,
যা আছে তোর খুলে দে।
অন্তরে যা ডুবে আছে
আলোক পানে তুলে দে।
আনন্দে সব বাধা টুটে
সবার সাথে ওঠরে ফুটে'
চোখের পরে আলস ভরে
রাখিস্‌নে আর আঁচল টেনে।'

এই আবরণ টুটিয়া ফেলিয়া দিয়া তিনি আকাশ ভাঙিয়া বাহিরকে লুট করিয়া লইতে অধীর হইলেন। তিনি তাঁহার হিয়ার মাঝে শরতের নূপুর-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন, সকল ভাবে, সকল কাজে; পাষাণ-গলা সুধা ঢালিয়া শরতের নয়ন ভুলানো রূপ আসিয়া মায়া ছড়াইয়া দিল।

কবি গাহিয়া উঠিলেন —

'ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই
যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেবরে লুঠ ক'রে॥'

বসন্তের ভিতর কবি তাঁহার অন্তর-রাগিণীকে খুঁজিয়া পাইলেন। কবি জিজ্ঞাসা করিলেন—

'যদি তারে নাই চিনি গো
সে কি আমায় নেবে চিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে ?'

কিন্তু বসন্ত চিনিয়া লইল, দখিন হাওয়ায় তাঁহার সুপ্তপ্রাণ জাগাইয়া দিল,

বেণুবনের নৃত্যদোলায় তাঁহার চিত্তে মুক্তি-দোলা দান করিল। কবি আবার বলিয়া উঠিলেন—

'যে গান তোমার সুরের ধারায়
বন্যা জাগায় তারায় তারায়,
মোর আঙিনায় বাজলো সে সুর
আমার প্রাণের তালে তালে।
সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে
তোমার হাসির ইসারাতে।
দখিন হাওয়া দিশাহারা
আমার ফুলের গন্ধে মাতে।'

* * *

'তোমার হাসির আভাস লেগে
বিশ্ব-দোলন দোলার বেগে
উঠ্‌লো জেগে আমার গানে
কল্লোলিনী কলরোলা।'

এই প্রকৃতির নানা খেলায় কবি তাঁহার ঈপ্সিতাকে পাইতে চান এবং পান, তাহার সন্ধান করেন এবং মিলনের সুরে নানা তানে রণিয়া উঠেন। কবির কানে-কানে কথা ভরিয়া উঠে, সুদূরের সুরে সুরে চিত্ত উথলিয়া উঠে, চোখে চোখে চাওয়া তাহার আগমন বরণ করেন। কবি গাহিলেন—

'আজি কি তাহার বারতা পেলরে কিশলয় ?
ওরা কার কথা কয় বনময় ?
আকাশে আকাশে দূরে দূরে
সুরে সুরে
কোন পথিকের গাহে জয় ?
যেথা চাঁপা-কোরকের শিখা জ্বলে
ঝিল্লি-মুখর ঘন-বনতলে,
এসো কবি, এসো, মালা পরো
বাঁশি ধরো,
হোক্‌ গানে গানে বিনিময়।'

কবি প্রার্থনা জানাইতেছেন যেন ফাল্গুন তাঁহার পরাণের পাশে আসে এবং

অঞ্জলি ভরিয়া সুধারস ঢালিয়া দেয়, মধু-সমীর যেন পুলকের হিল্লোল আনিয়া হৃদয়ের পথতলে চঞ্চলতা জাগায় এবং মনের বনের শাখে যেন নিখিল কোকিল ডাকে। তাই—

'রঙে রঙে রঙিল আকাশ
গানে গানে নিখিল উদাস,
যেন চল-চঞ্চল নব পল্লবদল
মর্মরে মোর মনে মনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে।'

বৈশাখের রুদ্র রূপ কবি দেখিলেন, যেন 'মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ', যেন 'রহি' রহি' দহি' দহি' উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া', যেন 'আবর্তিয়া তৃণপূর্ণ, ঘূর্ণ্যচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া চূর্ণ রেণুরাশ।' এই রুদ্র মূর্তির 'উদার উদাস কণ্ঠ' কবিকে অভিভূত করিল, তাই তিনি বলিলেন—

'সকরুণ তব মন্ত্রসাথে
মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক্ বিশ্বপরে,
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে, ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্তস্বরে,
অশ্বত্থ ছায়াতে।'

প্রকৃতির সহিত যে কবির গভীর ও নিবিড় যোগ স্থাপিত হইয়াছে, সেই কথাই তিনি বারংবার স্বীকার করিয়াছেন—

'আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ,
ছয় ঋতু ধায় আকাশ তলায়, তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হ'তে না রইলো ব্যবধান।
যে দূতগুলি গগন-পারের আমার ঘরের রুদ্ধ দ্বারের
বাইরে দিয়েই ফিরে ফিরে যায়;
আজ হয়েছে খোলাখুলি তাদের সাথে কোলাকুলি,
মাঠের ধারে পথতরু ছায়।'

তাই কবি বাতাসে বাতাসে, আমের নব মুকুলে, কভু নবমেঘভারে ইসারা পান এবং তাহারা কবিকে ডাকিয়া যায়—

'নদী কূলে কূলে কল্লোল তুলে
গিয়াছিলে ডেকে ডেকে।

বনপথে আসি করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষা শেষের গগন কোণায় কোণায়
সন্ধ্যা মেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
ছুঁয়ে গেছে থেকে থেকে
কখনও হাসিতে কখন বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।'

আশ্বিনের 'ঝরে পড়া' শিউলী ফুল কবিকে নক্ষত্রের বন্দনাসভায় ডাকিয়া যায়, আকাশে আকাশে কার কথা কবি শুনিতে পান, এবং আম্রমুকুলের গন্ধ-ব্যাকুল স্বর কবির প্রাণ জাগাইয়া তোলে; এবং তিনি জানেন যে, 'অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি ফাল্গুনের মর্মে করে বাস, দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস।'

রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, পৃথিবী তাহার সমস্ত শোভা দিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইতেছে, সেই আমন্ত্রণকে তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তিনি বলেন,

'I believe in an ideal life. I believe that in a little flower, there is a living power hidden in a beauty which is more potent than a Maxim gun. I believe that in the bird's notes nature expresses herself with a force which is greater than that revealed in the deafening roar of the cannonade. I believe that there is an ideal hovering over the earth—an ideal of that Paradise which is not the mere outcome of imagination, but the ultimate reality towards which all things are moving. I believe that this vision of Paradise is to be seen in the sunlight, and the green of the earth, in the flowing streams, in the beauty of spring time—the repose of a winter morning. Everywhere in this earth the spirit of Paradise is awake and sending forth its voice.'

আমাদের আকাশে বাতাসে আবেদন বেশী, এই কথাটিই লণ্ডন হইতে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে লিখিয়াছেন—

আমাদের দেশের আকাশ আমাদের কাজ ভোলায়, আকাশ আপনার সমস্ত জানালা দরজা এমন ক'রে অহোরাত্র খুলে রেখে দিয়েছে যে, মন সে-নিমন্ত্রণ একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারে না। আমাদের বৈষ্ণব-কাব্যে সেই জন্যই যে-বাঁশি

বাজে সে-বাঁশি কুলবধূর কাজ ভুলিয়ে দেয়—সে আমাদের সমস্ত ভালমন্দ থেকে বাহির করে আনে। কিন্তু এমন কথা এদেশের লোক মুখে আনতেই পারে না—এমন কি ভগবান আমাদের ভোলাচ্ছেন একথা শুনলে এরা কানে হাত দেয়। কেন না এদের আকাশে এই বাণীর লেশ মাত্র নেই। আমাদের আকাশ যে ছুটির আকাশ, এদের আকাশ অফিসের আকাশ। এদের আকাশে ঘণ্টা বাজে, আমাদের আকাশ বাঁশি বাজায়। সেই জন্য এরা বলে জীবন সংগ্রাম, আমরা বলি জীবন লীলা।'

রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই ধরণীর সহিত কবির দেহ-মন মিশিয়া আছে; তাই তিনি গাহিলেন—

'তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে
তোমার ঐ শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি
মনে গাঁথা।'

এই মৃন্ময়ী মাতা, এই প্রকৃতির বর্ণচ্ছটা সমস্তই তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাই প্রতি ঋতুতে তিনি নবনব রস সৃষ্টি করিয়াছেন, নবনব অনুভূতি উপলব্ধি করিয়াছেন। কবির কাছে সবুজের আমন্ত্রণ, কচিধানের খামখেয়ালী খেলা, সূর্য ওঠার রাঙা-রঙিন বেলা, ফাল্গুন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতা, কচি পাতার কলকথা তাহাদের দাবি জানাইয়াছে। কবি লিখিয়াছেন—

'যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,
যাই চলে যাই মুক্তি সুখে,
ইটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে।'

যে-আমি নিজের ভিতর থাকে, সে মুক্তও নয়, সে তৃপ্তও নয়; তাই কবি গাহিলেন—

'যে আমি ঐ ভেসে চলে
কালের ঢেউয়ে আকাশ তলে,
দূরে রেখে দেখছি তারে চেয়ে
ধূলার সাথে, জলের সাথে
ফুলের সাথে, ফলের সাথে
সবার সাথে চল্‌চে ওযে ধেয়ে।'

যে-আমি সকলের সহিত চলিতেছে, সে-ই মুক্ত, তৃপ্ত, দীপ্ত এবং শান্ত। সেই 'আমি'র একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে না, একটু ঘায়ে ক্ষত জাগে না—সে বিশ্বনৃত্যে নূতন শক্তি পায়, নূতন বিত্ত পায়।

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রের সহিত আত্মীয়তা, একাত্মতা এবং চিরবন্ধনযোগ অনুভব করিয়াছেন। প্রাণের ঐশ্বর্যে কাহাকেও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে চাহেন না—তাই সমুদ্রের কল্লোলের ভাষা তিনি যেন বুঝিয়াছেন। তিনি বলিলেন—

'মনে হয় অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে-রক্ত বহে, সে-ও যেন ওই ভাষা জানে
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণ মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে'
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে।'

রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রকে 'আদি জননী' বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন এবং এই বসুন্ধরা তাহার সন্তান। তাই সমুদ্রের প্রতি তিনি গভীর যোগ অনুভব করেন, সমুদ্রের কলতানের ধ্বনিতে পূর্বজন্মের স্পন্দন তাঁহার শিরায় শিরায় জাগিয়া উঠে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

'এই কবিতায় প্লেটোর জীবনস্মৃতি-মতবাদ, নিও-প্লেটোনিক মতবাদ জড়ে আত্মার অস্তিত্ব এবং জার্মাণ দার্শনিক শেলিং-এর একাত্মতা-মতবাদ (Platonic doctrine of Reminiscences; Neo-Platonic doctrine of a soul in inanimate objects; Schelling's doctrine of Identity) যেন একত্রে মিশ্রিত হইয়া কবিত্বে মণ্ডিত হইয়াছে।' (রবি-রশ্মি)

রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির বিস্তৃতি আমরা দেখিতে পাই যখন তিনি বলেন যে, তাঁহার নাড়ীতে যুগযুগান্তরের বিরাট স্পন্দন নৃত্য করিতেছে। কবি এই অপূর্ব স্পন্দনের কথা লিখিতেছেন—

'এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে

নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে বরষে বরষে,
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু সমুদ্র দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাঁটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান।
সেই যুগ যুগান্তরের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।'
(নৈবেদ্য)

প্রকৃতির সহিত এই আত্মীয়তা কবি গভীরভাবে অনুভব করেন—এই যোগ আজিকার নয়, বহু যুগের, সৃষ্টির আরম্ভের পূর্ব হইতে। 'কবে আমি বাহির হ'লেম তোমারি গান গেয়ে—সে তো আজকে নয়, আজকে নয়।'

জীবনের অনন্ত অনাদি প্রবাহ-বোধ প্রকৃতির সহিত যোগকে অর্থপূর্ণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিতে পারিয়াছেন—

'পাখী তাদের শোনায় গীতি, নদী শোনায় গাথা,
কত রকম ছন্দ শোনায়, পুষ্প লতা পাতা,
সেইখানেতে সরল হাসি সজল চোখের কাছে
বিশ্ববাঁশির ধ্বনির মাঝে যেতে কি সাধ আছে।
হঠাৎ উঠে উচ্ছ্বসিয়া কহে আমার গান,
সেইখানে মোর স্থান।'

মৃত্যু ও জীবনের সম্বন্ধ

প্রকৃতির নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথ শিখিয়াছেন যে, মৃত্যু জীবনের অবসান নয়, মৃত্যুই জীবনের প্রকৃত পরিচয়। অন্ধকার যেমন আলোককে প্রকাশ করে, শীত বসন্তের আগমন-বার্তা ঘোষণা করে, তেমনি মৃত্যু জীবনের অগ্রদূত। কোথাও বিলয় নাই; যাহা দেখি তাহা পরিবর্তন, বিনাশ নয়। এই তত্ত্বরস (mysticism) রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির নানা রূপপরিবর্তন হইতে শিখিয়াছেন, প্রকৃতির সহিত

যুগযুগান্তরের সংযোগ হইতে অনুভব করিয়াছেন। তিনি জানেন যে, জীবনের পিছনে মরণ দাঁড়াইয়া আছে, আশার পিছনে ভয়, দিবসের পিছনে রজনী, আলোকের পিছনে ছায়া। তাই কবি নৈবেদ্য-কাব্যে বলিয়াছেন—

'মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মত। জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।
স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।'

কারণ এই স্রোতকে বদ্ধ করা যাইবে না—

'সাঙ্গ হলে মেঘের পালা
স্বরু হবে বৃষ্টি ঢালা;
বরফ জমা সারা হলে
নদী হয়ে গলবে।'

মৃত্যু সকল বস্তুর পরিপূর্ণতা আনিয়া দেয়। বৃষ্টি মেঘের অবসান নয়, মেঘের পূর্ণ প্রকাশ। তাই জীবনটাকে মৃত্যু একটা চঞ্চল অসমাপ্তি, ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। জীবনের প্রান্তে মরণ দাঁড়াইয়া থাকে, কোথাও সমাপ্তি নাই; সেই মরণের মধ্যে জীবনের জয়মাল্য, কারণ তাহার মধ্য দিয়া জীবনকে আরও সার্থকরূপে দেখা যায়। এই প্রকাশের লীলা জীবন ও মৃত্যুর ভিতর দিয়া চলিতেছে; অসম্পূর্ণতা পরিপূর্ণতার রূপে নূতন জীবন পায়। যাহাকে আমরা মৃত্যু ভাবি তাহা হইল রূপান্তর, যেমন বরফ গলিয়া জল হইয়া যায়। অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেন :—

'রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠকমাত্রেই জানেন যে, তিনি জীবনকে এবং মৃত্যুকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন না। তিনি মৃত্যুকে জীবনেরই পূর্ণতর পরিণাম বলিয়া মনে করেন। 'সিন্ধুপারে' কবিতাটিতে এই ভাব, 'ঝরণা তলা' কবিতাটিতেও এই একই ভাব—যে, জীবনে যেটা ঝরণারূপে সাতপাহাড়ের সীমানার মধ্যে রহিয়াছে, মৃত্যুর পরে তাহাই সেই সীমা অতিক্রম করিয়া নদী হইয়া বহিয়া গিয়াছে, মৃত্যু ছেদ নয়, সে পরিপূর্ণতা।' (কাব্য-পরিক্রমা)

মৃত্যুকে পরিপূর্ণ মধুর রূপে দেখিয়া কবি কহিতেছেন—

'পরাণ কহিছে ধীরে, হে মৃত্যু মধুর,
এই নীলাম্বর, এ কি তব অন্তঃপুর ?'

—চৈতালী

মৃত্যু এমন করুণ, মৃত্যু এমন সুন্দর। মৃত্যু আছে বলিয়াই কোথাও কোন ভার নাই, কোথাও কোন বন্ধন নাই। মৃত্যু না থাকিলে সবই যেন আনন্দহীন হইয়া উঠিত। তাই কবি বলিয়াছেন—

'সে এলে সব আগল যাবে ছুটে
সে এলে সব বাঁধন যাবে টুটে—'

মৃতুকে ভয় করিবার কিছু নাই। প্রাণের এই অনন্ত প্রবাহ মৃত্যুর ভীষণ মূর্তিকে কাড়িয়া লইয়াছে। তিনি মৃত্যুকে বলেন, 'তুমি কেন এত চুপে চুপে আস, তুমি কেন আস-যাও, তুমি আমার চোখে ঘুমঘোর বিছাইয়া দিবে, অবশ বক্ষশোণিতে দোল দিবে। তোমার মিলনে কোন সমারোহ নাই, কেন কোন মঙ্গলাচরণ নাই ?' মৃত্যুকে কবি বলিতেছেন, 'আমি যদি কাজে ব্যস্ত থাকি, আমি যদি অবসন্ন হৃদয়ে শুইয়া থাকি, হে নাথ, তুমি শঙ্খ বাজাইয়া আসিয়ো—চোরের মত আসিয়ো না।' মৃত্যুর সহিত মিলনের জন্য তিনি আকুল—কারণ মৃত্যুভয় তাঁহার নাই। তাই তিনি বলেন—

'তুমি উৎসব করো সারারাত
তব বিজয় শঙ্খ বাজায়ে,
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি' হাত
নব রক্তবসনে সাজায়ে।
তুমি কারে করিয়ো না দৃক্‌পাত
আমি নিজে লব তব শরণ,
যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥'

* * *

'আমি যাব, যেথা তব তরী রয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
করি' আঁধারের অনুসরণ।'

মৃত্যুকে তিনি এই প্রেমিকারূপে বরণ করিয়াছেন। এই অতিথির জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে চাহেন—কারণ তাহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। এই অতিথির জন্য তিনি কাজ সমাপন করিয়া দ্বার খুলিয়া অপেক্ষা করিবেন। এই অতিথি একদিন গৃহের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া তাহার রথে গ্রহতারকার পথে লইয়া যাইবে। এই মৃত্যু তাঁহার সমাপ্তি আনিবে না, এই জীবন অন্তহীন—যেমনি অনাদিকাল হইতে আসিয়াছে, তেমনি অনাদিকাল চলিবে। মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—

'পূজা আয়োজন সব সারা হবে একদিন,
প্রস্তুত হ'য়ে রবো,
নীরবে বাড়ায়ে বাহু দুটি সেই গৃহহীন
অতিথিকে বরি' লব ॥'

কারণ কবি জানেন যে সম্মুখে অনন্তলোক আছে, তাই তিনি অন্ধ ধরণীকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহেন না ; বন্ধ তরণীকে খুলিয়া দিয়া অনন্তলোকে পৌঁছানো যাইতে পারা যায়। কবির বিশ্বাস আছে যে, তাঁহার অগীত গান অকথিত বাণী মরণের প্রান্ত পার হইয়া আবার নূতন ছন্দে পূর্ণতা লাভ করিবে—

'অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হলো তুলে।
রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে।
সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীন রজনীর তারা
নব জন্ম লভি'
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী।'

(পূরবী)

মরণের সহিত শুভদৃষ্টি হইলে জীবন নূতন পথে যাত্রা আরম্ভ করে। যাহা অসম্পূর্ণ থাকে, তাহা মৃত্যু ঘুচাইয়া দেয়। কারণ সম্পূর্ণতার দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার একমাত্র উপায় মৃত্যু। এই মৃত্যুকে কবি প্রেয়সীরূপে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। জীবনের বিফলতা মৃত্যুতে সফলতা আনে—কারণ, সেখানে সে নবরূপে নূতন যাত্রাপথে বাহির হয়। তাই কবি 'মৃত্যুর পরে' কবিতায় বলিতে পারিয়াছেন—

'জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থপূর্ণ করি'।
হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময়
অনিত্য চঞ্চল
সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব নূতনরূপে
হয় সে সফল।'

* * *

'ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখো তারে সর্বদৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া,
জীবনের ধূলি ধুয়ে দেখো তারে দূরে থুয়ে
সম্মুখে ধরিয়া।
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ভাগ করি' খণ্ডে খণ্ডে
মাপিয়ো না তারে।
থাক তব ক্ষুদ্র মাপ ক্ষুদ্র পুণ্য, ক্ষুদ্র পাপ
সংসারের পারে।'

* * *

'ঊর্ধ্বে ওই দেখ চেয়ে সমস্ত আকাশ ছেয়ে
অনন্তের দেশ,
সে যখন একেবারে লুকায়ে রাখিবে তারে
পাবি কি উদ্দেশ॥'

দেহের সমাপ্তি আছে কিন্তু জীবনে অসমাপ্তির বাঁশি বাজিতেছে—তাই দেশদেশান্তর পার হইয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া এই অনন্ত প্রবাহ চলিতেছে—মৃত্যুর ভিতর দিয়া নূতন রূপে, পূর্ণতার বিজয়মাল্যে শোভিত হইয়া জীবন ভবিষ্যতের দিকে চলিতেছে।

কবি গাহিলেন—

'ওগো আমার এই জীবনের শেষ
পরিপূর্ণতা

মরণ, আমার মরণ, তুমি কও
আমারে কথা।'

এই পরিপূর্ণতার লোভেই কবি বলিতে পারিলেন—

'ভয় ক'রবো না রে
বিদায় বেদনারে।
আপন সুধা দিয়ে
ভরে দেব তারে।
চোখের জলে সে যে নবীন র'বে,
ধ্যানের মণি মালায় গাঁথা হ'বে,
প'রব বুকের হারে।
নয়ন হ'তে তুমি আস্‌বে প্রাণে,
মিলবে তোমার বাণী আমার গানে।'

কারণ কবি বিশ্বাস করেন যে, 'বিচ্ছেদে তোর খণ্ড-মিলন পূর্ণ হ'বে।' কবি বলেন—

'আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার একপিঠে নূতন, একপিঠে পুরাতন। যখন উল্টে পরেন তখন দেখি শুক্‌নো পাতা, ঝরা ফুল, আবার যখন পাল্টে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী,—তখন ফাল্গুনের আম্র-মঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতন-পুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি ক'রে বেড়াচ্ছেন।'

একই বিশ্বাসের ভরেই কবি গাহিয়াছেন—

'সে বুঝি লুকিয়ে আসে বিচ্ছেদেরি রিক্তরাতে
নয়নের আড়ালে তার নিত্য জাগার আসন পাতে,
ধেয়ানের বর্ণছটায় ব্যথার রঙে
মনকে সে রয় রঙ্গিতে।'

Prof. V. Lesny তাঁহার Rabindranath-গ্রন্থে কবির মৃত্যু-সম্বন্ধীয় ধারণাকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

'The Lake School, to which Tagore is ideologically related, does not talk much of death. Wordsworth reconciles himself to death as the quiet culmination of a peaceful life. Coleridge regards death as the revealer of eternity and says in Happiness :

'Till death shall close thy tranquil eye
While faith proclaims 'thou shalt not die !'

Tagore's boyhood pattern, Shelley, for whom death is 'the imperishable change that renovates the world,' and 'the wonderful engine of necessity' is not afraid of death either, although he does call it 'a gate of dreariness and gloom.' Tennyson writes—

'I wrong the grave with fears untrue :
Shall love be blamed for want of faith ?
There must be wisdom with great Death.
The dead shall look me thro' and thro'.'

The Czech poet Brezina, who through his studies of Schopenhauer was led to the fertile well of Indian philosophy, regards death with no unfriendly eyes. For him, too, death is 'the peace of morning songs', 'a bath in the golden rain of stars,' and 'a sweet kiss on the lips.' Another Czech poet, Viktor Dyk, reconciles himself to death with the words :

'I tell you : there is no death. There's but unceasing growth.'

Another Czech poet, Wolker, in 'Dying' voices the poignant cry of a suffering genius ;

'I am not afraid of death, death is not hard,
Death is but part of life's heaviness,
What's terrible, what's cruel, is dying.'

For Tagore death is the fulfilment of life, the bride of his life, God's messenger, to whom he opens the door with a glad welcome when he comes to him ; and with whom he wishes to talk as to a friend when his radiant eye glimpses his approach. The idea of death holds no terror for him.'

অজিতকুমার বলেন যে,

'বোধ হয় জগতের কোন কবিই মৃত্যুকে জীবনের বর বলিয়া কল্পনা করেন নাই—জীবনমৃত্যুতে যে বিবাহের অতি নিবিড় সম্বন্ধ সে-কথা বলেন নাই।'

প্রেম-সাধনা

রবীন্দ্র সাহিত্যের এই তত্ত্বরস, এই প্রকৃতি বাৎসল্য, এই বিশ্বানুভূতি সমস্তই আসিয়াছে তাঁহার সৌন্দর্যবোধ হইতে। সৌন্দর্য্যবোধ আমাদিগকে আনন্দের দিকে টানে। জ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যকে যে আয়ত্ত করা হয়, তাহা হইল বুদ্ধিশক্তির আয়ত্ত, বিজ্ঞানের আয়ত্ত। সৌন্দর্যবোধ সমস্ত সত্যকে আনন্দের অধিকারে আনিয়া দেয়—তখন পূর্বে যাহা নিরর্থক ছিল, পরে তাহা অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে; পূর্বে যাহা বিরুদ্ধ ছিল, পরে তাহা সঙ্গতি লাভ করে। 'বিশ্বের সমগ্রের মধ্যে মানুষের এই সৌন্দর্য্যকে দেখার বৃত্তান্ত, জগৎকে তাহার আনন্দের দ্বারা অধিকার করিবার ইতিহাস মানুষের সাহিত্যে আপনা-আপনি রক্ষিত হইতেছে।' রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই সৌন্দর্যবোধ বা আনন্দবোধ ক্ষণকালের মাঝে চিরন্তনকে, সামান্যের মধ্যে চিরবিস্ময়কে, সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে দেখাইয়াছে। তাই সামান্য একটি সন্ধ্যাকে তিনি ভুলিতে পারেন না, ঝিকিমিকি বিকাল বেলা তাঁহার হৃদয়ে স্থান রচনা করিয়াছে, একটি বালিকা বধূর আঁকা-বাকা পথ দিয়া পুকুর ঘাটে গিয়া জল আনাকে তিনি বিশেষ রূপে মণ্ডিত করিয়াছেন, বিকশিত সর্ষের ক্ষেত হইতে গন্ধ আসিয়া তাঁহাকে মাতাল করিয়া দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'সৌন্দর্যে আমরা যেটিকে দেখি কেবল সেইটিকেই দেখি এমন নয়, তাহার যোগে আর সমস্তকেই দেখি, মধুর গান সমস্ত জলস্থল আকাশকে, অস্তিত্বমাত্রকে মর্যাদা দান করে।'

যাহাদের আমরা তুচ্ছ বলিয়া জানি, সৌন্দর্যের আবেষ্টনে তাহারা অসামান্য-রূপে সাহিত্যরচনায় প্রতিফলিত হয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যর আলোকে আমরা অতি পরিচিতকে নূতন করিয়া দেখিতে পাই, 'সুপরিচিত ও অপরিচিতকে একই বিস্ময়পূর্ণ অপূর্বতার মধ্যে গভীর করিয়া উপলব্ধি করি।' এই যে আনন্দবোধ, ইহা যখন খণ্ডতাকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বের সমগ্রের সহিত যুক্ত হইতে চাহে, তখনই ইহা বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। সাহিত্যে মানুষ বৃহৎভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাই 'মানুষ আপনার আনন্দ প্রকাশের দ্বারা সাহিত্যে কেবল আপনারই নিত্যরূপ, শ্রেষ্ঠরূপ প্রকাশ করিতেছে।'

মানুষ যাহাতে আনন্দ পায় তাহাতেই মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই পরিচয়ের বার্তা সাহিত্যে ঘোষিত হয়; রবীন্দ্র-সাহিত্যে সেই বার্তার সহিত পরিচয়

ঘটিবে। 'সমস্ত মানুষ হৃদয় দিয়া কী চাহিতেছে ও হৃদয় দিয়া কী পাইতেছে, সত্য কেমন করিয়া মানুষের কাছে মঙ্গলরূপ ও আনন্দরূপ ধরিতেছে'—অবশেষে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনা ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম করিয়া, ধরণীর স্নেহ ভালবাসা স্বীকার করিয়া নিজেকে আরও প্রসারিত ও বিস্তীর্ণ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুদ্রকে মহৎ, দুঃখকে প্রিয়, খণ্ডকে অখণ্ড, ক্ষণিককে চিরন্তন, সামান্যকে অসামান্য, সীমাকে অসীম, প্রেয়সীকে বিশ্বরূপসী, জড়কে প্রাণময় করিয়া বিচিত্রতার ছন্দ মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছে—তাঁহার সাহিত্যে সেই চিহ্নই তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ জানেন যে, সৌন্দর্যকে পুরামাত্রায় ভোগ করিতে হইলে সংযমের প্রয়োজন। তাই তিনি বলেন—

'প্রবৃত্তিকে যদি একেবারে পুরামাত্রায় জ্বলিয়া উঠিতে দিই, তবে যে-সৌন্দর্যকে কেবল রাঙাইয়া তুলিবার জন্য তাহার প্রয়োজন, তাহাকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া তবে সে ছাড়ে, ফুলকে তুলিতে গিয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া ধূলায় লুটাইয়া দেয়।······ সৌন্দর্য আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া আনিয়াছে। জগতের সঙ্গে আমাদের কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্বন্ধ না রাখিয়া আনন্দের সম্বন্ধ পাতাইয়াছে। প্রয়োজনের সম্বন্ধে আমাদের দৈন্য, আমাদের দাসত্ব, আনন্দের সম্বন্ধেই আমাদের মুক্তি।· ···সৌন্দর্য যেন আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে শোভনতার দিকে, সংযমের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে, সংযমও তেমনি আমাদের সৌন্দর্যভোগের গভীরতা বাড়াইয়া দিতেছে। স্তব্ধভাবে নিবিষ্ট হইতে না জানিলে আমরা সৌন্দর্যের মর্মস্থান হইতে রস উদ্ধার করিতে পারি না। একপরায়ণা সতী স্ত্রী-ই তো প্রেমের যথার্থ সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারে, স্বৈরিণী তো পারে না। যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীর কাছে নহে। যে লোক পেটুক, সে ভোজনের রসজ্ঞ হইতে পারে না।'

ভোগের নেশায় মাতিয়া বেড়াইলে, 'বিশ্বজগতের আলোকবসনা সতীলক্ষ্মী' আমাদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্ধান করেন। সৌন্দর্যকে পূর্ণভাবে দেখিতে হইলে তাহাকে লোভ হইতে, বাসনা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে হইবে।

উপরে আমরা যাহা আলোচনা করিলাম, তাহা হইল সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের ব্যাখ্যা এবং সেই ব্যাখ্যার সম্যক অর্থ না ধরিতে পারিলে রবীন্দ্র-কাব্যের ভিতর যে, নারীপ্রেম, ধরণী-প্রীতি, জগতের প্রতি আকর্ষণ ও স্বর্গ-সুখের প্রতি বিতৃষ্ণা আছে, তাহা যথাযথরূপে বুঝা যাইবে না। কারণ তিনি জানেন যে, নদী যতক্ষণ চলে ততক্ষণ তাহার দুই কূলের প্রয়োজন হয়, কিন্তু

যেখানে তাহার চলা শেষ হয়, সেখানে একমাত্র অকূল সমুদ্র। নদীর চলায় দিকটাতেই দ্বন্দ্ব; সমাপ্তির দিকটাতে দ্বন্দ্বের অবসান। আগুন জ্বালাইবার সময় দুই কাঠ ঘষিতে হয়, শিখা যখন জলিয়া উঠে, তখন দুই কাঠের ঘর্ষণ বন্ধ হয়। মঙ্গলের ভিতরও এই দ্বন্দ্ব আছে, এই ঘর্ষণ আছে; তাই চোখ ভুলানো সৌন্দর্যকে তিনি অস্বীকার করেন না, এই ধরণীর মায়া মোহ, ক্ষুদ্রতা, অশ্রুজল তাঁহাকে ক্রমাগত আকর্ষণ করিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সুখকর ও অসুখকর, জীবনের মঙ্গলকর ও অমঙ্গলকর, এই দুয়ের ঘর্ষণের দ্বন্দ্বে স্ফুলিঙ্গ বিক্ষেপ করাতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা পূর্ণভাবে জলিয়া উঠিয়াছে। তাই আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'আরম্ভের সহিত শেষের, প্রধানের সহিত অপ্রধানের, এক অংশের সহিত অন্যাংশের গূঢ়তর সামঞ্জস্য' দেখিতে পাই এবং 'ভাবরসে সুন্দর-অসুন্দরের কঠিন বিচ্ছেদ' নিরস্ত হয়।

এই পৃথিবীর অশ্রুজল, দারিদ্র্য, আংশিকতা তাঁহার কাছে ভাল লাগিয়াছিল। পৃথিবীর মায়াজালের বন্ধন তিনি সানন্দে স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহাকে মিথ্যা ভাবিয়া তিনি তাঁহার সাধনপথে অগ্রসর হয়েন নাই। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ ক'রে পড়ে রয়েছে, ওটাকে এমন ভালবাসি। ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা-শুদ্ধ দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোন স্বর্গ থেকে পেতুম? স্বর্গ আর কি দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতাময় এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত। আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্তহৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে ক'রে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্য তাদের রাখতে পারিনে, বাঁচাতে পারিনে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবী যতদূর সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালবাসি। এর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে মনে আছে—'আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই; আমি ভালোবাসি কিন্তু রক্ষা করতে পারিনে; আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারিনে; জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনে।' এই

জন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি ; এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর ব'লেই।' (ছিন্নপত্র)

রবীন্দ্রনাথ 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতাতে মর্ত্যের অশ্রুজলের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন—

'থাকো স্বর্গ হাস্যমুখে, করো সুধাপান
দেবগণ। স্বর্গ তোমাদেরই সুখস্থান,
মোরা পরবাসী। মর্ত্যভূমি, স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি, তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দুদণ্ডের তরে।
. . ..
স্বর্গে তব বহুক্ অমৃত,
মর্ত্যে থাক সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা, অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি'
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।'

কবি 'শোকহীন হৃদি-হীন উদাসীন' স্বর্গভূমিকে চাহেন না—স্বর্গে বিরহের ছায়া নাই, সুদীর্ঘ নিশ্বাস নাই, প্রেমবেদনায় কাহারও নয়ন-জ্যোতি ম্লান হয় না, তাই তিনি দুঃখাতুরা মলিনা জননী মর্ত্যভূমিকে ভালবাসেন। এই ধরণীর নীলাকাশ, আলো, জনপূর্ণ লোকালয়, সিন্ধুতীরে সুদীর্ঘ বালুকাতট, নীলগিরিশিরে শুভ্র হিমরেখা, তরুশ্রেণীর মাঝারে নিঃশব্দে অরুণোদয়, শূন্য নদীপারে অবনতমুখী সন্ধ্যা, সমস্তই যেন অশ্রুজলের দর্পণের তলে প্রতিবিম্বের মত ধরা দেয়।

কবি বলিলেন—

'চেয়ে তোর সন্ধ্যাশ্যাম মাতৃমুখ পানে
ভালবাসিয়াছি আমি ধূলামাটি তোর।
জন্মেছি যে মর্ত্যকোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গে আর মুক্তি খুঁজিবারে।'

পৃথিবী ও মানব, এই দুই লইয়া কবির জগৎ। এই পৃথিবীকে তাঁহার সুন্দর লাগে—

'ধন্য আমি হেরিতেছি আকাশের আলো
ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো।'

তাই—

'যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়
সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।

* * *

ভাল মন্দ সুখদুঃখ অন্ধকার আলো
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।'

এই ধরণীকে তিনি ভালবাসিয়াছেন কিন্তু সেখানে তিনি মানুষ খুঁজিয়াছেন। এই পৃথিবীর বন্ধন তিনি কামনা করিয়াছেন, কারণ সেখানে মানুষের অশ্রুজল, বিরহদুঃখ তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষকে ভালবাসিয়াছেন বলিয়াই তিনি ধরণীর দৈন্য মনের ঐশ্বর্য দিয়া মণ্ডিত করিয়াছেন। এই মানবতা রবীন্দ্র-কাব্যের আর একটি প্রধান সুর; মানবত্বের আদর্শের তিনি ঐকান্তিক সেবক।

কবি প্রার্থনা করিয়াছেন—

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই
এই সূর্যকরে, এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।'

কারণ কবি বিশ্বাস করেন যে 'মানুষের এই কোলাহলময় হাটে যেখানে কেনা-বেচার বিচিত্র লীলা চলে, এরি মধ্যে, এই মুখর কোলাহলের মধ্যেই তাঁর পূজার গীত উঠচে—এর থেকে দূরে সরে গিয়ে কখনই তাঁর উৎসব নয়।' তিনি একখানি পত্রে তাঁহার কাব্যের এই মানব-প্রীতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

'আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বারবার ডেকেছি দেবতাকে, বারবার সাড়া দিয়েছেন মানুষরূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে এবং অব্যক্তে।···মানুষ যেখানে অমর সেখানেই বাঁচতে চাই। সেই জন্যেই মোটা মোটা নামওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডীগুলোর মধ্যে আমি মানুষের সাধনা করতে পারি না। স্বাজাত্যের খুঁটি গাড়ি করে নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হ'য়ে উঠল না—কেন না অমরতা তাঁহারই মধ্যে যে-মানব সর্বলোকে। আমরা রাহুগ্রস্ত

হয়ে মরি যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই।' (রবীন্দ্র-জীবনী)

তাই 'কড়ি ও কোমল'-এ 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' হইতে আরম্ভ করিয়া 'চৈতালী'-কাব্যের মধ্য দিয়া কবি নৈবেদ্য-এর 'অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ', এই সুরে পৌছিলেন। *চৈতালী কাব্যের 'বৈরাগ্য' কবিতায় বিরাগী জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এই গৃহে কে আমারে ভুলাইয়া রাখিতেছে। দেবতা কহিলেন—'আমি।' প্রেয়সী ও শিশু-কন্যাকে দেখিয়া বিরাগী তাহাদের মায়ার ছলনা বলিয়া ভাবিতেছেন এবং তাহারা কে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। দেবতা কহিলেন—'আমি।' বিরাগী প্রভুর অন্বেষণে চলিলেন, শিশু জননীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দেবতা কহিলেন—'ফির।' বিরাগী কোন কথাই শুনিলেন না—কবি গাহিলেন—

'দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি' কহিলেন 'হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়।' ‡

* 'মানবলোকের মহিমায় চৈতালী সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের সাধক জীবনের মূলকথা 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।' আরও পরে বলেন—'মুক্তি আমার বন্ধন ডোর।' চৈতালী নৈবেদ্য-কাব্য-গ্রন্থের ভূমিকা।' 'রবীন্দ্র-জীবনী'—শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

‡ এই ভাবধারার সহিত তুলনীয়—

'O my servant, where are you seeking me? Behold, I am beside you. I am neither in the temple nor in the mosque, neither in Kaaba nor on Kailas. I am not in magnificent ceremonies nor in ascetic self-denial. If you are truly a seeker, you will see me soon; the time will come when we shall meet. Kabir says: O pilgrim, God is the breath of all breath. (Kshiti Mohan Sen : Kabir)

'The Lord God came one day to me
Like a beggar, with bag and stick.
I think He had slept in the hay;
I could smell it like the June fields
As He stood on the threshold and begged.
Now I walk the streets and look for my Lerd God.
I know He passes here with bag and stick,
I know that one day I shall meet Him.
But it will not pain me any longer
For I've no more evil deeds.
He will take me with Him. We will stand at corners
Cap in hand, the sun shining on our heads.
'We beg for love, O men of God—
—open your hearts.'

—Czech poet Wolker

(Prof. V, Lesny প্রণীত Rabindranath গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

কবি বৈরাগ্যসাধনের ভিতর দিয়া মুক্তি চাহেন না, কারণ তিনি বুঝিতেছেন যে, তিনি মানবের মাঝে মিশিয়া গিয়াছেন। তিনি এই পৃথিবীতে বাদ-প্রতিবাদ করিতে চাহেন না, কোন তত্ত্ব স্থাপন করিতে চাহেন না, শুধু মানবের মাঝে থাকিতে চাহেন—অন্তর হইতে বচন আহরণ করিয়া, সংসার ধূলিজালে গীতি-রসধারা সিঞ্চন করিয়া প্রাণমন খুলিয়া বাঁশি বাজাইতে চাহেন। তাই তিনি 'পুরস্কার' কবিতায় এই অধিকারই প্রার্থনা করিয়াছেন—দুর্গম সৃষ্টিশিখরে, অসীম-কালের মহাকন্দরে, বিশ্বনির্ঝরিণীতে যে সঙ্গীত সতত ঝরিতেছে, যত গ্রহতারা শূন্যে উদ্দেশহারা হইয়া ছুটিতেছে, সেখান হইতে কবি নিজের বাঁশরীতে গীতধারা টানিয়া লইবেন এবং সেই ধরণীর 'শ্যাম করপুটখানি' ভরিয়া দিবেন। তাই কবি বলিতেছেন—

'ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে অরণ্য-ছায়,
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।
সংসার মাঝে কয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর
তার পর ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহ সুধামাখা বাস গৃহতল
আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভ'রে,
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ 'পরে
শিশিরের মত র'বে।'

সংসারকে মধুময় করিতে চাহেন বলিয়াই কবি মানবের জয় গাহিয়াছেন, মানবের সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার সংগীত মানবের দীর্ঘশ্বাসে মহিমান্বিত হইয়াছে, তাঁহার বাঁশরীর সুরে সংসারের কল্লোলগীতি উঠিয়াছে।

কবির এই মর্ত্যজীবনের প্রতি পিপাসা মানবীয় প্রেমকে অবলম্বন করিয়া তুলিয়া তুলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। কারণ কবি জানেন—

'একাকী গায়কের নহে ত গান,
মিলিতে হবে দুইজনে
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা,
আরেকজন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ
তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বন-সভা শিহরি' কাঁপে
তবে সে মর্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি
যুগল মিলিয়াছে আগে।
যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা,
সেখানে গান নাহি জাগে।'

এই যুগল-মিলনের উত্তাপে প্রেম বিকশিত হয় এবং এই প্রেম না থাকিলে অন্তরবীণায় গান বাজে না, চোখে অন্তর্দৃষ্টি ধরা দেয় না, ধরণীর শোভা ও সৌন্দর্য অর্থপূর্ণ হয় না, মানবের অশ্রুজল সার্থক হয় না।

রবীন্দ্র-কাব্যের প্রেমতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিলে যে-বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাহা বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত সূত্র, গতি ও পরিণতি লক্ষ্য করিতে হইবে—

প্রথম, প্রেম দৈহিক ভোগক্ষুধাকে অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে; দেহের মায়ায়, ছলনায়, বন্ধনে কবি আকৃষ্ট ও আবদ্ধ। নর-নারীর ব্যাকুল বাসনা দেহের সীমায় আসিয়া মিশিল। চুম্বনের ছোঁয়াছুঁয়ি, সরমের হাসি, অঙ্গের পরশ নরনারীর ভোগময় প্রেমের ভিত্তি।

দ্বিতীয়, দেহের মিলনকে সম্পূর্ণ করিতে হইলেও শুধু বাসনার ক্ষুধাই যথেষ্ট নয়। কবি অন্তরের ভিতর দিয়া এই দেহের মিলনকে সার্থক করিতে চাহিলেন। বাসনা-কাতর বাহুর আলিঙ্গনে অন্তরেব রাজ্যে পৌছান যায় না; তাই তিনি বাসনার বোঝা দিয়া তাঁহার তরণী ডুবাইতে চাহেন নাই। কবি অন্তরের ভিতর প্রেম খুঁজিতে গেলেন। নর-নারীর প্রেমের এই দুই স্তর আমরা 'কড়ি ও কোমল'-এর যুগে পাই।

তৃতীয়, এই নর-নারীর অন্তরে প্রবেশ করিতে গিয়া কবি দেখিলেন যে, এই অন্তরে অনন্তের তরঙ্গাঘাত আসিয়া পৌঁছায় এবং বাহিরের সহিত যোগসাধন হওয়াতে কামনা বিচিত্ররূপে প্রকাশ পায়। অন্তর্লোকে আসিয়া কবি যখন এই বিশ্বের স্পন্দন অনুভব করিলেন, তখন তাঁহার প্রেম দেহের বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া অনির্দিষ্টের উদ্দেশে এবং নিরুদ্দেশের পথে উৎসর্গীকৃত হইল। তাঁহার প্রেমে সেই ব্যথা রহিল, সেই চঞ্চলতা ও আকুতি সবই থাকিয়া গেল, শুধু মূর্তি হারাইল। সেই প্রেমে সম্ভোগ আছে, মিলন আছে, কিন্তু তাহা অন্তরে, মূর্তিতে নয়। এই দেহহীন প্রেম, মূর্তিহীন মানস-সুন্দরী 'মানসী'-যুগে আসিয়া দেখা দিল।

চতুর্থ, এই প্রেম শুধু যে দেহের সীমারেখা ভুলিল, তাহা নহে—ইহা তখন অন্তরে বিকশিত হইয়া দেশ ও কালের সীমাকেও অতিক্রম করিল। তাই প্রেম অন্তরের প্রীতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্বের প্রীতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল।

পঞ্চম, নর-নারীর প্রেমের আবীরে যাঁহার অন্তর রঞ্জিত হইয়াছে, তাঁহার অন্তর বিশ্বের সহিত একযোগ অনুভব করে, গৃহের বন্ধন তখন তাঁহাকে আঘাত করে। এই প্রেম যেন মানুষের চিত্তকে জাগাইয়া তোলে এবং একজনের প্রেম সমস্ত-কালের নর-নারীর প্রেমের মর্যাদা বুঝাইয়া দেয়। প্রেমের এই মহিমা দেখিতে পাই 'চিত্রা'-যুগে।

ষষ্ঠ, মানুষের মনের একটা স্রোত আছে—সে ভিতরের দিকে যায়। এই স্রোতের সহিত যখন এই প্রেমস্রোত যুক্ত হয়, তখন তাহার চিত্তে বিশ্বের বংশীধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। নারী সেই নিত্যকালীন ও বিশ্বজনীন প্রেমের প্রতীক। এই প্রেমস্পর্শে মনে হয় যে, সেই নারীর সহিত এবং বিশ্বের সহিত মানুষের যোগ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল এই মিলনের সুরে আমরা চলিব। সেই প্রেমের আলোতে আমরা অনুভব করি যে, বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুর সহিত আমাদের যোগ আছে এবং বিশ্বচরাচরের নৃত্যতালে আমাদের গতি মিলিত হইয়াছে। তাই এই প্রেমের সাহায্যে আমরা প্রকৃতির সহিত, পরলোকের সহিত, ভূমার সহিত সংযুক্ত হইতে পারি।

সপ্তম, প্রেমের মৃত্যুঞ্জয় রূপ আছে। কুঁড়ি নিজেকে বিলয় করিয়া ফলের ভিতরে জাগিয়া ওঠে, শীতের নিরাভরণ বসন্তের ঐশ্বর্যে পরিণতি লাভ করে। এই মৃত্যুকে, অবসানকে প্রেমের দ্বারা জয় করা যায়, মিলনের এই লীলার রহস্য প্রেমের সাহায্যে প্রকাশ হইয়াছে।

মানুষের অন্তরে যা-কিছু সম্পদ, শৌর্য ও বীর্য, তপস্যা ও দীক্ষা, সবই প্রেমের অনুভূতি হইতে প্রসূত। তাই রবীন্দ্র-কাব্যের ধর্ম-সংগীত, জাতীয়-সংগীত, এবং সর্ববিধ গীতি-কবিতা প্রেম-সংগীতের অন্তর্গত। কিন্তু কবির প্রেম-সাধনার রূপ আমাদের সাহিত্যে অপূর্ব। এই প্রেমবোধ তাঁহাকে সম্মুখের দিকে টানিতেছে। এই প্রেমে বলীয়ান হইয়াই কবি বলিতে পারিয়াছেন—

'জীবনেরে কে রাখিতে পারে,
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধন-বিহীন।'

কোন জিনিসকে খুঁজিবার জন্য যখন আমরা দীপালোক জ্বালি, তখন সে যে শুধু সেই জিনিসকেই প্রকাশ করে, তাহা নহে; সেই আলো সমস্ত ঘরকে আলো করিয়া দেয়। আমাদের এই প্রেম, সে যতই ক্ষুদ্রই হউক, জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়া সেই প্রেম বিশ্বকে, ভূমানন্দকে প্রকাশ করে। এই প্রেম অর্থহীন নয়, তাই প্রণয়ীর মায়া, পৃথিবীর মোহ, সংসারের মমতা—তাহা আমাদিগকে এই স্থানে বাঁধিয়া রাখে না, নিরন্তর টানিয়া লইয়া যাইতেছে। 'নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া লইয়া চলিতেছে।' তাই কবি মানব-প্রেমের ভিতর দিয়া ভগবানের প্রেমে ব্যাপ্ত হইতে চাহিয়াছেন, এবং তাঁহার মতে ভগবানের প্রেম মানবকে অস্বীকার করিয়া পাওয়া যায় না, ইহাকে অতিক্রম করিয়া পাইতে হয়। কবি বিশ্বাস করেন—

'যাহাকে ভালবাসি কেবল তাহার মধ্যেই আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবনের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য-সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথ স্বর্গ ও দেবতাকে মর্ত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। তিনি মানবের প্রেমকে যথার্থ মূল্য দিতে চাহেন বলিয়াই 'বৈষ্ণব কবিতায়' জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, 'বৈষ্ণবের পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান, অভিসার, প্রেমলীলা

বিরহ-মিলন, বৃন্দাবনগাথা, ইহা কি শুধু দেবতার? এই গীত-সংগীতে শুধু কি ভক্ত ও দেবতা বিরাজ করেন?' তাই কবি জিজ্ঞাসা করিলেন—

'সত্য ক'রে কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান
বিরহ-তাপিত? হেরি' কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে?

* * * * **

এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি' লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হ'তে? আজি তা'র নাহি অধিকার
সে সঙ্গীতে?'

মানবের প্রেমের সেতু পার হইয়া বিশ্বের সহিত, ভূমানন্দের সহিত মিলন ঘটে। মানবের প্রেমকে এই মহিমময় দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

'আমাদেরি কুটীর-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।'

রবীন্দ্রনাথ এই মুক্তির সাধনা * তাঁহার কাব্যে প্রচার করিয়াছেন। অনেকে

---

* এই মানবতার পূজা, মানুষের ভিতর ভগবানকে পাওয়া, ইহাতে পাশ্চাত্যের প্রভাব কেহ কেহ লক্ষ্য করেন। তাঁহারা বলেন যে, মনুষ্যত্বের abstract দৃষ্টি আমাদের ছিল কিন্তু এই positive দৃষ্টিতে Comte-এর প্রত্যক্ষবাদ অনুসন্ধান করা যায়। তাই বৈষ্ণব কবিতা এবং

মনে করেন যে, এই মানবতার পূজা ভারতীয় ভাবদর্শন-প্রসূত নয়। ভারতীয় দর্শনে ত্যাগধর্ম একটি উপায়মাত্র—উহাই একমাত্র উপায় নহে। স্যার এস. রাধাকৃষ্ণন রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া এই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

'The ancient wisdom of India held renunciation to be only a factor and not the end in itself. The balanced harmony between the great affirmation and the great renunciation is empasised by the humanist thinkers of the country. Rabindranath Tagore is the representative of the humanist school. The impression that Rabindranath's views are different from those of Hinduism is due to the fact that Hinduism is indentified with a particular aspect of it—Sankara Vedanta, which, on account of historical accidents, turned out a world-negating doctrine. Rabindranath's religion is identified with the ancient wisdom of the Upanishads, the Bhagavadgita, and the theistic systems of a later day."—(*The Philosopuy of Rabindranath Tagore*)

জগতের সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ এবং সেই মোহের ভিতর দিয়াই তাঁহার মুক্তির সাধনা। তাই তিনি বলিয়াছেন—

'ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি' যোগাসন, সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ র'বে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।'

অন্যান্য কবিতায় কবি পূজার যে-আদর্শ দাঁড় করাইয়াছেন, সেই সম্বন্ধে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন বলেন—

'The suggestion would certainly be preposterous that these were direct results of Comtist Philosophy, but it is hard to dissociate one's mind from the view that these have been, unconsciously to the writers, influenced by the ideal of the Worship of Humanity. To quote Romain Rolland: 'Ideas are the natural outcome of an age so that the same ideas are born at the same time in different minds.' (Western Influence In Bengali Litereture)

জগৎ মায়া বা মরীচিকা নহে—তাহার মধ্যেই অসীমের আনন্দ পাওয়া যায় এবং প্রেমের আলোকে ইহার তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতা মিলিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে কাব্যে এই সাধনার পথেই চলিয়া আসিয়াছেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যে কবি এই কথাই প্রচার করিয়াছেন যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জাহাজে অনন্তকোটী লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে। কবি 'জীবন-স্মৃতি'-গ্রন্থে এই কথাই লিখিয়াছেন—

'প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে একদিকে যত সব পথের লোক, যত সব গ্রামের নর-নারী—তাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতন ভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে, আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘরগড়া এক অসীমের মধ্যে কোনমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।···পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটি ভূমিকা। আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সেই পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের মিলন-সাধনের পালা। এই ভাবটিকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।'

পরিণত বয়সে 'মালিনী'-নাট্যে তিনি লিখিয়াছিলেন—

'বুঝিলাম, ধর্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুনঃ ; দাতারূপে
করে দান, দীনরূপে করে তা' গ্রহণ ;—
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্বাদ ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ-অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে
করে সর্বসমর্পণ। ধর্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল,—নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে—সে মহাবন্ধন

ভ'রেছে অন্তর মোর আনন্দ বেদনে
চাহি ওই উষারুণ করুণ বদনে।
ওই ধর্ম মোর।'

প্রিয়তম ও প্রিয়তমার প্রেমকে তিনি কখনও অবহেলা করেন নাই এবং সেই প্রেমকে বাসনা দিয়া কামনা দিয়া নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাই কবি তাঁহার মানস-সুন্দরীকে বলিতেছেন—তোমার রিক্ত হস্ত আলিঙ্গনে ভরিয়া দিয়া আমার কণ্ঠে জড়াইয়া দাও, তোমার স্পর্শে সর্বদেহ কাঁপিয়া উঠে, অন্তর অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে। অর্ধেক অঞ্চল পাতিয়া আমাকে তোমার পার্শ্বে বসাও, আমাকে প্রিয় বলিয়া সম্বোধন কর। কুন্তল-আকুল মুখ আমার বক্ষে রাখিয়া হৃদয়ের কানে কানে সঙ্গোপনে অর্থহারা ভাবে-ভরা ভাষা বলিয়া যাইবে। যখন তোমার কাছে চুম্বন মাগিব, গ্রীবা বাঁকাইয়ো না, মুখ ফিরাইয়ো না, 'উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ মুখ' ওষ্ঠাধরপুটে রাখিয়ো। যদি চোখে জল আসে, দুইজনে মিলিয়া কাঁদিব; যদি মৃদু হাসি ভাসিয়া উঠে, আমার কোলে বসিয়া বাহুপাশে আমার বক্ষ বাঁধিয়া স্কন্ধে মুখ রাখিয়া অর্ধনিমীলিত চোখে নীরবে হাসিয়ো; যদি কথা মনে পড়ে, তরল আনন্দভরে নির্ঝরের মত কথা বলিয়া যাইয়ো; যদি গান ভাল লাগে, গান গাহিয়ো; যদি নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে চাহ, তাহাই থাকিয়ো।

কবি শুধু এই প্রার্থনা জানাইলেন—

'দোঁহে মোরা রব চাহি'
অপার তিমিরে, আর কোথা কিছু নাহি,
শুধু মোর করে তব করতলখানি,
শুধু অতি কাছাকাছি দুটি জনপ্রাণী
অসীম নির্জনে। বিষণ্ণ বিচ্ছেদরাশি
চরাচরে আর সব ফেলিয়াছে গ্রাসি'
শুধু এক প্রান্তে তার প্রলয়-মগন
বাকী আছে একখানি শঙ্কিত মিলন,
দুই হাত, ত্রস্ত কপোতের মতো দুটি
বক্ষ দুরুদুরু, দুই প্রাণে আছে ফুটি'
শুধু একখানি ভয়, একখানি আশা,
একখানি অশ্রুভরা নম্র ভালোবাসা॥'

এই কামনাপূর্ণ প্রেম, বাসনাপূর্ণ দেহাসক্তি রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেমকে গভীরতর করিয়াছে। যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছলতা অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের যে মায়া আনিয়াছে, 'ললাটে অধরে উরুপরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায় বাহুযুগে, সিক্তদেহে রেখায় রেখায় ঝলকে ঝলকে' যে লাবণ্য বন্দী হইয়া আছে, তাহা কবিকে কম মাতাল করে নাই। দেহের সীমায় আসিয়া ব্যাকুল বাসনা সার্থক হয়, একথা কবি জানেন। 'বাহুর নীরব আকুলতা' কবি-হৃদয়ে নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছে। তাই কবি বলিতেছেন—

'ওই তনুখানি তব আমি ভালোবাসি।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।
শিশিরেতে টলমল ঢল ঢল ফুল
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি।
চারিদিকে গুঞ্জরিছে জগৎ আকুল
সারা নিশি সারা দিন ভ্রমর পিপাসী।
ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব, বালা,
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা।'

প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হইলে কবির কাছে মনে হয় যে সমাজ-সংসার সবই মিথ্যা—'কেবল আঁখি দিয়ে, আঁখির সুধা পিয়ে, হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব'। এই মিলন, এই পরশকাতর কম্পিত দেহের ভাষা রবীন্দ্র-কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে। তাই প্রেমিকা কুন্তল খুলিয়া অঞ্চলমাঝে প্রেমিককে আবৃত করিতে চাহে। নয়ন মুদিয়া শুধু কথা শুনিয়া যাইবে—শুধু রজনীর অবসানে ক্ষণিকের তরে দুইজন দুইজনের দিকে তাকাইবে। তাই কবি বলিতেছেন—

'আঁখিতে বাঁশিতে যে-কথা ভাষিতে সে-কথা বুঝায়ে দাও।
শুধু কম্পিত সুরে আধোভাষা পুরে, কেন এসে গান গাও।'

এই ভাষা আঁখির ভাষা, বাহুবন্ধনের ভাষা, মিলন-মুদিত বক্ষের ভাষা। এই ভাষার অর্থ খুঁজিতে গিয়া রবীন্দ্র কাব্য কামনাকে, রূপজ সৌন্দর্যকে বাদ দিতে পারে নাই।

'বিদায় অভিশাপ' কবিতায় কবি কচ ও দেবযানীর এই বাসনাময় প্রেমের ছবি আঁকিয়াছেন। বৃহস্পতিপুত্র কচ দেবযানীর প্রার্থনা পূরণ করিতে না পারিলেও তাহার যে পিপাসা, কামনা ও বাসনা আছে, তাহা অস্বীকার করেন নাই। দেবযানী নারীর হৃদয় দিয়া, প্রেমের পিপাসা লইয়া কচকে বলিলেন—

'ভেবে দেখো একবার
কত উষা, কত জ্যোৎস্না, কত অন্ধকার
পুষ্পগন্ধঘন অমানিশা, এই বনে
গেছে মিশে সুখে দুঃখে তোমার জীবনে,—
তারি মাঝে হেন প্রাতঃ, হেন সন্ধ্যাবেলা,
হেন মুগ্ধরাত্রি, হেন হৃদয়ের খেলা,
হেন সুখ, হেন মুখ দেয় নাই দেখা
যাহা মনে আঁকা রবে চির চিত্ররেখা
চিররাত্রি চিরদিন? শুধু উপকার!
শোভা নহে, প্রীতি নহে, কিছু নহে আর?'

কচও সেই পিপাসায় তৃষ্ণার্ত, নারীর প্রেমে বন্দী, তবুও তাঁহাকে 'সুখহীন স্বর্গে' যাইতে হইবে। তাই দেবযানীর উত্তরে কচ স্বীকার করিলেন—

'আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখি! বহে যাহা মর্ম মাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব?

* * *

স্বর্গ আর স্বর্গ ব'লে
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধমৃগসম,
চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্বকার্য মাঝে—তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে।'

'রমণীর মন সহস্রবর্ষেরই সখা সাধনার ধন'—এই বিশ্বাস রবীন্দ্র-কাব্যে নানা-ভাবে প্রচারিত। কবি বলিয়াছেন যে, 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।' এই নারী-প্রেমের জয় রবীন্দ্র-সাহিত্যে নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—এই নারীশক্তি রমণীর বৈশিষ্ট্য এবং তাহার স্বাভাবিক পরিচয়। চিত্রাঙ্গদা নারীর সেই সহজ, স্বাভাবিক ও অমোঘ শক্তির কথা বলিতেছেন—

'এতোদিন পরে
বুঝিলাম নারী হ'য়ে পুরুষের মন
না যদি জিনিতে পারি বৃথা বিদ্যা যতো।

অবলার কোমল মৃণাল বাহুদুটি
এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল।
ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্খ ক্ষীণ-তনুলতা
পরাবলম্বিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী।
সামান্য ললনা, যার ত্রস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীর্যবল, তপস্যার
তেজ।'

এই সামান্যা ললনার নেত্রপাত অর্জন করিবার জন্য, পরিস্ফুট দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ সাধন করিয়া অর্জুনের মন হরণ করিবার জন্য চিত্রাঙ্গদা মদনের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। যে নারীর উত্তপ্ত হৃদয় সর্বাঙ্গ টুটিয়া ছুটিয়া আসিতে চাহে, যাহার গৌর-তনুতলে 'আরক্তিম আলজ্জ আভাস' প্রাণে নূতন মূর্ছনা সৃষ্টি করে, যাহার বসনখানি অঙ্গের লাবণ্যে মিলিয়া মিশিয়া থাকে, যাহার যৌবন তীব্র মদিরার মত রক্তসাথে মিশিয়া উন্মাদ করিয়া দেয়, সে-নারীই পুরুষকে জয় করিতে পারে। যে নিজে যৌবনের মদিরায় পাগল নহে, সে কি করিয়া অন্যের ভিতর মত্ততা আনিবে? কবি এই 'যৌবন-বেদনারসে উচ্ছল দিনগুলিকে' অসার্থক মনে করেন না। নারীর সৌন্দর্যে নারীর স্বাদই খুঁজিতে হইবে। যামিনীর নর্মসহচরী দিবসের কর্মসহচরী হইলে পুরুষের ভাল লাগিবে না, তাহাতে পুরুষের ধর্মবিচ্যুতি হইবে। কামিনীর ভিতর ছলাকলা মায়ামন্ত্র থাকিবে। তাই চিত্রাঙ্গদা তাঁহার যৌবনকে অর্জুনের কাছে বিসর্জন দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কহিলেন—

'আপনার যৌবনখানি
দু-দিনের বহু মূল্য ধন, সাজাইয়া
সযতনে, পথচেয়ে বসিয়া রহিব;
অবসরে আসিবে যখন, আপনার
সুধাটুকু দেহপাত্রে আকর্ণ পূরিয়া
করাইব পান, সুখস্বাদে ভ্রান্তি হ'লে
চলে যাবে কর্মের সন্ধানে।...

* * *

নারী যদি নারী হয়
শুধু, শুধু ধরণীর শোভা, শুধু আলো,
শুধু ভালোবাসা, শুধু সুমধুর ছলে

শতরূপ ভঙ্গিমায় পলকে পলকে
লুটায়ে জড়ায়ে বেঁকে বেঁধে হেসে কেঁদে
সেবায় সোহাগে ছেয়ে চেয়ে থাকে সদা,
—তবে তাঁর সার্থক জনম।'

প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা, সুমধুর ছলনা, শতরূপ ভঙ্গিমা, সরম-কাতর সোহাগ, পুণ্য-সেবা—ইহাই নারীর ধর্ম, এইখানেই নারীর সার্থকতা; এই সহজশক্তির সাহায্যেই নারীর বিজয়বার্তা ইতিহাসে প্রখ্যাত, সর্বকালে আখ্যাত, এবং সর্বলোকে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

আদর্শ মোহিনী নারীর চিত্র রবীন্দ্রনাথ 'উর্বশী' কবিতায় আঁকিয়াছেন। এই 'উর্বশী' কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখিয়াছেন*—

'নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ, উর্বশী তারই প্রতীক। সেই সৌন্দর্য আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য।......গোড়ার লাইনে আমি যার অবতারণা করেছি সে ফুলও নয়, প্রজাপতিও নয়, চাঁদও নয়, গানের সুরও নয়,—সে নিছক নারী—মাতা কন্যা বা গৃহিণী সে নয়,—যে নারী সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত, মোহিনী, সেই। মনে রাখতে হবে উর্বশীকে। সে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী নয়, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়, সে স্বর্গের নর্তকী, দেবলোকের অমৃতপানসভার সখী।

দেবতার ভোগ নারীর মাংস নিয়ে নয়, নারীর সৌন্দর্য নিয়ে। হোক না সে দেহের সৌন্দর্য, কিন্তু সেই তো সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা। সৃষ্টিতে এই রূপ-সৌন্দর্যের চরমতা মানবেরই রূপে। সেই মানবরূপের চরমতা স্বর্গীয়। উর্বশীতে সেই দেহ-সৌন্দর্য ঐকান্তিক হয়েছে, অমরাবতীর উপযুক্ত হয়েছে। সে যেন চির-যৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত—তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই। সে অবিমিশ্র মাধুর্য।

কামনার সঙ্গে লালসার পার্থক্য আছে। কামনায় দেহকে আশ্রয় করেও ভাবের প্রাধান্য, লালসায় বস্তুর প্রাধান্য।......সৌন্দর্যের যে আদর্শ নারীতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে, যদিও তা দেহ থেকে বিশ্লিষ্ট নয়, তবুও তা অনির্বচনীয়। উর্বশীতে সেই অনির্বচনীয়তা দেহধারণ করেছে, সুতরাং তা এব্‌স্ট্র্যাক্ট নয়।... উর্বশীকে মনে ক'রে যে সৌন্দর্যের কল্পনা কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে, লক্ষ্মীকে অবলম্বন করলে সে আদর্শ অন্য রকম হোতো—হয়তো তাতে শ্রেয়স্তত্ত্বের উঁচু সুর লাগ্‌ত।

* চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 'রবি-রশ্মি'।

উর্বশী উর্বশীই, তাকে যদি নীতি উপদেশের খাতিরে লক্ষ্মী ক'রে গড়তুম তা হ'লে ধিক্‌কারের যোগ্য হতুম।' *

নারীর এক মোহিনী রূপ আছে সেখানে প্রয়োজনের তাগিদ নাই কিন্তু কামনা ও বাসনার তাগিদ আছে। তাই কবি উর্বশীকে অনন্তযৌবনা, ভুবনমোহিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। 'যুগ যুগান্তর হ'তে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী'—এইখানেই রবীন্দ্রকাব্যের বিশেষ ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে। যে নারী ব্যক্তিবিশেষের, তাহারই প্রেম বিশ্বে মিলাইয়া যায় এবং চিরন্তনযুগের দাবি জানায়। তাই অজিতকুমার বলিয়াছেন—

'উর্বশী কবিতার মধ্যে সৌন্দর্যকে সমস্ত মনের সম্বন্ধের বিকার হইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সংকীর্ণ সীমা হইতে দূরে, তাহার বিশুদ্ধতায়, তাহার অখণ্ডতায় উপলব্ধি করিবার তত্ত্ব আছে।'

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের আঙিনাতে দেহকে নির্বাসন দিতে চাহেন নাই—তাহার 'বিলোল-হিল্লোল উর্বশীর' সংগীতে 'মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধচিতে।' এই চিরন্তনী নারীকে বিশ্বের মোহিনীরূপে কবি কল্পনা করিয়াছেন—'কামনা-লক্ষ্মীরূপেই উর্বশী' রসসৃষ্টি করিয়াছে, তাই 'দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে,

* কবি মোহিতলাল মজুমদার এই উর্বশী কবিতা সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত কবিতায় স্ববিরোধীভাবের সমাবেশ হইয়াছে। উর্বশীকে কামনা-লক্ষ্মীরূপে বরণ করা এবং সেই উর্বশীকে আদর্শ-সৌন্দর্যের আদি-প্রতিমারূপে কল্পনা করিবার সঙ্গতি তিনি খুঁজিয়া পান নাই। তিনি 'মোহিনী'কে শ্রেষ্ঠ ভাব-সমাধির বিঘ্নরূপিণী স্বর্গ-বেশ্যা মাত্র বলিয়া মনে করেন। রবীন্দ্র-কাব্যকে বুঝিতে হইলে নারীর এই মোহিনীরূপকে বুঝিতে হইবে। নারী যখন মোহিনী তখন সে কামনায় রঞ্জিত বটে কিন্তু প্রয়োজনের সংকীর্ণ সীমার বাহিরে। তাই সে 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ'। উর্বশীর সৌন্দর্য দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, অথচ তাহাতে অনির্বচনীয়তা আছে। উর্বশীকে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ক্ষুদ্রতা হইতে বিশ্বের যুগ-যুগান্তরের অখণ্ডতায় উপলব্ধি করা হইয়াছে। এই মোহিনী রূপ-সৌন্দর্যের আদর্শ; উর্বশী কামহীন মহিমময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মী নয়। উর্বশীতে নারীর কল্যাণমূর্তি বিকশিত হয় নাই—একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন। তাই কবির কল্পনায় কোন সঙ্গতির অভাব নাই। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন: 'পৌরাণিক উর্বশীর নাম করিয়া কবি যাহার স্তব করিয়াছেন, তাহাকে অনেক কবি অনেকদিন হইতেই স্তব করিয়া আসিতেছেন। গেটে যাহাকে বলেন—**Ewige weibliche,—The Eternal Woman.** উর্বশী-মূর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কবি তাঁহাকেই পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। আদর্শ রমণীকে দুই ভাগ করিলে এক ভাগে **The Beautiful,** আর এক ভাগে **The Good** পড়ে। উর্বশী কবিতায় প্রথমোক্তার স্তবগান।' এইরূপ সৌন্দর্যের আদর্শকে তিনি 'আবেদন' ও 'বিজয়িনী' কবিতায় আরতি করিয়াছেন।

অয়ি অসম্বৃতে।' এই স্বপ্ন-সঙ্গিনী বিশ্বের সমস্ত পুরুষের 'বক্ষোমাঝে' রক্তধারায় নূতন নাচন আনিয়া দিবে—কারণ, 'জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা, ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা।' কবি যখন কাঁদিয়া বলিলেন, 'ফিরিবে না ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরব-শশী,' তখন তিনি শুধু ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, মোহিনীর পরিপূর্ণ মূর্তি এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবুও নারীরূপের এই 'অনিন্দনীয় পূর্ণতার' সন্ধান পাইবার আশা কবির প্রাণে জাগিয়া আছে। এই কবিতাকে রূপ-সৌন্দর্যের আদর্শ হিসাবে বিচার করিতে হইবে। ইহাতে কাম আছে এবং প্রেম আছে, রূপ-সৌন্দর্য আছে এবং ভোগ-বিলাস আছে, এবং ইহাতেও প্রয়োজনাতীত অখণ্ড সৌন্দর্যের উপলব্ধি আছে। কিন্তু রূপাজীবার লালসার শ্রদ্ধাহীন ও পাশবিক প্রকাশ নাই।

যাঁহারা উর্বশী কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবাদের পরিপূর্ণ প্রকাশ বলিয়া মনে করেন, আমি তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-ধ্যানে যেমন উর্বশী আছে, তেমনি লক্ষ্মীও আছে। উর্বশী কামনা-রাজ্যের নারী, লক্ষ্মী কল্যাণী, বিশ্বের জননী। উর্বশী তপস্যা ভঙ্গ করিয়া দেয়, ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরিয়া প্রাণমন হরণ করে। লক্ষ্মী 'অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিত হাস্যে সুধায় মধুর', মানুষকে 'অশ্রুর শিশির-স্নানে স্নিগ্ধ বাসনায়, হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়' অনন্তের পূজার মন্দিরে ফিরাইয়া আনে। 'দুই নারী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলিয়াছেন – কাহাকেও উচ্চতর আসন দেন নাই। এই দুই নারী পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও বাসনার সেতু থাকার দরুণ তাহাদের মধ্যে যোগসূত্র আছে। উর্বশীর সৌন্দর্যমূর্তি এবং কল্যাণমূর্তি—এই দুই মূর্তিই বাসনার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া একজন বিশ্বের কামনারাণীরূপে দেখা দিয়াছেন এবং অন্যজন বিশ্বদেবতার দিকে মানুষকে টানিয়াছেন। সৌন্দর্য-ধ্যানের এই দুই পন্থায় তখনই সঙ্গতি ঘটে যখন আমরা দেখি যে, এই নারীর প্রেম কামের আগুনে পুড়িয়া স্বচ্ছ হইয়া বিশ্বের অখণ্ডতায় পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া বিশ্ব-দেবতার দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যে নারীর সোহাগভরা কণ্ঠের মালা বিশ্বদেবতার কণ্ঠে পৌঁছিয়াছে—ইহাতে অসঙ্গতি নাই, স্ববিরোধী ভাবের সমাবেশ নাই। একদিকে দেবতা, অপর দিকে মানব ; একদিকে পৃথিবী-প্রেম, অপরদিকে অনন্তের আহ্বান ; একদিকে মানবী-প্রেম, অন্যদিকে বিশ্বপ্রেম—এই দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে বহুদিন চলিয়াছে এবং ইহারই মিলন রবীন্দ্র-কাব্যে সাধিত হইয়াছে। তাই তিনি লিখিয়াছেন—

'খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে
কী ছিল বিধাতার মনে।'

এই মিলনের পূর্বে যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, তাহাকে অনেকে 'স্ববিরোধী' ভাব বলিয়া মনে করেন। 'কড়ি ও কোমল'-এর যুগে—যখন কবি শুধু যৌবন-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তখনও দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়। তিনি দেহের মিলনে কাতর হইয়া বলিলেন—

'প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য-মাঝে হইব মগন।'

কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বলিতেছেন—

'দাও খুলে দাও সখি ওই বাহুপাশ,
চুম্বন-মদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ।
স্বাধীন করিয়া দাও বেঁধোনা আমায়
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়।'

একথা ঠিক যে, কবি 'দোঁহার পরশ লয়ে দোঁহে ভেসে গেল, কহিল না কথা' বলিয়া নারীর সমগ্রতাকে দেখিতে চাহিয়াছেন কিন্তু ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধিকে তিনি কখনও অর্থহীন বলিয়া মনে করেন নাই। নর-নারীর ব্যক্তিগত প্রেম দেহগত হইলেও, সেই প্রেম মানবের পরশে, মানবের মাঝে বাঁচিয়া থাকিতে চায় এবং এই মানবতাকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বে মিলিত হইয়া সার্থক হইতে চায়। এই বিশ্বানুভূতিতেই কাব্যসাধনা প্রশস্ত হয়, বিশ্বদেবতার দিকে ধাবিত হইলে ধর্ম-সাধনার পথ সহজ হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনাকে ধর্মসাধনার বাঁধা নিয়ম দিয়া বিচার করিতে গেলে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রতি অবিচার করা হইবে। রবীন্দ্র-কাব্যে ধর্ম-সাধনাও আছে কিন্তু তাহা কাব্য-প্রধান, ভক্তি-প্রধান নয়; ভাব-প্রধান, বৈরাগ্য-প্রধান নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের সাধনা মিলিত হইয়াছে জীবনে, তত্ত্বে নয়; রস সৃষ্টিতে, কোন দার্শনিক মতবাদে নয়। এই দেহে আর মনে-প্রাণে

একাকার হইয়া যে অপরূপ লীলা চলিতেছে, তাহাতে কবি বিস্মিত। তাই তিনি বলিতেছেন—

'এ কী বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ ॥
তোমারি মিলন শয্যা, হে মোর রাজন্,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্রকান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহ মনে প্রাণে আমি এ কী অপরূপ ॥' (নৈবেদ্য)

চিত্রাঙ্গদা যখন তাঁহার যৌবনের লাবণ্য ও দেহের মায়ামন্ত্র দিয়া অর্জুনের মন হরণ করিলেন, তখন তিনি নিজের পরিচয় দিয়া কহিলেন—'যদি সুখে দুঃখে মোরে করো সহচরী, আমার পাইবে তবে পরিচয়।' তথাপি প্রেম-তত্ত্বে দেহতত্ত্ব একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়—একথা তিনি পরিণত বয়সে 'তপোভঙ্গ' কবিতায় স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। কবি বলিতেছেন—

'যৌবন-বেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্য মনে গিয়েছ কি ভুলি,'
হে ভোলা সন্ন্যাসী।
চঞ্চল চৈত্রের রাতে কিংশুক-মঞ্জরী সাথে
শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি।'

কিন্তু সেই উচ্ছল দিন লুপ্ত হয় নাই, ব্যর্থ হয় নাই। কবি একান্ত বিশ্বাসভরে বলিতেছেন—

'তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়-মালা পূর্ণ করে মোর ডালা
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল আনি'
মোর গান হানি ॥'

'আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্য বিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি'
দেখে মোর সাজ।
হেনকালে মধুমাসে মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য-বিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রা-পথ-তলে,
পুষ্প-মাল্য-মাঙ্গল্যের সাজি লয়ে, সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে।'

সেই দিন মহেন্দ্রের সহিত প্রেতসঙ্গীদল নাই, তাঁহার অস্থিমালা নাই, চিতাভস্ম নাই। সেই দিন 'ভালে মাখা পুষ্পরেণু'—তাই উমা কৌতুকে হাসেন এবং সেই হাস্যে 'মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনি-গানে কবির পরাণে।'

নারীর প্রেমকে এই বাসনার সাহায্যে তিনি জীবন্ত মানবের মাঝে খুঁজিয়াছিলেন। কিন্তু মানসী-যুগে সংশয় আসিয়া তাঁহার মনকে আবৃত করিয়া দিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—

'ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
* * *
বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?'

তাই কবি 'বাসনা বহ্নি নিবাইতে বলিতেছেন, তিনি অনন্ত প্রেমের দিকে ছুটিয়া গেলেন। কবি 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় বলিতেছেন—আমি তোমাকে বাসনা দিয়া দেখিয়াছিলাম, ধরণীর ছায়া ও মায়া আমাকে ভুলাইতেছে—মাধুরী-মদিরা পান করিয়া শেষে পথ হারাইয়া ফেলি। কিন্তু ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধিতে তৃপ্তি নাই, কারণ তিনি মূর্তির অতীত যে সৌন্দর্য আছে, তাহা পাইতে চাহেন। কবি প্রার্থনা জানাইতেছেন—

'যাক্ তাই যাক্, পারিনে ভাসিতে কেবলি মুরতি-স্রোতে,
লহ মোরে তুলে' আলোক-মগন মুরতি-ভুবন হতে।

আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে একাকী অসীম ভরা,
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন মিলাবে সকল ধরা।

** ** **

বাসনা-মলিন আঁখি-কলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল চিরদিন র'বে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী।'

কবি প্রেমিকার 'দেহহীন' জ্যোতি তাঁহার হৃদয়-আকাশে জাগাইয়া রাখিতে চাহেন, এবং বাসনার তীর উত্তীর্ণ হইলেই সমস্ত আসিয়া ধরা দিবে—প্রেমের এই লীলায় কবি বিশ্বাসী। কবি বলিতেছেন—

দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি মন নাহি মোর কিছুতে,
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি পিছুতে।
সবলে কারেও ধরিনে বাসনা-মুঠিতে,
দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে,
যখন ছেড়েছি উচ্চে উঠার দুরাশা
হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে নিচুতে।'

(ক্ষণিকা)

কবি জীবনের সব শূন্যতা প্রেমে ভরিয়া দিয়াছেন—বাসনার সেতু পার হইয়া তাঁহার মানসীকে কবি বলিতেছেন যে তাহাকে তিনি জনমে জনমে, যুগে যুগে ভালবাসিয়াছেন। অনাদিকাল হইতে এই প্রেমিক-যুগল ভাসিয়া চলিয়াছে এবং কোটি প্রেমিকের মাঝে তাহাদের খেলা চলিয়াছে। তাই কবি 'অনন্ত-প্রেম' কবিতায় বলিতেছেন—

'নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ নিখিল প্রাণের প্রীতি,
একটি প্রেমের মাঝারে মিশিছে সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি।'

'মদনভস্মের পূর্বে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখিতে পারিয়াছিলেন—

'এসো গো আজি অঙ্গ ধরি' সঙ্গে করি' সখারে
বন্যমালা জড়ায়ে অলকে,
এসো গোপনে মৃদু চরণে বাসরগৃহদুয়ারে
স্তিমিতশিখা প্রদীপ-আলোকে।

এসো চতুর মধুর হাসি তড়িৎসম সহসা
চকিত করো বধূরে হরষে,
নবীন করো মানবঘর ধরণী করো বিবশা
দেবতাপদ-সরস-পরশে।'

মদনভস্মের পর কবি বুঝিতে পারিলেন যে দ্যুলোকে, ভূলোকে, বকুল-তরু-পল্লবে কি কথা, কি ব্যথা মর্মরিয়া উঠিতেছে; জোৎস্নালোকে তিনি কাহার লুণ্ঠিত বসন দেখিতে পান, নীল গগনে কাহার নয়নের সহিত মিলন হইয়া যায়; সূর্য্যমুখী উর্ধ্বমুখে যেন কোন বল্লভকে স্মরণ করিতেছে, নির্ঝরিণী কোন পিপাসা বহন করিয়া লইতেছে; পুষ্পবাসে কাহার পরশ পরাণমন উল্লসিত করিয়া দিতেছে, কোমল তৃণশয়নে কবি কাহার চরণ দেখিতে পান। কবি বলিলেন—

'পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কী, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি'
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতি-বিলাপ-সঙ্গীতে
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
ফাগুনমাসে নিমেষ মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি' মূরছি' পড়ে অবনী।'

প্রেম বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে। যে নাগরী কাননপথে কলস কাঁখে লইয়া চলিতে চলিতে কুসুমশর গোপনে মারিত, যমুনাকূলে গাগরী ভাসাইয়া দিয়া আকুল নয়নে চাহিয়া থাকিত, সেই সাহসিকা যখন অনঙ্গদেবের পঞ্চশরে দগ্ধ হইল, তখন দেখিল যে কিসের যন্ত্রণা তাহার হৃদয়-বীণা-যন্ত্রে মহাপুলকে বাজিতেছে—সমস্ত বস্তুজগতে সে তাহার নিজের বেদনার সহানুভূতি খুঁজিয়া পাইল, সমস্ত বিশ্বে তাহার প্রেম ব্যাপ্ত হইল। তাই কবি নিজের প্রেম, নিজের প্রেয়সীকে বিশ্বের মাঝে খুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন—

'খোলো, খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে
গোধূলি-বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,

লয়ে তার ভীরু দীপশিখা,
দিগন্তের কোন পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা।' (পূরবী)

এই ক্ষণিকাকে কবি বিশ্বে খুঁজিয়া বাহির করিবেন, আবার কবি সবাইকে ডাকিতেছেন নিজের অন্তরে, নিজের প্রেমে। 'হৃদয়-যমুনা' কবিতাতে সেই ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। কবি বলিতেছেন যে, যদি কুম্ভ ভরিয়া লইতে চাহ, যদি কলস ভাসাইয়া জলে অপেক্ষা করিতে চাহ, যদি গাহন করিতে চাহ, যদি মরণ লভিতে চাহ, আমার অন্তরে, আমার প্রেমে তুমি সব পাইবে। কবির হৃদয়-যমুনা সবারই জন্য—যাহার যতটুকু প্রয়োজন, সে ততটুকু লইবে। আবার লক্ষকোটি প্রাণের সাথে তিনি একগতি অনুভব করিয়াছেন—বসন্তের আনন্দের মত তাঁহার প্রেমকে সর্বমানবের, বিশ্বের অখণ্ডতায় ছড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রেমের এই রহস্য—সকলের মাঝে নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া এবং সকলকে নিজের অন্তরে স্থান দেওয়া—ইহার আভাস রমণীর নিকট হইতে তিনি পাইয়াছেন। তিনি 'স্মরণ' কাব্যে 'রমণী' কবিতায় তাহাই বলিয়াছেন—

'যে-ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি,
যে-ভাবে সুন্দর তিনি সর্ব চরাচরে,
যে-ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে,
যে-ভাবে লতায় ফুল, নদীতে লহরী,
যে-ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী,
যে-ভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান
তটিনী ধরারে স্তন্য করাইছে পান,
যে-ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি' লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনাঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ-গন্ধ-গীত করিছে রচনা,
হে রমণী, ক্ষণকাল আসি' মোর পাশে
চিত্ত ভরি' দিলে সেই রহস্য আভাসে।'

তাই 'বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণ প্রেমমূর্তিখানি' প্রিয়জন মুখে পরমক্ষণে বিকাশ পায়, তাই ভালবাসায় ও পূজায় পার্থক্য নাই। এই প্রিয়জনমুখে বিশ্বপ্রিয়ার রহস্য

আছে বলিয়াই বোধ হয় কবি রমণীকে 'অর্ধেক মানবী' ও 'অর্ধেক কল্পনা' বলিয়া ভাবিয়াছেন। নারী শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহে—পুরুষ তাহার আপন অন্তর হইতে সৌন্দর্য সঞ্চার করিয়া, তাহার প্রদীপ্ত বাসনা দিয়া নারীকে গড়িয়াছে এবং তাহার উপর নূতন মহিমা অর্পণ করিয়াছে।

বৈষ্ণব-প্রভাব

রবীন্দ্র-কাব্য-সাধনায় দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়জ কাম দেহের রূপের সাহায্যে তাহার মনোজগতে প্রবেশ করে এবং প্রেমের দেহহীন জ্যোতি বাসনার মালিন্য হইতে মুক্ত হইয়া দুইটি প্রাণের প্রীতির মধ্যে ঠিকরাইয়া পড়িলে সমস্ত বিশ্বের প্রেমিকার হাসি ও কান্না শুনিতে পাওয়া যায়। এই দেহাতীত ও দেহহীন মিলন হইল সীমাহীন—ইহা দেশকালের সীমাকে অতিক্রম করিয়া অন্তরের পথে ধাবিত হয়। সংস্কৃত-কাব্যে প্রেমের এই বিশ্ব-মিলন-রস নাই। সেখানে ভোগরসের লালসা আছে, দেহ-সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দেওয়া আছে, কিন্তু সেখানে যুগল নরনারীর মধ্যে বিশ্বের প্রীতিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই। বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে এই দেহজ প্রেম আদর্শ নয়—তাঁহারা দেহজ কামের অবলম্বনে দৈহিক আকাঙ্ক্ষাকে পার হইয়া প্রীতিরসের পূর্ণ উপলব্ধির মধ্যে আত্ম-স্বরূপকে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে কান্তা প্রেম' বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন -

'ইন্দ্রিয়জ সম্ভোগ, ইন্দ্রিয়জ রতি বা শারীর আকর্ষণ ছাড়া আন্তর রতি বা আন্তর আকর্ষণের কথা সংস্কৃত-সাহিত্যের কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই আন্তরপ্রীতি মানুষের সর্বাপেক্ষা গভীরতমস্বরূপে আত্মোপলব্ধিরূপে কোথাও কোন প্রাচীন-সংস্কৃত-সাহিত্যে বর্ণিত আছে বলিয়া মনে হয় না।*

* 'It is, however, curious that with the exception perhaps of the Megha-Duta and the Gita-Govinda (with their numerous imitations), Sanskrit love-poetry usually takes the form, not of a systematic well-knit poem, but of single stanzas, standing by themselves, in which the poet delights to depict a single phase of the emotion or a single erotic situation in a complete and daintly finished form.........Sanskrit lyric poets delight in depicting the playful moods of love, its aspect of *lila*, in which even sorrow becomes a luxury. They speak to us, no doubt, in tones of unmistakable seriousness; but when they touch a deeper chord, the note of sorrow is seldom poignant but is rendered pleasing

একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতেও ভক্তিকে প্রেমরূপে তাহার মাধুর্য-রসের মধ্যে উপলব্ধি করিতে দেখা যায় না। চণ্ডীদাসের মধ্যে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষের অনুভব একটি সর্বোচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। চণ্ডীদাস বলিতেছেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' দুইটি নরনারীর মধ্যে প্রীতি কামগন্ধহীন হইয়া, আপনার মাধুর্যে মানুষের চিত্তকে প্লাবিত করে, তাহার মধ্যেই মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।·········ভারতীয় সাধনার প্রধান দৃষ্টিই এইখানে যে, একত্ব বুদ্ধির দ্বারা মানুষের অন্তরাত্মাকে পরিপ্লুত করিয়া তোলা। জ্ঞানের পথে দার্শনিকেরা এই তত্ত্ব প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নরনারীর বিশুদ্ধ প্রেমের মধ্যে আত্মরূপী ভগবান অবতীর্ণ হইয়া আমাদের আত্মপ্রকাশের চরম সার্থকতা সম্পন্ন করেন এবং ভগবৎ প্রেমের মধ্যেও নরনারী সুলভ প্রেম মধুরোজ্জ্বল মূর্তিতে পরম পদবীতে নীত হয়। ইহাই ভারতীয় প্রেম-সাধনার শেষ কথা। কিন্তু নরনারী-প্রেমের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রীতিরস মিলিত হয়, ইহা ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর সম্পূর্ণ অনুগত নহে। (রবি-দীপিতা)

ভারতীয় প্রেমচর্চ্চার প্রথম প্রকাশ দেহজ কামে ও ইন্দ্রিয়জ প্রীতিতে; দ্বিতীয় প্রকাশ দেহহীন আন্তররতিতে এবং তৃতীয় প্রকাশ আন্তররতি হইতে, যেখানে প্রেমিক ও প্রেমিকা উভয়েই গৌণ, প্রেমই মুখ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রেমসাধনা দেহজরূপকে অতিক্রম করিয়া চিত্তলোকে আসন গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার পর সেই সাধনায় ভিতর হইতে বাহিরে, যুগল হইতে বিশ্বে, আত্মকাল হইতে অনন্ত-কালের নানা উপলব্ধি রহিয়াছে। এই যে প্রেমাস্পদকে উপলব্ধি—শুধু নিজের অন্তরে নয়, সকল প্রাণের মধ্যে, তাহার জন্যই প্রেম সীমা হইতে অসীমে চলিয়া যায়,—

by a truly poetic enjoyment of its tender and pathetic implications. In this both the theory and practice of Sanskrit poetry agree.........This tendency of Sanskrit love-poetry towards a highly erotic description of feminine charms and its essentially realistic view of love as a passion explain partly the Indian conception and ideal of feminine beauty. It is remarkable that in describing feminine charms, only such details are selected as have a frank sexual appeal, but at the same time the Sanskrit poets are not blind to the spiritual beauty which transcends mere physical charms' (Dr. Sushil Kumar De প্রণীত Treatment of Love in Sanskrit Literature)

'তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরামবিহীন
চঞ্চল অনিবার,
যতদূর হেরি দিক্‌দিগন্তে তুমি-আমি একাকার।'

রবীন্দ্রনাথ তাই প্রেমাস্পদকে বলিতে পারিয়াছেন যে, তোমার প্রেমের ছায়া আমাকে অতিক্রম করিয়া জগতে ছড়াইয়া পড়ে। এই সাধনায় ব্রতী বলিয়া কবি বলিয়াছেন—

'তুমি কি করেছ মনে দেখেছ, পেয়েছ তুমি
সীমারেখা মম ?
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে আদি অন্ত শেষ করে'
পড়া পুঁথি সম ?
নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।
আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্বভূমি
এ আকাশ এ বাতাস দিতে পারো ভরে'।
আমাতেও স্থান পেত অবাধে সমস্ত তব
জীবনের আশা ?
একবার ভেবে দেখো এ পরাণে ধরিয়াছে
কত ভালবাসা॥' (মানসী)

রূপতৃষ্ণাকে আশ্রয় করিয়া আমরা নারীর দিকে আকৃষ্ট হই এবং এই আকর্ষণের সাহায্যে প্রেম প্রসার লাভ করে এবং সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া আমরা রবীন্দ্র-কাব্যে নারীকে নিজের আত্মার সহিত একাত্মভূত করি এবং তাহারই সাহচর্যে নরনারীর সহিত, প্রাণময়ী প্রকৃতির সহিত, গ্রহচন্দ্রের সহিত, বিশ্বভূমার সহিত একটা সহজ সম্বন্ধ অনুভব করি। চিত্তধারার এই সর্বত্র ও সর্বতোমুখী প্রসারণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রধান ও চরম কথা। তাই কবি বলিতে পারিয়াছেন—

'যখন তোমারে দেখি মনোমাঝখানে
মনে হয় জন্ম জন্ম আছ এ পরাণে।
মানসরূপিণী তুমি তাই দেশে দেশে
সকল সৌন্দর্য সাথে যাও মিলে মিশে।

* * * * * *

মনের অনন্ত তৃষা মরে বিশ্ব ঘুরি'
মিশায় তোমার সাথে নিখিল মাধুরী।
* * *
তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।'

প্রেম-সাধনার এই রীতি বৈষ্ণবের নহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সুমধুর রাগিণীতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। গোপী-প্রেমের আদর্শ রবীন্দ্রনাথের মনের উপর যে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা রবীন্দ্রনাথের নিজের স্বীকৃতিতেই পাওয়া যায়—

'Fortunately for me a collection of old lyrical poems composed by the poets of the Vaishnava Sect came to my hand when I was young. I became aware of some underlying idea deep in the obvious meaning of these love-poems. I felt the joy of an explorer who suddenly discovers the key of the language lying hidden in the hieroglyphs which are beautiful in themselves. I was sure that these poets were speaking about the Supreme Lover, whose touch we experince in all our relations of love—the love of nature's beauty, of animal, the child, the comrade, the beloved, the love that illuminates our consciousness of reality. They sang of a love that ever flows through numerons obstacles between Man and Man the Divine, the internal relation which has the relationship of mutual dependence for a fulfilment that needs perfect union of individuals and the Universal'. (Religion of Man)

তাই রবীন্দ্র-কাব্যের প্রেম সাধনায় বৈষ্ণব প্রভাব পরিলক্ষিত করা যায় এবং সেই প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে বৈষ্ণবদর্শনের ভিত্তির কথা জানা প্রয়োজন। এখানে বৈষ্ণব দর্শনের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।* প্রকৃতি পুরুষকে চায়, পুরুষের সহিত 'সঙ্গম' ইচ্ছা করে। বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ আর সকল নারীই প্রকৃতি। প্রেমিক ভক্ত নিজেকে প্রকৃতি করিয়া সেই একমাত্র পুরুষে কামার্পণ করেন। এই ভজনে কামকে বর্জন করিতে হয় না, শোধন করিতে হয়। প্রেমলীলায় ভগবান রমণ—ভক্ত রমণী। প্রেয়সীর প্রিয়তমের প্রতি যে ভাব,

* এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত 'প্রেমধর্ম' হইতে গৃহীত।

ভক্তের ভগবানের প্রতি সেই ভাব। তাই প্রাকৃত কামানন্দ অপ্রাকৃত ভূমানন্দে উল্লসিত হয়। ভক্তের যেমন উৎকণ্ঠা, ভগবানেরও তেমন উৎকণ্ঠা থাকে. সাধনার নানা পথ আছে। যিনি জ্ঞানমার্গী সাধক, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট ব্রহ্মরূপে—এবং যিনি যোগমার্গী সাধক, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট পরমাত্মারূপে—এবং যিনি ভক্তিমার্গী সাধক, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট ভগবানরূপে প্রকাশিত হন। কর্ম, জ্ঞান, যোগ—সকল সাধনা হইতে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ এবং ভক্তির পরিপক্ক অবস্থা প্রেম। ইহাই বৈষ্ণব দর্শনের উপদেশ।

দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়া দেখিতে গেলে পরমাত্মাকে দুইভাবে দেখা যায়—বৈদান্তিক ভাবে এবং বৈষ্ণব ভাবে। বৈদান্তিকের দৃষ্টি নির্বিশেষ ভাবে, নির্বিকল্প ভাবে এবং নির্গুণ ভাবে। বৈষ্ণবের দৃষ্টি সবিশেষ ভাবে, সবিকল্প এবং সগুণ ভাবে। বৈদান্তিকের প্রণালী—প্রণিধান, বৈষ্ণবের প্রণালী—প্রেম। প্রণিধান হইল সমাধি—যাহা বুদ্ধির অতীত, বুদ্ধির ভূমি অতিক্রম করিয়া প্রতিরোধে আরোহণ করা হয়। প্রেম হইল নিজেকে ভগবানের মধ্যে বিলয় করিয়া দেওয়া। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি (concentration, meditation and contemplation)—ইহা প্রণিধান-লভ্য, যোগ সাধ্য। বৈষ্ণবের মনে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি যথেষ্ট নয়—ইহাকে প্রেমে পরিণত করিতে হইবে। এই প্রেম-ভক্তিতে নানা রস আছে, যথা, শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি, ও মধুররতি। মধুররতি হইল ভগবানে কামার্পণ—কৃষ্ণ কান্ত, ভক্ত কান্তা। এই মধুর রসের দ্বিবিধ সংস্থান—স্বকীয়া ও পরকীয়া। স্বকীয়া—বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ ও পুরে রুক্মিণী আদি পত্নীগণ, আর পরকীয়া—বৃন্দাবনে গোপীগণ। এই পরকীয়া প্রেমই শ্রেষ্ঠ। পতি-পত্নীর মিলন স্বকীয়া—গোপীপ্রেম পরকীয়া। ভগবান স্বকীয়ার পতি ও পরকীয়ার উপপতি। যে কামিনী অন্তরঙ্গ অনুরাগবশে ইহলোক-পরলোক উপেক্ষা করিয়া পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করে, যে লৌকিক ধর্মের অপেক্ষা রাখে না—সেই পরকীয়া। পরকীয়াতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, কারণ, যেখানে বহু বারণ, যেখানে বাধ্য হইয়া প্রচ্ছন্ন কাম-সেবা, যেখানে নায়কের পক্ষে নায়িকা এবং নায়িকার পক্ষে নায়ক দুর্লভ, সেইখানেই কামের পরাকাষ্ঠা। স্বকীয়ার প্রেমে শুধু মিলন, বিরহ নাই। গোপী-প্রেমের মর্মকথা হইল এই যে, গোপীগণ দেহ-গেহ বিসর্জন দিয়া, লোকধর্ম-বেদধর্ম উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রাণমন সমর্পণ করেন; সমস্ত গৃহকার্যের ভিতর অনুরক্ত চিত্তে অশ্রুকণ্ঠী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম গান করিতে থাকিবেন। তাহাদের তনুমন শ্রীকৃষ্ণদ্বারা পূর্ণ—সিন্ধু আসিয়া যেন ঘটে প্রবেশ

করিয়াছে—তাই ঘট সামলাইয়া রাখা যায় না। রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ড-দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিতা হইয়া গোপবধূরা চরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ব্রজ-গোপীর সাধনা প্রেমভক্তিযোগদ্বারা কৃষ্ণে একাত্মতা প্রাপ্তি এবং এই সাধনার সোপান, কৃষ্ণের অনন্ত সৌন্দর্যে মুগ্ধা হইয়া তাঁহার পদমূলে সর্বস্ব সমর্পণ করা। রাধা হইল প্রধানা গোপী—রাধিকার প্রেম-নিবেদন বৈষ্ণব সাহিত্যে অপূর্ব। রাধা কৃষ্ণ-লালসায় অধীর হইলেন—দিন দিন তাহার সঙ্গম-উৎকণ্ঠা প্রবল হইতে প্রবলতর হইল। রাধা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনিলেন—তখন শ্রীরাধা অভিসারে চলিলেন। মোহিনী উমা যোগিনী সাজিয়া কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেবকে পাইয়াছিলেন। প্রিয়তমের আহ্বানে রাধার এই অভিযান নিজেকে কষ্ট দিয়া নয়—নিজেকে ত্যাগ করিয়া—নিজের কুল, মান, লাজ, ভয়। সেই ঝঞ্ঝাবাত সহিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাধা একাকী দুর্গম, নির্জন ও অন্ধকার পথ পার হইয়া কুঞ্জদ্বারে উপনীত হইলেন—রাধাকৃষ্ণের সঙ্গম ঘটিল। রাধা আকণ্ঠ ভরিয়া সেই মিলন সুধা পান করিলেন। কিন্তু ইহাই প্রেম-অভিযানের শেষ নহে। এই মিলনের পর মনের দুর্যোগ ও মাথুরের দুর্ভোগ। মান, লজ্জা, ভয়—ইহা ত্যাগ না করিতে পারিলে সত্যিকারের মিলন হয় না। তাই তাঁহার মান ত্যাগ করিতে হইল,—দেহাবরণের লজ্জা, লোক-লজ্জা ত্যাগ করিতে হইল লোকভয় ছাড়িতে হইল। কিন্তু এই ত্যাগের পূর্বে বিরহের আগুনে পুড়িতে—অর্থাৎ মানের পর মাথুর, সঙ্গমের পর বিরহ। এই বিরহ যাতনা পার হইয়া কৃষ্ণ-রাধার পুনর্মিলন হইল—এই মহামিলনে রাধা কৃষ্ণের সহিত একত্রীভূত হইলেন। এই মিলন পার্বতীর মিলন অপেক্ষাও নিবিড়তর। নদী যেমন নাম-রূপ হারাইয়া সমুদ্রের সহিত মিশ্রিত হয়—এই মহামিলনেও সেই মিশ্রণ। এই মহামিলনের পূর্বে কত আক্ষেপ-বিক্ষেপ, কত উচ্ছ্বাস-নিশ্বাস, কত হা-হুতাশ, কত সন্ত্রাস, বিশ্বাস, আশ্বাস, কিন্তু পরিণামে কত স্বস্তি, কত শান্তি, কত আনন্দ। এই মহামিলনে বিরহ নাই। বেদান্তের অভিমত, প্রণিধানের ফলে 'ব্রহ্মসাযুজ্য' ; বৈষ্ণবের অভিমত, প্রেমের ফলে মহামিলন।

যে-ধর্ম ও দর্শনের প্রেরণায় বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহার সহিত যথাযথ পরিচয় না থাকিলে বৈষ্ণবের প্রেমতত্ত্ব আমাদিগের নিকট সুস্পষ্ট হইবে না এবং তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট না হইলে রবীন্দ্র কাব্যের প্রেমতত্ত্বে বৈষ্ণব-প্রভাব কতখানি বিস্তৃত, তাহা ধরা যাইবে না। তাই বৈষ্ণব পদাবলী যাহা অবলম্বন করিয়া সাহিত্যে এতবড় আসন অধিকার করিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে

পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছি। ইহা আলোচনা করিলে আমরা দেখি যে, বৈষ্ণব সাহিত্যে নায়ক শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ, রবীন্দ্র-কাব্যের নায়ক বিশ্বপ্রণয়ী। রাধা-প্রেম ও গোপী-প্রেম একমাত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মহামিলনে সার্থক হইয়াছে; রবীন্দ্র-কাব্যের প্রেয়সী প্রিয়তমকে খুঁজিয়াছে সর্বমানবের মধ্যে, সমস্ত বিশ্বের মাঝে। রবীন্দ্র সাহিত্যে অন্বেষণ-ই প্রধান, তাই তাঁহার সাধনা কাব্য-প্রধান; মহামিলনের শান্তিতে তাঁহার কাব্য-সাধনা শান্ত হইতে পারে নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যে তন্ময়তা আছে, কারণ দয়িতকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে না, শুধু মিলনের জন্য ছুটিতে হইবে। রবীন্দ্র-কাব্যে বিস্তৃতি, ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য আছে —রবীন্দ্রনাথ অন্বেষণের অভিযানে বাহির হইয়াছেন; তাঁহার প্রেয়সী চিত্তলোকে আরোহণ করিয়া বিশ্বলোক লুণ্ঠন করিবার জন্য বাহির হইয়াছেন, তাই রবীন্দ্র-নাথের ব্যক্তিগত প্রেমের সহিত বিশ্বের নিবিড় সংযোগ আছে। প্রকৃতির ভিতর যে আদান-প্রদান চলিতেছে, পদকর্তাগণ তাহার সহিত প্রণয়ীর বেদনাকে অঙ্গীভূত করেন নাই। রবীন্দ্র কাব্যে নিখিলের প্রণয়-রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত যে নর-নারীর আন্তর যোগ আছে, তাহা বৈষ্ণব কবিগণ অনুসন্ধান করেন নাই। গোপীপ্রেমে তন্ময়তা আছে, রহস্য নাই; দেহমন বিকাইয়া বিলয়ের ইচ্ছা আছে কিন্তু সেই মিলনে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিয়া উপলব্ধি করিবার আদর্শ নাই। রবীন্দ্রনাথ রহস্যময়ীর পূজারী—তাঁহার জীবন-দেবতা বা পরাণবঁধু তাঁহাকে ধরা দেয় না; তাঁহার ক্ষণে ক্ষণে মিলন, ক্ষণে ক্ষণে বিরহ, এবং তিনি বিরহের মধ্যেও মিলন খুঁজিয়া বেড়ান। রাধার প্রেমলীলায় পূর্বরাগ, মিলন ও বিরহ আছে। রবীন্দ্রকাব্যেও সেই মধুর-রস আছে, সেখানেও মিলন-বিরহের খেলা আছে, তাঁহারও অনুভূতির নিবিড়তা আছে, যদিও কোন বিশেষ নায়ক-নায়িকা সেই কাব্যে স্থান পায় নাই। বৈষ্ণব-কাব্যে দয়িতকে পাইতে হইবেই—ইহার আশ্রয়ে প্রেমতত্ত্ব পরিপুষ্ট। রবীন্দ্র-কাব্যে সেই পাওয়ার চেয়ে খোঁজার তাগিদ বেশি। বৈষ্ণব দর্শনকে বাদ দিয়া বৈষ্ণবের প্রেমতত্ত্ব বুঝা যায় না কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের প্রেমতত্ত্ব বুঝিতে হইলে কোন বিশিষ্ট সাধনা বা দর্শনের প্রয়োজন হয় না। গোপীপ্রেমে যে-একাগ্রতা ও একনিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। রবীন্দ্র-কাব্যের প্রেম-সাধনায় মাঝে মাঝে সংশয় আসিয়াছে। রাধার অভিমান আছে কিন্তু সেই অভিমান সংশয়-প্রসূত নয়। বৈষ্ণব-কাব্যের মত রবীন্দ্র-কাব্যে দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে, বল্লভের সহিত মিলন আছে এবং

বিরহ আছে। রবীন্দ্র-কাব্যের প্রেমতত্ত্বও পরকীয়া-প্রেমে পুষ্ট, তাই মিলনই শেষ কথা নয়; বিরহের ভিতর দিয়া, দুঃখের ভিতর দিয়া মিলনকে সার্থক করিবার চেষ্টা আছে।

বৈষ্ণব কাব্যে যে দেহের বর্ণনা আছে তাহার সার্থকতা হইল এইখানে যে, কৃষ্ণের দেহের প্রত্যেক অণু গোপীগণকে বিমুগ্ধ করিয়াছে এবং প্রধানা গোপী রাধা তাঁহার দেহের তরঙ্গ দিয়া, যৌবনের মাদকতা দিয়া, অঙ্গের ভঙ্গিমা দিয়া প্রিয়তমকে চঞ্চল এবং নিজেকে ভোগ্যা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'নীলাম্বরে কিবা কাজ তীরে ফেলে এস আজ
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।'

* * *

'ফেলগো বসন ফেল—ঘুচাও অঞ্চল।
পর শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ
সুর বালিকার বেশ কিরণ বসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি—বিকচ কমল,
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে দাঁড়াও একেলা।'

কবীর লিখিয়াছেন—

'যো সুখ চাহে তো লজ্জা ত্যাগে
প্রিয়সে হিলমিল লাগে।'

বৈষ্ণব দর্শনে প্রিয়তমের সহিত মিলিতে হইলে প্রেমিকা রমণীকে নগ্ন হইতে হয়, গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—

'কণ্ঠের ভূষণ কলঙ্কের হার, নাসার ভূষণ গন্ধ।
পীরিতি ভূষণ প্রতি তনুমন, কহয়ে দাস গোবিন্দ।'

রবীন্দ্র-কাব্যে ধর্ম-সংগীতেও প্রেমের সুর আছে। তিনি ভগবানকে প্রেমে, আনন্দে, সেবায়, বরণ করিয়াছেন, ভালবাসিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন ঋষিগণেরও এই দৃষ্টি। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'God with us is not a distant God; He belongs to our homes, as well as to our temples. We feel His nearness to us in all the human relationship of love and affection,

and in our festivities. He is the chief guest whom we honour. In seasons of flowers and fruits, in the coming of the rain, in the fulness of the autumn, we see the hem of His mantle and hear His footsteps. We worship Him in all the true objects of our worship and love Him wherever our love is true. In the woman who is good we feel Him, in the man who is true we know Him, in our children He is born again and again, the Eternal Child. Therefore, religious songs are our love songs.'

(Personality)

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালী-কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়—এখানে পূর্বরাগ, মিলন ও বিরহ আছে। কিন্তু সাধারণতঃ রবীন্দ্র-কাব্যের বিরহ দৈহিক মিলনের পরে এবং মহামিলনের পূর্বাবস্থা নহে। রবীন্দ্র-কাব্যে প্রিয়তমের জন্য আকুতি প্রথম আসে যৌবনের আকর্ষণে, সেই আকর্ষণ চিত্তলোকে প্রবেশ করিয়া প্রিয়তমকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে এবং সেই ব্যাকুলতা বিশ্বদেবতার পানে ছুটিয়া যায় সর্বমানবের মধ্য দিয়া, সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতর দিয়া এবং তারপর সমস্ত বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব প্রেমিকা প্রিয়তমের বাঁশি শুনিয়া ছুটিয়া যায়, প্রিয়তমের সহিত সঙ্গম লাভ করিয়া আকণ্ঠ সুধাপান করে এবং পরে বিরহের ভিতর দিয়া মহামিলনে পৌছায়। তাই বৈষ্ণব সাহিত্যে পূর্বরাগের ব্যথা ও বিরহের বেদনা দুই বিভিন্ন পর্যায়ের রস ; রবীন্দ্র-কাব্যে এই দুই স্তরের সীমাচিহ্ন সব সময় স্পষ্ট থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

'কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো,
বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো।
রয়েছে দীপ না আছে শিখা
এই কি ভালে ছিল রে লিখা,
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো।'

বৈষ্ণব মহাজনেরা বিরহের দশ দশা বলিয়াছেন, যথা, চিন্তা, উন্নিদ্রতা, উদ্বেগ, বিশীর্ণতা, মলিনতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্ছা ও মৃত্যু। মৃত্যুই বিরহের চরম দশা। রবীন্দ্রনাথও সেই মৃত্যুকে বিরহজ্বালা হইতে শ্রেয়ঃ ভাবিতেছেন। এই বিরহানলে রাধা জ্বলিয়াছিলেন—

'এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে ॥' (চণ্ডীদাস)

শ্রীরাধা বিরহের দশায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

'নহে শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম জপয়ি
ছার তনু করব বিনাশ।'

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এই যে, তিনি বিরহানলে প্রদীপ জ্বালিয়া মিলন খুঁজিয়া লইবেন, কিন্তু রাধার বিরহদশা কৃষ্ণের সহিত একত্রীভূত হইবার জন্য—এই বিরহানল সেই মহামিলনের আভাস এবং সেই মিলন না হইলে এই বিরহ, এই কুল, মান, লজ্জা-ত্যাগ অর্থহীন। রবীন্দ্র-কাব্যে রাধার তন্ময়তা, একাগ্রতা ও একনিষ্ঠার অভাব থাকিলেও কবির অনুভূতি আপেক্ষিক বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে—বিরহানলে প্রদীপ জ্বলিয়া সম্পূর্ণভাবে দাহিত হইলেও তিনি ব্যর্থ নহেন, কারণ বিরহের মধ্যে মিলন, দুঃখের ভিতর আনন্দ, মরণের ভিতর জীবনকে উপলব্ধি করিবার সূক্ষ্মানুভূতি তাঁহার আছে। এই বিচিত্রতার খরশাণ পথে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা ঋজুগতিতে অগ্রসর হইয়াছে; কোন বিশিষ্ট সাধনপন্থাকে আশ্রয় করিয়া আধ্যাত্মিক লোকে আরোহণ করিতে তিনি চেষ্টা করেন নাই। ফলে, অনুভূতির নিবিড়তা, বিস্তৃতি ও ঐশ্বর্য রবীন্দ্র-কাব্যের বিশেষ সম্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—বৈষ্ণব সাহিত্য বিশিষ্ট তত্ত্বে পরিপুষ্ট বলিয়া যতখানি তন্ময়তা আনিতে পারিয়াছে ততখানি সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপ্তি সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তাহাতে রসের অভাব ঘটে নাই কিন্তু ঐশ্বর্যের অভাব ঘটিয়াছে; প্রেমের অভাব ঘটে নাই কিন্তু বিচিত্রতার অভাব ঘটিয়াছে।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চলবে না,
এবার হৃদয় মাঝে লুকিয়ে বোসো
কেউ জানবে না কেউ বলবে না।'

ইহাতেও বৈষ্ণবিক ঢঙ আছে, কিন্তু বৈষ্ণব দর্শন নাই। ইহাতে মধুর রসের সাহায্যে প্রিয়ার উৎকণ্ঠা লইয়া ভগবানকে ভাবিবার, খুঁজিবার এবং পাইবার চেষ্টা আছে, কিন্তু বৈষ্ণব প্রেমিকার মিলন এই 'লুকিয়ে' 'হৃদয়-মাঝে' স্থান রচনা করিয়া নহে; সেই রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন হইল মিশ্রণ—

'তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম তরঙ্গ।'

রবীন্দ্র-কাব্যে আমরা যেখানে অঙ্গে অঙ্গে মিলন দেখিয়াছি সেই মিলন রাধা-কৃষ্ণের মহামিলন নয়, 'কালিন্দীর কোকিল-কুজিত কেলিকুঞ্জকুটীরে'র মিলন যখন 'নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।' এই মিলন তখনও 'মানের দুর্যোগ ও মাথুরের দুর্ভোগ' পার হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ হিয়ার মিলনকে এবং বিশ্বের সহিত যোগকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন—

'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়ক বনে নয় বিজনে,
নয়ক আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।'

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব সাহিত্যের মধুর রসদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন যথেষ্ট কিন্তু তাঁহার মিলনের বা মিশ্রণের বা একাত্মীভূত হইবার চেষ্টা নাই। কারণ তিনি দেহের মিলন দিয়া হিয়ার বাঁধন বাঁধিবেন, এবং হিয়ার মিলনসূত্রে বিশ্বের সঙ্গে বন্ধন দৃঢ় হইবে। তাঁহার বিশ্বদেবতা ব্যক্তি-বিশেষ নহে। তাই রবীন্দ্র-কাব্যে এত বিস্তৃতি, অথচ এত নিবিড়তা। রবীন্দ্র-কাব্যে বৈষ্ণবিক স্থর ও গমক আছে কিন্তু সেই সুরেই রবীন্দ্রসংগীত ভরপুর নয়। বৈষ্ণব সাহিত্যের মধুর ভাব হইতে তিনি নিজেকে বাঁচাইতে চেষ্টা করেন নাই। তাই তিনি ভগবানকে বলিবার অধিকার পাইয়াছেন—

'সখা তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায়
তবু কি প্রাণ গলবে না ?'

** ** **

'মুখ ফিরিয়ে রব তোমার পানে
এই ইচ্ছাটি সফল কর প্রাণে।'

** ** **

'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।'

ভগবানের ক্ষণিক অস্পষ্ট পরশন পাইয়া কবি নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন—'সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগিনি।' এই যে প্রিয়ার মাধুর্য লইয়া ভগবানকে ডাকা, এইখানে বৈষ্ণব-প্রভাব অনুভব করা যায়।

কিন্তু কোন বৈষ্ণব রবীন্দ্রনাথের সুরে গাহিবেন না—

'প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে।
দেখা নাই পাই
পথ চাব,
সে ও মনে ভালো লাগে।'

বিরহের ব্যথার ভিতর রবীন্দ্রনাথ আনন্দের স্বাদ পাইয়াছেন—তাই কবির 'পথ চাওয়াতেই আনন্দ'। বৈষ্ণব সাহিত্যের বিরহে এই পথ-চাওয়ার আনন্দ নাই। রাধার প্রাণনাথ ছাড়া গতি নাই, তাই বিরহানলে তিনি পুড়িতে লাগিলেন—'অগ্নি যথা নিজধাম দেখাইয়া অবিরাম পতঙ্গেরে পুড়াইয়া মারে।' রাধার তনু কানু-প্রেম-বিষে জর্জরিত—তাই বিরহের কোন অবস্থাই তাঁহার ভাল লাগার অবস্থা নয়। রবীন্দ্র-কাব্যের বিরহের রূপ ও বৈষ্ণব সাহিত্যের বিরহের রূপ সম্পূর্ণ আলাদা। তবুও রবীন্দ্র-কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। গীতাঞ্জলি কাব্যে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় বলিতেছেন—তোমার পথের ধূলায় আমার মাথা নত করিয়া দাও, সকল অহংকার ডুবাও চোখের জলে। সেই কাব্যেই তিনি বলিতেছেন—

'নিভৃত প্রাণের দেবতা
যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত সেথায় খোলো দ্বার,
আজ লবো তাঁর দেখা।'

এ যেন মানিনী রাধার মান-ত্যাগ। সাধন-পথে ভক্তকে দীনাতিদীন হইতে হইবে, তাই রবীন্দ্রনাথ সকল অহংকার ডুবাইয়া তাঁহার প্রিয়তমের পদপ্রান্তে মাথা নত করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে অবশ্য রাধার মান শেষ হইলে 'কলহান্তরিতা'র (reconciliation) প্রেম-বৈচিত্র্য—তারপর মাথুর, অর্থাৎ বিরহ। রবীন্দ্র-কাব্যে বৈষ্ণব সাহিত্যের এত স্তরবিভাগ আশা করা যায় না। তবুও ভক্ত অভিমান বিসর্জন দিয়া রবীন্দ্র-কাব্যে বলিতে পারিলেন—

'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম না
শুক্‌নো ধুলো যত ?
কে জানিত আসবে তুমি গো
অনাহূতের মত ?'

কারণ পথের ডাকে সাড়া দিবার ভক্তের ইচ্ছা ছিল না,—ঐ বেদনা ভক্তের হৃদয়ে গভীর ক্ষতদাগ দিয়া গিয়াছে। এ যেন বৈষ্ণবের সেই উৎকণ্ঠা—

'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলা বাটে
আঙ্গিনার পরে তিতিছে বঁধুয়া
দেখে যে পরাণ ফাটে।'

বৈষ্ণব হৃদয়ের নিবিড়তা রবীন্দ্র-কাব্যে উপলব্ধি করা যায়—

'না চাহিলে তোমার মুখপানে
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে,
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যতো
ফিরে কূলহারা সাগরে।'

এই যে প্রিয়তমকে একদণ্ড না দেখিলে বিরাম হারাইতে হয়, ইহা রাধা-ভাবের লক্ষণ—

'আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে।
সুধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো—আরো কর দান।'

** ** **

'বিনা-প্রয়োজনের ডাকে
ডাকবো তোমার নাম
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পূরবে মনস্কাম।'

** ** **

'ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজলো বুকে—

তোমার প্রেমে আঘাত আছে
নাইকো অবহেলা।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ভক্তের মত তাঁহার প্রিয়তমের নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। তিনি 'গীতিমাল্য'-এর একটি কবিতায় বলিতেছেন—আমার রক্তধারার ছন্দে দেহবীণার তারে তোমার নামের ঝংকার বাজিয়া উঠুক, আমার সব আকাঙ্ক্ষায়, আশায়, তোমার নামটি শিখার মত জ্বলুক এবং সকল ভালবাসায় তোমার নামটি লেখা থাকুক। কারণ—

'সকল কাজের শেষে তোমার
নামটি উঠুক ফ'লে,
রাখবো কেঁদে হেসে তোমার
নামটি বুকে কোলে।
জীবনপদ্মে সঙ্গোপনে
রবে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণক্ষণে
তোমারি নাম বঁধু।'

রাধা যখন বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হইয়া কদম্বের মূলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া অধীর হইলেন, সেই অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া চণ্ডীদাস বলিলেন—

'পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল
তাহা নেহারিতে আমি হই যে বিকল।'

রবীন্দ্রনাথও সেই গোপীভক্তের মত বলিতেছেন—

'আমার দু'টি মুগ্ধ নয়ন
নিদ্রা ভুলেচে।
আজি আমার হৃদয়-দোলায়
কেগো দুলিছে।
দুলিয়ে দিলো সুখের রাশি
লুকিয়ে ছিলো যতেক হাসি,
দুলিয়ে দিলো জনমভরা
ব্যথা-অতলা।'

রাধা বাঁশি শুনিলেন 'বনমাঝে কি মনমাঝে।' রবীন্দ্রনাথ বাঁশি শুনিলেন মনমাঝে। বিচ্ছেদের বেদনার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ যে-মিলনের পাত্রটি পাইলেন

তাহার সুরই 'গীতালি'-কাব্যে ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি বলিতে পারিলেন —

'দুঃখের বরষায়
চক্ষের জল যেই
নামলো
বক্ষের দরজায়
বন্ধুর রথ সেই
থাম্‌লো।
* * * *
এতদিনে জানলেম
যে কাঁদন কাঁদ্‌লেম
সে কাহার জন্য।
ধন্য এ জাগরণ
ধন্য এ ক্রন্দন,
ধন্য রে ধন্য।'

এই 'পরশের তিয়াষ' মিটিল, মিলনের পাত্রটি পূর্ণ হইল, তাহাতে কবির 'জাগরণ' হইল। কবি এই জাগরণকেই চাহিয়াছিলেন—ইহা মহামিলনের বিলয়-প্রাপ্তির অভিলাষ নহে। কবি জানেন, আঘাত করি নিলে জিনে, কাড়িল মন দিনে দিনে।

কৃষ্ণ-লালসায় রাধা অধীর হইলেন—তখন

'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়।'

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—

'আমি যে আর সইতে পারিনে।
সুরে বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারিনে।'

* * * *

'কোন্ গুণী আজ উদাস প্রাতে
মীড় দিয়েছে কোন বীণাতে গো
ঘরে যে আর রইতে পারিনে।'

* * * *

'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।'

রবীন্দ্রনাথের মিলনরীতি হইল এইরূপ—

'আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক না হারা।
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ,
ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ,
তোমার রূপে মরুক ডুবে
আমার দু'টি আঁখিতারা।'

* * * *

'আমার এই
দেহখানি
তুলে ধরো,
তোমার ঐ
দেবালয়ের
প্রদীপ করো,
নিশিদিন
আলোক-শিখা
জ্বলুক গানে।'

অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী 'কাব্যে রবীন্দ্রনাথ'-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং বৈষ্ণব কবিতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্মকথা এই :

'বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হইয়াছে বৈষ্ণব লীলা-তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া। সুতরাং লীলাতত্ত্ব এখানে প্রতিষ্ঠিত সত্য। ব্যক্তিগত জীবনের সাধনার ভিতর দিয়াই হউক অথবা পূর্ববর্তী ভক্ত সাধকগণের প্রবর্তিত পথে চলিয়াই হউক ইহারা

ভগবানের লীলাতত্ত্বটিকে মনের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার পর পদাবলী রচনা করিতে বসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট সসীম এবং অসীমের এই লীলাতত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত সত্য নয়—ইহা তাঁহার জীবন পথে চলিতে চলিতে ধীরে ধীরে, একটু একটু করিয়া সঞ্চয় করা সত্য। তাই ইহা কোথাও কোন সুনির্দিষ্ট রূপ লইতে পারে নাই—অথবা কবি ইহাকে কোন সুনির্দিষ্ট রূপ দিতে সাহস করেন নাই। তাঁহার নিকট এই লীলারহস্য অনন্ত, বিচিত্র। বৈষ্ণব কবিরা ভগবানকে একেবারে অন্তরঙ্গভাবে পাইতে চাহিয়াছেন এবং সেই জন্য তাঁহার ঐশ্বর্যের দিকে, তাঁহার মহিমার দিকে আদৌ নজর দেন নাই। রবীন্দ্রনাথ চান ভগবান তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য লইয়াই এই ধূলার পৃথিবীতে নামিয়া আসুন। বৈষ্ণব কবিরা আমাদের অতিবড় সুনির্দিষ্ট পার্থিব সম্পর্কগুলির মধ্যে ভগবানকে সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন ; কেননা যাহাদের জন্য তাঁহারা এই সকল বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের চারিদিকে বৈষ্ণব লীলাতত্ত্বের একটি আবহাওয়া পূর্ব হইতে প্রস্তুত ছিল, যাহার মধ্যে বাস করিয়া এই সকল পাঠক তাহাদের ভগবানটিকে এই সকল অতিবড় সুনির্দিষ্ট পার্থিব সম্পর্ক-বন্ধনের ভিতর হইতেও অনায়াসে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত ও লীলাতত্ত্বের ভিত্তির উপর তাঁহার কবিতাকে দাঁড় করান নাই।'

কাজী আবদুল ওদুদ তাঁহার 'রবীন্দ্র-কাব্যপাঠ্য'-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

'মোটের উপর বৈষ্ণবের প্রেমের ধাত রবীন্দ্রনাথের নয়। বৈষ্ণব মূর্তিবাদী, রাধাকৃষ্ণ এক সুন্দর রসঘন বিগ্রহ ব'লেই বৈষ্ণব তা অবলম্বন করে আনন্দ পান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রহস্যময়ের পূজারী। সে রহস্যময় তাঁর কাছে 'জলে স্থলে' 'নানা আকারে' ধরা দেন। কবি নিজের গাঢ় অনুভূতিতে কখনো তাঁর চরণ ছুঁতে পারছেন। কখনো মৃত্যুর বেশে তিনি কবির মনোনেত্রে আবির্ভূত হচ্ছেন। এই জন্যই সুফীর আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গেও তাঁর কিছু অমিল রয়েছে, সুফীও পীর মানেন, শাস্ত্রের সত্যকে জীবনে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের সাধনার নূতনত্ব বেশি ক'রে চোখে পড়ে।·· বৈষ্ণবের 'সহজ ভক্তি'র সুর রবীন্দ্রনাথ পান না বলে অনেককে দুঃখ করতে দেখেছি। তাঁরা ভুলে যান, মানুষের জীবন বিচিত্র, জীবনের সার্থকতাও বিচিত্র।'

ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্ত এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'তত্ত্বের দিক দিয়া শ্রীকৃষ্ণের বহুবল্লভতা ও শ্রীরাধিকার এই ব্যাপারে সৌজন্যের যে মূল্যই থাক না কেন, ইহার অভিব্যক্তিতে শ্রেষ্ঠ কাব্য সৃষ্টি হয়

নাই।······বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্যাপকতার যে অভাব দেখিতে পাই, তাহার একমাত্র কারণ, শ্রীরাধার সহিত বিশ্বপ্রকৃতির সংযোগ নাই। শ্রীরাধা একজন নায়িকা মাত্র। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-কাব্য ও অন্যান্য কবির প্রেমের কবিতার তীব্রতা অটুট রাখিয়া তাহার মধ্যে বিরাট ব্যাপকতা আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন।······শেলীর কবিতায় রক্তমাংসের সম্পর্কের পরিচয় কম। শেলী ক্ষুদ্রতায় ভরা দীনা পৃথিবীকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নতুন জগৎ গড়িতে চাহিয়াছিলেন, যেখানে থাকিবে অনন্ত প্রেম, অনন্ত স্বাধীনতা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে রক্তমাংসের নিবিড়তা ও কল্পলোকের বিরাট বিস্তৃতি—উভয়েরই সন্ধান পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলী, কীট্সের কাব্য—ইহাতে যে প্রণয়ের চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার সঙ্গে শেলীর কাব্যবর্ণিত প্রেমের সাদৃশ্য নাই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উভয় প্রকারের রসের সমন্বয় হইয়াছে।'

(রবীন্দ্রনাথ)

শ্রীশশীভূষণ দাসগুপ্ত বলেন—

'এই যে বৈষ্ণবদৃষ্টি—যাহা জগৎকে একেবারে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেয় না,—অথবা এই জগৎ-ব্যাপারে অন্তর্গূঢ় সৃজনী শক্তিকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করে না, এই দৃষ্টিভঙ্গিটি একটি বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সৃষ্টির ভিতরে—এই স্থানেই রবীন্দ্রনাথের সত্যকার বৈষ্ণবতা। রবীন্দ্রনাথের এই যে বিশিষ্ট বৈষ্ণব দৃষ্টিভঙ্গি তাহা তাঁহার বিশেষ কোন বাক্য বা রচনার ভিতর দিয়াই যে একটা সুযৌক্তিক দার্শনিক মতবাদরূপে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, একথা বলা যায় না।······আমরা রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবতার ভিতরে একদিকে পাইতেছি হেগেলের দৃষ্টিভঙ্গির সমগ্রতা ও ব্যাপকতা,—অন্যদিকে পাইতেছি বৈষ্ণবদের প্রেমের গভীরতা। (বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ)

একথা ঠিক যে, পদাবলী সাহিত্য রবীন্দ্র-কাব্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু প্রভুত্ব করিতে পারে নাই। উল্লিখিত সমালোচকবর্গও তাহা স্বীকার করিয়াছেন—যদিও প্রভাবের রূপ তাঁহারা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের সাধনার পথ আমরা তাঁহার নৈবেদ্য-কাব্যে আবিষ্কার করিতে পারি। উপনিষদের সাধনা তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছে, বৈষ্ণব দর্শন তাঁহাকে টানিয়াছে, বিদেশী মহাজনের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু তিনি কাহাকেও গুরু বলিয়া মানেন নাই। অর্থাৎ, কোন প্রতিষ্ঠিত সাধনার

সংকীর্ণ পথ অবলম্বন করিয়া তিনি তাঁহার কাব্য-সাধনার পথে অগ্রসর হয়েন নাই। আধুনিক যুগের সমস্যার রং ভিন্ন, চলিবার পথ আলাদা, তাই কবির আধ্যাত্মিক জীবন সেই আধুনিকতাকে উপেক্ষা করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। কবি বিচিত্র অনুভূতি ও জীবনের বিভিন্ন রসের ভিতর দিয়া তাঁহার বিশ্বদেবতার কাছে আসিয়াছেন; তাঁহার কাছে কিছুই অর্থহীন নয়। কবি নিজের অন্তরের সমস্ত দ্বার খোলা রাখিয়াছিলেন। এই চঞ্চল ও বিচিত্র সংসারের যত ছায়ালোক, যত ভুল, যত ধূলি, যত ভালো-মন্দ যত গীতগন্ধ সবই কবির অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে ভগবানও তাঁহার হৃদয়ে পৌছিতে পারিয়াছেন। কবি যেন শুনিতে পাইলেন—

'সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিনু নামি।
দ্বার রুধি' জপিতিস্ যদি মোর নাম
কোন পথ দিয়া তোর চিত্তে পশিতাম।' (নৈবেদ্য)

কবি বৈষ্ণবের নাম-সংকীর্তনের পরিধির ভিতর তাঁহার সাধনার পথকে 'সংকীর্ণ' করিতে চাহেন নাই। তিনি ব্যাপকতার পক্ষে। তিনি শুধু ভক্তি চাহেন, মুক্তি চাহেন না, কারণ কবি বিশ্বাস করেন যে, ভগবানের পতাকা যাহাকে অর্পণ করা হয়, তাহাকে বহিবার শক্তিও দেওয়া হয়।

তাই কবি বলিলেন—

'আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
দুঃখেরি সাথে দুঃখেরি ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুঃখ হবে মোর মাথার মাণিক
সাথে যদি দাও ভকতি।'

এই কথা কবি বলিতে পারিলেন, কারণ তাঁহার পথ-চলাতেই আনন্দ এবং পথ-চলার বিরাম তিনি প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু এই পথ-চলায় কবি 'জ্ঞানহারা উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তিমদ-ধারা' গ্রহণ করিতে বলেন নাই, যে-ভক্তি 'তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে, মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে ভাবোন্মাদ মত্ততায়', তাহাও তিনি চাহেন নাই। যে-ভক্তি-অমৃত 'সর্বকর্মে দিবে বল, ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল আনন্দে কল্যাণে সর্বপ্রেমে দিবে

তৃপ্তি, সর্বদুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্বসুখে দীপ্তি দাহহীন', সে ভক্তি যেন কবির সমস্ত জীবনে, প্রাণে, অনুভূতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই প্রার্থনা বৈষ্ণবের প্রার্থনা নহে, বৈদান্তিকের প্রার্থনা নহে, ইহা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সাধনার ধন। উপনিষদের ঐশ্বর্যে তাহা রূপবান, বৈষ্ণবের মাধুর্যে তাহা উজ্জ্বল এবং সর্বমানবতার আদর্শে তাহা সম্পূর্ণ।* রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধন-পথের চলার শেষ চাহেন না। তিনি অবসর মাগেন নাই, তিনি শুধু জাগিয়া উঠিতে চাহিয়াছেন। যে সুরের আগুন কবির প্রাণে লাগিল, সে-আগুন সবখানে ছড়াইয়া গেল। তাই বৈষ্ণব দর্শন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কবি বলিতেছেন—

'আকাশে দুই হাতে প্রেম-বিলায় ও কে ?
সে-সুধা গড়িয়ে গেল লোকে-লোকে।
গাছেরা ভরে' নিলো সবুজ পাতায়,
ধরণী ধরে নিলো আপন মাথায়।
ফুলেরা সকল গায়ে নিলো মেখে
পাখীরা পাথায় তা'রে নিলো এঁকে।
ছেলেরা কুড়িয়ে নিলো মায়ের বুকে,
মায়েরা দেখে নিলো ছেলের মুখে।
সে যে ঐ দুঃখশিখায় উঠলো জ্বলে'
সে যে ঐ অশ্রুধারায় পড়লো গলে'।
সে যে ঐ বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হ'তে
বহিলো মরণ-রূপী জীবনস্রোতে
সে যে ঐ ভাঙাগড়ার তালে তালে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে।' (গীতিমাল্য)

ইহাই কবির প্রেমতত্ত্ব—ইহারই প্রেরণায় কবি বলিয়াছেন—

'বাজাও আমারে বাজাও।
বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও!'

---

* 'আমাদের মনে হয়, নানা সংস্কার-জর্জরিত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহনের যে প্রতিবাদ আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে প্রতিফলিত বাঙালী-জীবনের যে নব ঈশপ্রাণতা, বাংলা-সাহিত্যে তার এক বড় সার্থকতা লাভ হয়েছে এই নৈবেদ্য কাব্যে।'—কাজী আবদুল ওদুদ

তাই—

'তোমার কাছে চাইনে আমি
অবসর।
আমি গান শোনাব গানের পর।'

রবীন্দ্রনাথের সাধনার শেষ নাই, এই সাধনায় মিলন থাকিলেও বৈষ্ণবের মহামিলন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

'সেই তো আমি চাই
সাধনা যে শেষ হবে মোর
সে ভাবনা তো নাই।
ফলের তরে নয় তো খোঁজা
কে বইবে সে বিষম বোঝা,
যেই ফলে ফল ধূলায় ফেলে
আবার ফুল ফুটাই।
এমনি ক'রে মোর জীবনে
অসীম ব্যাকুলতা,
নিত্য নূতন সাধনাতে
নিত্য নূতন ব্যথা।
পেলেই সে তো ফুরিয়ে ফেলি,
আবার আমি দু'হাত মেলি;
নিত্য দেওয়া ফুরায় না যে
নিত্য নেওয়া তাই।' (গীতালি)

কবি নিজেকে শেষ করিয়া দিতে চাহেন না এবং এই খোঁজা শেষ হইবে না বলিয়া তাঁহার কোন দুঃখ নাই। ইহা অবৈষ্ণবিক চিত্তের ভাবনা। কোন বৈষ্ণব কবি এই অশেষ অন্বেষণকে এত উৎকণ্ঠাহীন আনন্দের সুরে বলিতে পারিতেন না—

'তোমার খোঁজা শেষ হবে না মোর,
যবে আমার জীবন হবে ভোর।
চলে যাবো নব জীবন-লোকে
নূতন দেখা জাগবে আমার চোখে,'

নবীন হ'য়ে নূতন সে আলোকে
পরবো তব নব মিলন ডোর।
তোমার খোঁজা শেষ হবে না মোর।'

এই অনন্তলীলার প্রতি কবির কী গভীর দরদ—এই দরদ বৈষ্ণব কবির মিলনের দরদ হইতে এক হিসাবে নিবিড়তর ; এর বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথের মূল সাধনা এইখানে।

'আমার ধর্ম'-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন—

'আমার রচনার মধ্যে যদি কোন ধর্মতত্ত্ব থাকে, তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ, যে-প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আর এক দিকে অদ্বৈত , এক দিকে বিচ্ছেদ, আর এক দিকে মিলন ; একদিকে বন্ধন, আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে ; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে ; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে। আমার ধর্ম যে-আগমনীর গান গায়, সে এই :—

'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়!
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়!
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে
জীর্ণ-আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে
বন্ধন হোক ক্ষয়!
তোমারি হউক জয়!
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়,
তোমারি হউক জয়!
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়,
তোমারি হউক জয়.

এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়,
প্রভাতসূর্য, এসেছো রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণ-বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে,
মৃত্যুর হোক্ লয়।
তোমারি হউক জয়।'

শিল্প-সাধক ও অধ্যাত্ম সাধকের পথ বিভিন্ন—এই তথ্য ও সত্য জানা না থাকিলে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সাধনার মর্ম বুঝা যাইবে না। অজিতকুমার এই দুই সাধনার পার্থক্য স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া বলিয়াছেন—

'শিল্প-সাধকের কাছে তাহার নিজের বিশেষ রূপটাই বড়; সমস্ত বিশ্বকে সেই রূপের ছাঁচে ঢালাই করিতে পারিলে তবেই তাহার তৃপ্তি। বিশ্ব তার জন্য, সে বিশ্বের জন্য নয়। বিশ্ব তাহার উপকরণ, সে যেমন খুসি তাহাকে গড়িবে, ভাঙিবে। এই জন্যই তাহার কোথাও নিঃশেষে আত্মদান নাই, কেবলি আত্ম-গ্রহণ আছে। অর্থাৎ সে কেবলি আপনার আধারের মধ্যে বিশ্বকে গ্রহণ করে, বিশ্বকে বিশেষ করিয়া লয়। অধ্যাত্ম সাধকের পথ একেবারে ইহার উল্টা। তাহার কাছে বিশ্বই বড়; আপনাকে বিশ্বের মধ্যে নিঃশেষিত করিতেই তাহার তৃপ্তি। সে বিশ্বের জন্য, বিশ্ব তার জন্য নয়। বিশ্বরূপের কাছেই তার আত্মদান সম্পূর্ণ হইলেই তবেই তাহার সাধনার সম্পূর্ণতা।'

আজকাল এই দুই সাধনার মধ্যে প্রকাণ্ড ভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য-সাধনায় সেই ভেদের মধ্যে অভেদ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ খামখেয়ালী শিল্পী নহেন অথবা ধর্মধ্বজী নহেন। তিনি খাঁটি আদর্শবাদী—তিনি বিশ্বের জন্য এবং বিশ্ব তাঁহার জন্য। নিজের সঙ্গে ও বিশ্বের সঙ্গে মিলন সাধন হওয়াতে তাঁহার আদর্শবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। তিনি শিল্পসাধকের আদর্শে আপনার মধ্যে বিশ্বকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং অধ্যাত্ম-সাধনার প্রভাবে বিশ্বের মধ্যে নিজেকে বিস্তার করিয়া সার্থকতা খুঁজিয়াছেন; তাঁহার নিঃশেষে আত্মগ্রহণ আছে, আত্মদানও আছে। ভেদের মধ্যে ঐক্যকে খুঁজিয়া লওয়া হিন্দু-সাধনার এক বিশিষ্ট ধর্ম এবং এই ধর্ম-বোধের সঙ্গে শিল্পসাধনা ও অধ্যাত্ম-সাধনার যোগসূত্র পাওয়া যায়। তাই

এই আদর্শবাদের সহিত হিন্দু-সাধনার যোগ সুস্পষ্ট। আদর্শবাদীর এই দৃষ্টি ব্যাখ্যা করিয়া স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন—

'Instead of being self-contained individual, each empirical self is the expression or focussing of something beyond itself. However self-conscious or self-determining, the human being is not absolutely individual. From the first his world is equally real with himself and his interactions with it influence the growth of his individuality. The individual and the world co-exist and subsist together. ……Human progress lies in an increasing awareness of the universal working in man. He realises that his fragmentariness will be cured only if he is devoted to the whole. Fulness of life means service to the whole. So he strives after values, frames ideals and struggles to build up a world of unity and harmony.'—(An Idealist View of Life)

জীবের মধ্যে মানুষের মঙ্গলকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অমৃতলোকে পৌঁছিতে চেষ্টা করিয়াছেন ত্যাগের সহজ পথ দিয়া নয়, জীবনের সমস্ত পথ পার হইয়া। তিনি বিশ্বাস করেন যে, জীবন-পথের আঁকা-বাঁকা গলিঘুঁজি পার হইয়া তাঁহাকে চলিতে হইবে, এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই। পথের মধ্যে যে নদী বাধা দেয়, তাহাকে অতিক্রম করিয়া পার হইতে হইবে, এড়াইয়া যাইতে গেলে পথের সন্ধান হারাইয়া ফেলিতে হয়। তাই তিনি অমঙ্গলকে স্বীকার করিয়া মঙ্গল লোকে পৌঁছিয়াছেন। ধর্ম-বোধের যে যাত্রা, তাহার প্রথমে জীবন, তাহার পরে মৃত্যু, তাহার পরে অমৃত। সন্তান মায়ের গর্ভে মা'কে সম্পূর্ণরূপে পায় না—বিচ্ছেদের সাহায্যে পাইতে হয়—ধর্মবোধের এই যাত্রাকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

'ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তং—মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন—তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মত কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তারপর মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে ; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে,—তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না,—সেই অবস্থায় শিবং, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়—শেষ হচ্চে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনা-

সঙ্গম। সেখানে অদ্বৈতং। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর পার হওয়া, তা' নয়—সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে-আনন্দ, সে ত দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়।'

(সবুজ পত্র, ১৩৪২, আশ্বিন-কার্তিক)

রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্যে এই ধর্মই প্রচারিত হইয়াছে—ইহাতে বৈদান্তিক বা বৈষ্ণবের প্রভাব থাকিলেও তাঁহাদের রীতি গৃহীত হয় নাই। দুঃখকে আত্মসাৎ করিলে আনন্দ, বিরোধকে স্বীকার করিলে মিলন, মৃত্যুকে গ্রহণ করিলে জীবন—ইহাতে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নাই, কিন্তু জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া আছে; ইহাতে পুঁথি লেখা ধর্ম না থাকিলেও মানব-জীবনের মর্মকোষে এই সত্য প্রকাশিত। এই ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ বলিয়াই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো,
সেই ত তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই ত তোমার ভালো।
পথের ধূলায় বক্ষ পেতে রয়েচে যেই গেহ
সেই ত মোদের গেহ।
সমরঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ
সেই ত মোদের স্নেহ।
সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেই ত তোমার দান,
মৃত্যু আপন পাত্র ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই ত তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলাময় যে ভূমি
সেই ত তোমার ভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই ত আমার তুমি।'

এই যে ধর্মবোধ, ইহা বাহিরের শাস্ত্র হইতে আহৃত নয়, লোকাচার হইতে গৃহীত নয়। এই ধর্মসাধনা নিজের উপলব্ধিতে—চরম বেদনায় তাহাকে জন্ম দিতে হয়, নিজের হৃদয়ের শোণিত দিয়া তাহাকে প্রাণদান করিতে হয়।

শুধু অভ্যাসের যোগে এই ধর্মকে লাভ করা যায় না, রবীন্দ্রনাথ লাভ করিতে চাহেনও নাই।

'গীতালি'তে একটি গান আছে যেখানে দেবতা একহাতে কৃপাণ, আর এক হাতে হার লইয়া জয় করিতে অগ্রসর হইতেছেন। সেই দেবতা বীরের সাজে মরণের পথ দিয়া জীবনের মাঝে আসিতেছেন। মানুষ মৃত্যুর ভিতর দিয়া জীবনকে সত্য করিয়া, বড় করিয়া, নূতন করিয়া পাইতে চায়। মানুষ বলে—

'মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে বারে বারে,
তারপরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।'

এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই মানুষ মরণের ভয়কে ছেদন করিতে চাহে এবং কবি প্রার্থনা জানাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন না—

'মরণকে মোর দোসর করে'
রেখে গেছ আমার ঘরে
আমি তারে বরণ করে
রাখব পরাণময়।'

স্বাদেশিকতা

আংশিক জীবন রবীন্দ্র-কাব্যে কখনও প্রাধান্য পায় নাই; যে-ভাব খণ্ডতার প্রাচীরে আবদ্ধ, সে-ভাব প্রশংসিত হয় নাই। সমগ্রতাবোধ রবীন্দ্রনাথের ভাবরাজ্যের বিশেষত্ব। তাই স্বদেশপূজায়ও তিনি সমগ্রতার কবল হইতে মুক্তি পান নাই। ভারতীয় সভ্যতা ও আদর্শ, বাংলার জলবায়ু ও মাঠঘাট তাঁহাকে যতই আকর্ষণ করুক না কেন, ইংরেজ শাসনের অমঙ্গলের দিক তাহাকে যতই আঘাত করুক না কেন, তিনি একথা প্রচার করিতে পারেন নাই যে নিজেদের দেশকে, নিজেদের দুর্বলতাকে, নিজেদের অন্যায়কে সবার বেশি ভালবাসিতে হইবে। তিনি অন্যায় সহিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়া দেশের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, তিনি মানবের শোষণের বিপক্ষে বলিয়াই ইংরেজ শাসনের শোষণকে নিন্দা করিয়াছেন।

তিনি দেশাত্মবোধে যেমন সঞ্জীবিত, বিশ্বমানবের দুঃখেও তেমনি ক্ষুব্ধ। তাই তাঁহার স্বাদেশিকতা দল ও জাতির উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে—যাঁহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের বেড়ায় আবদ্ধ, বাতায়ন-পথ দিয়া গৃহে যে আলোটুকু ঠিকরাইয়া পড়ে তাহারই ঝলকে চমকিত, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার ভিতর বিশ্ববোধ সমর্থন করিতে পারেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন যে, মনুষ্যত্বের মঙ্গলকে যদি ন্যাশনালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে ন্যাশনালত্বের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী-আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি বাঙালীকে আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে বলিয়াছেন, ইংরেজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আহ্বান করিয়াছেন এবং সেই বন্ধন-শৃঙ্খলকে ভাঙিয়া দিবার জন্য বারবার বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বাণী দেশবাসীর চিত্তকে জাগ্রত করিয়াছে এবং তিনি জাগ্রতচিত্তকে আহ্বান করিয়াছেন দেশ-সেবার দুর্গম পথে। তিনি দেশসেবক, দেশকর্মীকে উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন যে, 'তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে, তাহা হইলে একাকী এই দুরূহ যাত্রায় বাহির হইতে হইবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে পা টলিলে চলিবে না, হৃদয় কাঁপিলে হইবে না।' রবীন্দ্রনাথ কাব্যে, সংগীতে, তাঁহার স্বাদেশিকতার মর্মকথা প্রচার করিয়াছেন। ভারতের ধ্যান-ধারণা, তপস্যা ও আদর্শ তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছে; তিনি ভারতমাতাকে 'ভুবন-মনমোহিনী' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ভারতীয় আদর্শের প্রতি কবির আকর্ষণ নৈবেদ্য-কাব্যে নানাভাবে প্রচারিত হইয়াছে। সেই আদর্শকে ব্যাখ্যা করিয়া কবি লিখিলেন—

'হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছো তুমি
ত্যজিতে মুকুটদণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ; শিখায়েছো বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি' জয়-পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফল স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।

ভোগেরে বেঁধেছো তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছো উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছো মঙ্গল
শিখায়েছো স্বার্থ ত্যজি' সর্ব দুঃখসুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।'

এই আদর্শে কবি পরিপুষ্ট, এই আদর্শের তিনি ব্যাখ্যাতা এবং প্রচারক; এই আদর্শেরই তিনি একনিষ্ঠ সেবক। এই আদর্শ হইতেই তাঁহার স্বাদেশিকতা রূপ পাইয়াছে; তাই স্বার্থের সংঘাতে তিনি কাঁপিয়া উঠেন, ক্ষুদ্রতাবোধ তাঁহাকে অবসন্ন করিয়া দেয়। তাই আধুনিক দয়াহীনা সভ্যতা-নাগিনী যে কুটিল ফণা তুলিয়া গুপ্ত বিষ-ভরা দন্ত দিয়া মানুষকে আঘাত করিতেছে, তাহাতে কবি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং যে জাতীয়তাবোধে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধে, লোভে লোভে সংগ্রাম ঘটে, 'প্রলয়-মন্থন ক্ষোভে ভদ্রবেশী বর্বরতা' পঙ্কশয্যা হইতে জাগিয়া উঠে এবং লজ্জা-শরম ত্যাগ করিয়া জাতি-প্রেম নাম ধরিয়া পাশবিক বলের বন্যায় ধর্মকে ভাসাইতে চাহে, তাহার প্রতি কবির মমতা নাই, বরঞ্চ অমোঘ নির্মম বিরুদ্ধতাই আছে। তাই কবি লিখিলেন—

'স্বার্থ যত পূর্ণ হয়, লোভ-ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে,—বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি' বিচার
জঠরে পুরিতে চায়।—বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ,
তখন গর্জিয়া নামে তব রুদ্রবাজ।
ছুটিয়াছে জাতি-প্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি' স্বার্থ-তরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।' (নৈবেদ্য)

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা-ধর্ম নৈবেদ্য-কাব্যে ব্যাখ্যাত।* কবি বলিতেছেন

---

* 'বাস্তবিক ক্লৈব্যবর্জিত এক অসাধারণ বলীয়ান আত্মার সাক্ষাৎই আমরা এই নৈবেদ্য কাব্যের প্রায় সব জায়গায় পাই। আর এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যকে আমরা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের অন্যতম বলে' জ্ঞান করি। কাব্যের উৎকর্ষ সৃষ্টিতে; আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক ওজস্বল জাগ্রত আত্মা সেই সৃষ্টি-মহিমা লাভ করেছে এই কাব্যে। নৈবেদ্য কাব্যখানি মুসলমান-পাঠকের কাছে বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ; মঙ্গলের অভিমুখে এমন ক্লৈব্যবর্জিত অগ্রগতিই কোরআনের ইস্‌লামের প্রিয়।'—কাজী আবদুল ওদুদ-প্রণীত 'রবীন্দ্র-কাব্যপাঠ'

যে, হে রাজাধিরাজ, তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের হাতে হাতে অর্পণ করিয়াছ, প্রত্যেকের উপরে তাহার শাসনভার দিয়াছ, সেই দুরূহ কাজে যেন আমরা দুর্বলতা না দেখাই। কবির রসনায় সত্যবাক্য যেন 'খরখড়্গ সম' ঝলকিয়া উঠে, কারণ—

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তা'রে যেন তৃণ সম দহে।'-

তাই তিনি কোন অন্যায় মানিতে চাহেন না এবং কোন অন্যায় করিতেও প্রস্তুত নহেন। কবি তাঁহার প্রার্থনা জানাইতেছেন—

'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ-তলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,'
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হ'তে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ-চরিতার্থতায় ;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাহি গ্রাসি'
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি' পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।' (নৈবেদ্য)

এই প্রার্থনা কবির দেশাত্মবোধকে নূতন রূপ দিয়াছে। যাঁহারা দল গড়িতে চাহেন, দল ভাঙিতে চাহেন ; যাঁহারা মঙ্গল সৃষ্টি না করিয়া শুধু বিরোধ-সৌধ গড়িয়া তুলিতে চাহেন ; যাঁহারা নিজেদের অন্যায়কে ধর্মাসনে বসাইয়া অপরের অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করেন ; যাঁহারা দেশ সেবায় নিজেদের স্বার্থকে ভুলিতে চাহেন না এবং ক্ষুদ্রতার বন্ধনকে অতিক্রম করিতে পারেন না, তাঁহারা, রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার রূপের ছায়ায় ও শোভায় বিমুগ্ধ হইবেন না, হইতে পারেন না।

কবি নিজের জন্মভূমিকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন—তাহার শোভা, সৌন্দর্য

যতই তুচ্ছ হউক না কেন, কবির প্রাণে তাহা সঙ্গীতধারা স্মজন করে। তাই তিনি বঙ্গজননীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারিয়াছেন—

'নমোনমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি,
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমি তব পদধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল নিশীথ শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আন্‌চান্‌, চোখে আসে জল ভ'রে।' (চিত্রা)

বাংলার পল্লীতে কুমারের বাড়ি, রথতলা, হাটখোলা, মন্দির—সমস্তই কবির চিত্তে বাঁশির তান তুলিয়াছে। তিনি বাঙালীকে 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' হইতে বলিয়াছেন, বাংলার ভাই-বোনকে পারস্পরিক বিরুদ্ধতা ভুলিতে বলিয়াছেন। তিনি গাহিয়াছেন—

'বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।'

অপরদিকে বাঙালীর অসম্পূর্ণ পঙ্গুজীবন দেখিয়া তিনি বলিয়াছেন যে বাঙালীকে অন্ধ মোহ হইতে মুক্ত করিয়া দাও; তাহাকে নিষেধের ডোরে পদে পদে বাঁধিয়া রাখিয়ো না, প্রাণ দিয়া, দুঃখ সহ্য করাইয়া ভালমন্দের সহিত সংগ্রাম করিতে দাও। কারণ বাঙালী সে নিজের, সে বিশ্বের, সে বিশ্বদেবতার সন্তান; শুধু জন্মভূমির সন্তান নহে। তাই তিনি বলিয়াছেন—

'পুণ্যপাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।
সাতকোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করোনি।' (চৈতালী)

তিনি বাঙালীকে পূর্ণ হইতে বলিয়াছেন এবং দেশপ্রেমের এই পূর্ণরূপের ধ্যানই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনায় পাই।

কবি বিশেষ করিয়া সোনার বাংলাকে ভালবাসিয়াছেন, চিরদিন বাংলার আকাশ বাতাস তাঁহার প্রাণে বাঁশি বাজাইয়াছে। এই দেশের মাটি তাঁহার

দেহের সহিত মনের সহিত মিশিয়াছে। এই দেশের গৌরব, সম্মান রক্ষা করিতে যত বিপদই আসুক, তাহা বরণ করিতে হইবে। বারবার বাতি জ্বালাইলে তাহা হয়তো দেশসেবার বিরুদ্ধ বাত্যায় নিবিয়া যাইতে পারে কিন্তু তবুও সাহস হারাইলে ও ভাবনা করিলে চলিবে না।

কবি বলিয়াছেন—

'যদি তোর ভাবনা থাকে,
ফিরে যা না—
তবে তুই ফিরে যা না।
যদি তোর ভয় থাকে তো
করি মানা॥'

কিন্তু দেশের ও দশের কাজে তিনি কোন অসম্মানজনক কাজ করিতে অক্ষম। যাহা অসত্য, অন্যায়, তাহা দূর করিতে হইবে, নিজের দেশের অন্যায়কেও, নিজের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতাকেও। সত্যের জয় তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যে স্বাদেশিকতা সর্বমানবের, সর্বকালের ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত—

'যদি দুঃখে দহিতে হয়
তবু মিথ্যা চিন্তা নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয়
তবু মিথ্যা কর্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয়,
তবু মিথ্যা বাক্য নয়
জয় জয় সত্যের জয়॥'

বঙ্গ-জননীর দ্বারে যে-শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহার আহ্বানে কবি বাহির হইয়াছেন; মাতার আহ্বান-বাণী ভুবনমাঝে রটাইতে হইবে, মাথা তুলিয়া দেশমাতার স্তবগানে যোগ দিতে হইবে। এই জননীকে ছাড়িয়া গেলে তাঁহাকে ছোট করা হইবে। ভারত-মাতার চরণে কবি শিক্ষা লইবেন এই পণ তিনি করিয়াছেন; কারণ 'তব সনাতন ধ্যানের আসন মোদের অস্থিমজ্জা।' কবি সকাতরে ও সগৌরবে বলিলেন—

'তোমার ধর্ম তোমার কর্ম
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম

লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা।
তব গৌরবে গরব মানিব
লইব তোমার দীক্ষা।'

এই ভারতের সাধনাকে কবি অন্তরের সহিত ভালবাসেন। যে-জীবন ভারতের তপোবনে ছিল, যে-জীবন ভারতের রাজসিংহাসনে ছিল, সে মহাজীবনকে তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন—

'দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে র'য়েছে গোপন,
তোমারি মন্ত্র অগ্নি-বচন
তাই আমাদের দিয়ো।'

বিদেশী-শাসনের অন্যায়কে তিনি ক্ষমা করিতে পারেন নাই, এবং অসত্য ও অন্যায় যে বেশিদিন টি ঁকিয়া থাকিতে পারে, তাহা তিনি বিশ্বাস করেন নাই। তাই তিনি গাহিয়াছিলেন—

'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
ততই মোদের বাঁধন টুট্‌বে।'

এবং 'বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান্।' এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার 'নাইট্' উপাধি ত্যাগ করিয়াছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়ান, তিনিই কবির শ্রদ্ধা পান। কবি অরবিন্দ ঘোষের রাজদণ্ড হইয়াছে শুনিয়া উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন যে, তাঁহার বেদনা হইতে দেশবাসী বল পাইবে; তাঁহার সত্যরক্ষা ও সত্যপ্রচার মিথ্যা হইবে না। দেবতার দীপ হাতে লইয়া যিনি আসিলেন, তাঁহাকে কোন রাজা শাস্তি দিতে পারেন না। কারণ,

'শাস্তি? শাস্তি তারি তরে
যে পারে না শাস্তি-ভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর,
কপট বেষ্টন; যে নপুংস কোনো দিন
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায়; আপনার
মনুষ্যত্ব, বিধিদত্ত নিত্য অধিকার

যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে ; দুর্গতির করে অহঙ্কার ;
দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত প্রায় ;
সেই ভীরু নতশির, চিরশাস্তি তার
রাজকারা বাহিরেতে নিত্য কারাগার।
বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থযাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর।'

তাই কবি শিবাজীর পুণ্যচেষ্টাকে অবলম্বন করিয়া ভক্তিভরা সংগীতের মূর্ছনা সৃষ্টি করিয়াছেন ; শিবাজীর তপস্যা কবির চিত্তলোকে নূতন উদ্দীপনা আনিয়াছে। তিনি 'শিবাজী-উৎসব' কবিতায় লিখিলেন যে, যাহা সত্য, তাহা মরে না, উপেক্ষায় বিস্মৃতির তলে তাহাকে ডুবাইয়া রাখিতে পারা যায় না। যাঁহারা সত্যের পূজারী, তাঁহারা হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন, ইতিহাসের মুখর মিথ্যাভাষণ তাঁহাদিগকে লোকচিত্ত হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিলেন—

'হে রাজ-তপস্বি বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এককণা
পারে হরিবারে ?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ স্বদেশ-লক্ষ্মীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন
কে জানিত হয়ে গেছে চির-যুগ-যুগান্তর-তরে
ভারতের ধন।'

কবি স্বদেশের জন্য এই 'প্রাণোৎসর্গকে' চিরকাল সম্মানের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত বরণ করিয়াছেন। কিন্তু স্বদেশ-পূজার ভিতর কোন ক্ষুদ্রতা তিনি সহিতে পারেন না। যে-অন্যায়ের, অত্যাচারের আঘাতে জর্জরিত হইয়া

তিনি স্বদেশকে পূজা করিয়াছিলেন, স্বদেশ-পূজার সেবক ও পুরোহিতদের প্রশংসা করিয়াছেন, সে-অন্যায়ের ইঙ্গিতেই কবি বিশ্বের সমস্ত আঘাতকে নিজের অন্তরে অনুভব করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। তাই কবি 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় বলিতেছেন, যেখানে ক্রন্দন-ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে, যেখানে জর্জর বন্ধনে অনাথিনী সহায় মাগিতেছে, যেখানে স্ফীতকায় অপমান অক্ষমের বক্ষ হইতে লক্ষ মুখ দিয়া রক্ত শুষিয়া পান করিতেছে, স্বার্থোদ্ধত অবিচার বেদনাকে পরিহাস করিতেছে, সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস ছদ্মবেশে লুকাইতেছে; যাহারা নতশির মূক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, ম্লানমুখে যাহাদের শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী লিখিত আছে, যাহাদের স্কন্ধে ভারের চাপ থাকার দরুণ চলার গতি মন্থর হইয়া আসে, কিন্তু যাহারা প্রতিবাদ করে না এবং যাহাদের অন্ন কাড়িয়া লইলে দীর্ঘশ্বাসে ভগবানকে একবার ডাকিয়া নীরবে মরে, তাহাদের বাঁচাইতে হইবে। কবি তাই বাঁশি ছাড়িয়া উঠিতে চাহিতেছেন —যেখানে আগুন লাগিয়াছে, সে আগুন তাঁহাকে নিবাইতে হইবে। তাই কবির অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযান দেশকে অতিক্রম করিয়া সর্বমানবের, সমস্ত বিশ্বের প্রান্তে পৌঁছিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিতে পারিয়াছেন—

'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে,
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে-অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পালাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মতো সঙ্কোচ সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।'

তাই কবি নিজেকে বলিতেছেন—

'কবি, তবে উঠে এসো যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান।

বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।'

কবি অন্যায়কে এড়াইতে চাহেন নাই, অন্যায়কে দমন করিতে চহিয়াছেন। এই বোধের অনুপ্রেরণায় কবি সাহসীর গলায় মালা পরাইতেছেন, এবং ভীরুকে ধিক্কার দিয়াছেন। তিনি বিপদকে অতিক্রম করিতে চাহিয়াছেন, তাই 'সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে!' শক্তির বীভৎসতাকে কবি কোনদিন সহ্য করিতে পারেন না, দুর্বলের ক্রন্দন তাঁহাকে চঞ্চল করিয়াছে। 'বাতায়নিকের পত্রে' রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'একদা আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উচ্ছৃঙ্খলতার সময় ভীত, পীড়িত প্রজা আপন কবিদের মুখ দিয়ে শক্তিরই স্তবগান করিয়াছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান, প্রকৃতপক্ষে অধর্মের জয়গান। সেই কাব্যে অন্যায়কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শিব পরাভূত। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই পরাভবের গানকেই মঙ্গলগান নাম দেওয়া হ'ল।...... এই বড় দুঃসময়ে কামনা করি শক্তির বীভৎসতাকে কিছুতে আমরা ভয় করব না, ভক্তিও করব না—তাকে উপেক্ষা করব, অবজ্ঞা করব।......এই বাতায়নে এসে বসেছি, অমনি দেখি আমাদের আঙিনা থেকে উঠছে দুর্বলের কান্না; সেই দুর্বলের কান্নায় আমাদের সমস্ত আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ। আজকের দিনে দুর্বল যত ভয়ংকর দুর্বল, জগতের ইতিহাসে এমন আর কোনদিনই ছিল না। বিজ্ঞানের কৃপায় আজ বাহুবল নিদারুণ দুর্জয়।'

সমগ্রতার উপাসক বলিয়াই কবি ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে সকলকে আহ্বান করিতেছেন, ব্রাহ্মণকে সবার হাত ধরিয়া শুচি হইতে বলিতেছেন। এই ভারতে 'একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কারধ্বনি হৃদয়-তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি,' তপস্যাবলে একের অনলে বহুকে আহুতি দিয়া বিভেদ ঘুচিল এবং একটি বিরাট হিয়া সেই তপস্যায় জাগিয়া উঠিল। কবি বলিতেছেন যে, সেই সাধনার, সেই আরাধনার যজ্ঞশালায় সকলকে আনত-শিরে মিলিতে হইবে। এই ভারতের তীরে দাঁড়াইয়া কবি দুই বাহু বাড়াইয়া নরদেবতাকে প্রণাম জানাইতেছেন এবং বন্দনা করিয়া বলিতেছেন—

'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন,
শক হুন-দল পাঠান মোগল একদেহে হোলো লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'

কবি সেই সর্বমানবের বিচিত্র সুর নিজের শোণিত-ধারায় অনুভব করেন, তাই তিনি বিশ্বের মধ্যে নিজেকে খুঁজিয়াছেন এবং যাহারা 'সবার পিছে, সবার নিচে', এবং সর্বহারা তাহাদের মাঝে নিজের স্থান রচনা করিতে চাহিয়াছেন। এই সর্বমানবের দিকে দৃষ্টি আছে বলিয়াই কবি বলিয়াছেন—

'যারে তুমি ফেলো নিচে সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

** ** **

দেখিতে পাওনা তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে।
সবারে না যদি ডাকো, এখনো সরিয়া থাকো,
আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান,
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।'

রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীকে প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন বিশ্বের কর্মভার গ্রহণ করিবার জন্য, তাই খেদ করিয়া বলিতেছেন 'সে কি রহিল লুপ্ত আজি সবজন পশ্চাতে?' তিনি দেশবাসীকে অভয়ের মন্ত্র দিয়া বলিয়াছেন, 'আগে চল, আগে চল ভাই।' কারণ তিনি জানেন যে, 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।' অকল্যাণপ্রসূ রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে তিনি অত্যাচারিত দেশকে জাগ্রত করিয়া সেবার ও কর্মের মন্দিরে আত্মোৎসর্গ করিতে বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ দেশের হীনতাকে ও দীনতাকে ঘৃণাভরে ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, দেশবাসীকে বৃহত্তর জীবনের আশায় সঞ্জীবিত করিয়াছেন এবং বিশ্বের সকলের হাত ধরিয়া মানবতা-ধর্মে অগ্রসর হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়াইয়াছেন, অন্যায়কারীকে তিনি আঘাত করিয়াছেন; সত্যকে তিনি বরণ করিয়াছেন, অসত্যকে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন; তাই কবির দেশ-প্রেম জাতীয়তার সংকীর্ণ পথকে অবলম্বন করিয়া মুক্তি চাহে নাই—খোলা রাজপথে

বিশ্বের জন্য মুক্তির দাবি জানাইয়াছে। তিনি দেশবাসীর পক্ষ হইতে প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

'এ দুর্ভাগ্য দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়,
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর,
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণ-ভার,
এই চিরপেষণ যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারংবার
মনুষ্যমর্যাদাগর্ব চিরপরিহার,
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি' দূর করো।'

ইহাই ভারতবাসীর জাতীয় প্রার্থনা—রবীন্দ্র-সাহিত্যে ইহারই ঘোষণা।

রবীন্দ্রনাথের স্বাজাতিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, পশ্চিমের প্রভাব বাঙালীর চিন্তাজগতে যে-আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারই ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের জাতীয়তাবোধের ধারা দুইদিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় এই দেশাত্মবোধের স্রোতকে সংকীর্ণ বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া সর্বমানবতার দিকে ধাবিত করিয়া দিয়াছিলেন। তখন হইতেই আর একটি বিশ্বমুখী-স্রোত আচার-শৈবল ও লৌকিক ধর্মকে স্বীকার করিয়া তরতর করিয়া বহিয়া আসিতেছিল—যাহা তদানীন্তন হিন্দুর হিন্দুত্বকে আঁকড়াইয়া ধরিল এবং ক্রমশঃ সেই স্রোতের বেগ স্বদেশ-প্রীতির বাত্যায় বাড়িয়া উঠিল। রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের চিন্তাধারা আশ্রয় পাইল রবীন্দ্র-সাহিত্যে। বঙ্কিম-সাহিত্যের জাতীয়তা-বোধ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল রক্ষণশীল হিন্দুদের হিন্দুত্ব-আদর্শে। এই মুখ্য কথাটা স্মরণ রাখিলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের স্বাদেশিকতার আকৃতি ও প্রকৃতি বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে।

কাব্য-সাহিত্যে আধুনিকতা

যুগধর্মকে অস্বীকার করিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই। একথা রবীন্দ্র-সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠকমাত্রই স্বীকার করিবেন যে, পাশ্চাত্ত্যের কর্মকুশলতা, মনের তীক্ষ্ণতা ও বেগ, এবং চিন্তার স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার পশুশক্তিকে যখন নিন্দা করেন, মানুষের ধর্ম লইয়া যখন আলোচনা করেন, ভারতের বাণী বহন করিয়া যখন য়ুরোপের উর্বর ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেন, তাহাতে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচ্যমুখী হইলেও বিচারভঙ্গি পশ্চিমের। তাঁহার আধুনিক-সংস্কৃত, ইংরেজী-শিক্ষিত মনের পরিচয় তাঁহার সাহিত্য বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়; পক্ষান্তরে, তাঁহার ভাব-প্রবণ, আনন্দের উপাসক মন প্রাচ্যের দর্শনে, বাঙালীর বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাই তাঁহার সাহিত্যে ভারতের বাণী প্রচারিত হইলেও, য়ুরোপের সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাব তিনি এড়াইতে পারেন নাই। এই ভারতীয় ভাব ও য়ুরোপীয় ভাবনা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনায় মিলিত হইয়াছে। কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজের সাধনার পথ নিজেই কাটিয়া বাহির করিয়াছেন—সেই সাধনার সুরে অন্য সাধনার সংশ্লেষ থাকিলেও কবি নিজস্ব সুর হইতে বিশ্লিষ্ট হয়েন নাই, অথবা নিজের সুরের মাতনে তিনি গান গাহিয়া গিয়াছেন। এস্রাজ বা সেতারের একটি তার বাজাইলেও অন্য অব্যবহৃত তারের প্রয়োজন হয় সুরের ধ্বনির জন্য; সেই পাশাপাশি তারগুলি ব্যর্থ নয়। রবীন্দ্রনাথও তেমনি নিজস্ব তারে সুর তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতীয় য়ুরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গম না হইলে সেই সুরে, সেই তালে হয়তো ভিন্ন সংগীত গীত হইত। বাঙালীর চিত্তে নমনীয়তা (plasticity) আছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-বীণায় ঝংকারের তারগুলি সক্রিয়, তাই যুগধর্ম বা যুগবাণী বা যুগসাধনা সেখানে বাজিয়া উঠিয়াছে। অতীতের দিকে দৃষ্টি থাকিলেও বর্তমান অস্বীকৃত হয় নাই এবং বর্তমানে নিমগ্ন থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। তাই তাঁহার কাব্য কালকে জয় করিয়া কালের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে, দেশের গণ্ডীতে আবদ্ধ না থাকিয়া দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং নিজের চিত্তে প্রস্ফুত হইয়া সর্বমানবের চিত্ত জয় করিয়াছে।*

---

* 'A great writer is not an isolated fact. He has his affiliations with the present and the past, and through these affiliations he leads us inevitably to his contemporaries and predecessors, and thus at length to a sense of a national literature as a developing organism having a

অনেকে অভিযোগ করেন যে, বিগত মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর চিন্তা-জগতে যে মুক্তধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার সহিত রবীন্দ্র-কাব্যের যোগ নাই।‡ অতএব অতি-আধুনিক যুগধর্মের পরিচয় রবীন্দ্র-কাব্যে ঘটিবে না। এখন সমাজ ভাঙিয়াছে, রাষ্ট্র বড় হইয়াছে ; ব্যক্তি নিজের স্বাধীনতা হারাইয়াছে, বহুর মঙ্গল-সাধন করিবার জন্য, বুকের নিশ্বাসে যে বাঁশি বাজিত, আজ সে-বাঁশি বাজিতেছে প্রভুর আজ্ঞায় ; যে-মুক্তির শুকতারা দেখা দিত সাধকের চিত্তে, সে-শুকতারা আজ কালোমেঘে আচ্ছন্ন। এ সবই সত্য কিন্তু প্রকৃত কাব্য এই কালের গণ্ডীকে অতিক্রম করিতে পারে। এমন হইতে পারে যে, আধুনিক কবিদের কাছে শজিনা ফুল গোলাপ ফুল হইতে প্রিয়, কারণ শজিনা প্রয়োজনীয় ; হইতে পারে যে, ম্যালেরিয়া চন্দ্রালোক অপেক্ষা অধিকতর সত্য, কারণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে জাতি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু তবুও গোলাপফুলের আবেদন, চন্দ্রালোকের নিষ্কম্প বেদনারাশি প্রকৃত কাব্যে প্রকাশিত হইলে মানুষের চিত্তকে জয় করিবে— রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক নীতি প্রণয়ন করিবার পক্ষে তাহা সাহায্য না করিতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থার প্রভাবে জিহ্বার স্বাদ বদ্‌লায়, এমন কি চিত্তের রং বদ্‌লায়—তাহাতে রচনারীতি ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তন প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু কাব্যের কাব্যত্ব বা বিচারের নীতি পরিবর্তিত হইবার কারণ নাই। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে প্রকৃত সাহিত্য চিরকালের এবং সর্বলোকের হইতে পারিত না। তদুপরি, রবীন্দ্র-সাহিত্যের গতিধর্ম প্রেম-সাধনা ও ধর্মবোধ মানুষের হৃদয়-ধর্মের সহিত জড়িত—তাহা মানুষকে ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তের দিকে, দীনতা হইতে মহত্ত্বের দিকে, বন্ধন হইতে মুক্তির দিকে লইয়া যায়। তাঁহার কাব্য-সাহিত্যের মূল সুরগুলি পরিপার্শ্বিক ব্যবস্থার ক্ষণভঙ্গুর তালের সঙ্গে সংযুক্ত

---

continuous life of its own, yet passing in the course of its evolution through many varying phases. Thus in our study of literature on the historical side we shall have two things—the continuous life or national spirit in it : and the varying phases of that continuous life, or the way in which it embodies and expresses the changing spirit of successive ages. A nation's literature is the progressive revelation, age by age, of such nation's mind and character.'—Hudson

‡ 'বাঙালী কবি যদি গতানুগতিকতার অপবাদ খণ্ডাতে চায়, তবে রবীন্দ্রনাথের আওতা থেকে খোলা জল-হাওয়ায় বেরিয়ে এসে তাঁকে দেখাতে হবে যে, তিনি বাংলায় বৃথাই জন্মাননি, জন্মে স্বজাতিকে স্বাবলম্বন শিখিয়েছেন।.........একথা না মেনে তাঁর উপায় নেই যে প্রত্যেক সৎকবির রচনাই তাঁর দেশ ও কালের মুকুর এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে-দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব পড়ে, তার সঙ্গে আজকালকার পরিচয় এত অল্প যে তাকে পরীর দেশ বললেও বিস্ময় প্রকাশ অনুচিত।' (স্বগত—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

নয়, কেবল বাঁধা নিয়মের গমকে গঠিত নয়। ইহা মানুষকে গতি দেয়, মানুষের ক্ষুদ্রতার বন্ধনে আটক পড়ে নাই। তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যকে কালের সীমা-নির্দেশের ধ্বজা দেখাইয়া এড়াইয়া গেলে চলিবে না। যে-সাহিত্যের অবলম্বন হইল মানুষের হৃদয়, যে সাহিত্যের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড হইল এই বিশ্বচরাচর, যে-সাহিত্য স্তন্য পায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত মানুষের ঐক্যবোধে, যে-সাহিত্যের ঘোষণা-পত্রে মানবতার আদর্শ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, সে-সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও ভাবধারা কখনও সেকালের হইয়া যাইতে পারে না এবং তাহা হয়ও নাই, অর্থাৎ তাহা চিরকালের আধুনিক। তবুও যাঁহারা অভিযোগ করেন এবং ভাবেন যে, সমাজের ভাঙা-গড়া, রাষ্ট্রের নূতন দৃষ্টি, ব্যক্তি-স্বাধীনতার নূতন রূপ রবীন্দ্র-সাহিত্যকে আমাদের চিত্তের রসলোক হইতে নির্বাসিত করিয়াছে, তাঁহাদের হৃদয় থাকিলেও হৃদয়-ধর্মের সঙ্গে পরিচিতি নাই। অনেকে মনে করেন যে, কাঁচা লঙ্কা ও কাঁচা তেঁতুলের প্রচুর আমদানি হইলে আস্বাদনশক্তি হয়তো এমনভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে যে, মধুর অভাব বোধ হইবে না এবং মধুর হয়তো প্রয়োজনীয়তা চুকিয়া যায়, কিন্তু এই বিশ্বের রসের হাটে কোন অর্থনৈতিক একচেটিয়া ব্যবসা চলে না। সেখানে বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। আমাদের সামাজিক বা অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা যে ছাঁচেই ঢালা হউক, আমরা সংসার-যাত্রায় যাহার প্রেরণায়ই চলি না কেন—প্রভাতের আলোর বর্ণচ্ছটা, সূর্যাস্তের ম্লানিমা, শ্রাবণের বিরহ-ব্যথা, হৃদয়-ধর্মের বিশ্বসমষ্টিবোধ প্রভৃতি ইহাদের কাহাকেও নির্বাসন দেওয়া সম্ভব নহে। হৃদয়ের রং বদলাইলেও ধর্ম বদলায় না, প্রভাতের আলো মেঘে ঢাকা পড়িলেও আলোর স্পর্শ পাওয়া যায়।

মানুষের চিত্তে 'আকাশ-রহস্য, কাল-রহস্য এবং জীবন-মরণ-রহস্য' অবিরত ঘা দিতেছে। এই রহস্যবোধ যাঁহাদের চিত্তে জাগ্রত নাই, এই রহস্যোদ্ঘাটনের দিকে যাঁহাদের দৃষ্টি নাই, তাঁহাদের হৃদয়-ধর্মের অভাব। হৃদয়ের দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইলে যে ধনের আবশ্যক, তাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, তিনি রোমাণ্টিক কবির চোখের অঞ্জনে এই জগতকে দেখিয়াছেন, কিন্তু এই কঠিন জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংশয়, বিশ্বব্যাপ্ত বিভীষিকা ও রহস্য সমস্তই তাঁহার তারে বাজিয়াছে, সংগীতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রকাশে শুধু ভাবপ্রবণ আদর্শবাদই বিরাজ করে না, সেখানে এই বাস্তব সংসারের সহিত কারবার আছে; সেখানে শুধু আকাশে রঙের খেলা নহে, মাটিতে ফসল ফলিয়াছে। ইংরেজী শিক্ষা আমাদের ভিতরকার

বাস্তবকে জাগাইয়া দিয়াছে। জীবনের আঘাতে জীবন জাগিয়া উঠে, এই কথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন। কবির কাজ বিশ্ববস্তু ও বিশ্ব-রসকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করা—এখানেই তাঁহার জোর। এই জোর যে রূপদক্ষের সাহিত্যে আছে, অর্থাৎ অমৃতের প্রকাশ ও অনির্বচনীয়তা, সে-সাহিত্য মহাকালের দরবারে মৃত্যুহীন হইয়া বিরাজ করিবে, সমালোচকের ঘাড়নাড়া তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারিবে না। আধুনিক মানুষ রাষ্ট্রের হাতে গড়া জীব হইলেও সাহিত্যে প্রয়োজন তাহার প্রকাশ-ধর্ম। এই প্রকাশ না থাকিলে তাহা সাহিত্য হয় না—তাই প্রকৃত সাহিত্য দেশকালনির্বিশেষে সাহিত্য-রসিকের কাছে এত আদর পায়; সংগীতে, চিত্রে এবং অন্যান্য শিল্পে যে-সব গণ্ডী আছে, তাহা প্রকৃত সাহিত্যে নাই। যোগসাধনই ইহার ধর্ম—রবীন্দ্র-সাহিত্যে সেই যোগসাধনের শক্তি আছে।

রবীন্দ্রনাথ জানেন যে,

'বাইরের হাটে বস্তুর দর কেবলই ওঠা-নামা করছে—সেখানে নানা মুনির নানা মত, নানা লোকের নানা ফরমাস, নানা কালের নানা ফ্যাশান। বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়লে কবির কাব্য হাটের কাব্য হবে।'

তিনি সেই হাটের কাব্য সৃষ্টি করেন নাই; তিনি অন্তরের অনুভূতির সাহায্যে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, বিশ্বের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন; তাই তাঁহার সাহিত্য সকল কালের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই সহজ কথাটি বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন যে, জনসাধারণের সুবিধার জন্য তানসেন 'মেঠো সুর তৈরি করতে বসবেন না। যাঁরা রসপিপাসু তাঁরা যত্ন করে সেই ধ্রুপদগুলির নিগূঢ় মধুকোষের মধ্যে প্রবেশ করবেন। অবশ্য লোক-সাধারণ যতক্ষণ সেই মধুকোষের পথ না জানবে ততক্ষণ তানসেনের গান তাদের কাছে অবাস্তব, একথা মানতেই হবে।' কারণ কবি বিশ্বাস করেন যে, 'শালের কাঠ ও শালের মঞ্জরীর প্রকাশ স্বতন্ত্র।' তিনি তাই বলিয়াছেন—

'মার্কসিজ্‌মের ছোঁয়াচ যদি কারো কবিতায় লাগে, অর্থাৎ কাব্যের জাত বাঁচিয়ে লাগে, তাহ'লে আপত্তির কথা নেই, কিন্তু যদি নাই লাগে, তাহ'লে কি জাত তুলে গাল দেওয়া শোভা পায়। কেমিষ্ট্রীর ল্যাবরেটারি যদি ভালোয় ভালোয় জুড়তে পারো রান্নাঘরে, তবে সায়েন্সের জয়জয়কার করব, কিন্তু না-ই যদি পারো তাহ'লে হারজিতের তর্ক তুলব না, ভোজনটার ব্যাঘাত না হ'লেই হ'ল।' (ডাঃ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র, প্রবাসী, ১৩৪৬)

রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন আমাদের দেশের 'মন আর ভাষা ছিল কাঁচা, তার মনের জমি ছিল নিচু। তখনকার মাল মসলা কমদামী করে দিত উৎপন্ন জিনিসকে।' তিনি নিজের সাধনার দ্বারা স্তরে স্তরে জমি উঁচু করিয়াছেন, আঁট করিয়াছেন তাহার মাটি। এই কঠিন সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'social consciousness'-এর (সামাজিক চেতনার) অভাব আছে বলিয়া অভিযোগ করা যায় না। তবে যাঁহারা এই সংজ্ঞার শুধু অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিতে চাহেন তাঁহারা রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'social consciousness'-এর অভাব পরিলক্ষ্য করেন। কিন্তু সেই অভাববোধ সাহিত্য-বিচারে বড় জিনিস নয়। 'রসের দিক থেকে মানুষের ভালমন্দ লাগা কোন বাহ্য মতকে মানতে বাধ্য নয়। প্রাণতত্ত্বে বলে, দেহে সাময়িক অভ্যাসজনিত যে বিশেষত্ব জন্মে, তা বংশের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। বাইরের অভ্যাস যত প্রবল হোক আয়ুর সীমায় এসে তারা লুপ্ত হয়। সাহিত্যেও তাই।'

বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের ঢেউ সাগর পার হইয়া আমাদের দেশেও আসিয়াছে। একথা মানিতে হইবে যে, সেই ঢেউ আমাদের দেশে দোলা দিয়াছে; সেই দোলায় যাহা ক্ষণভঙ্গুর, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহার শিকড় আমাদের মর্মস্থলে, যাহার বাঁধন আমাদের গৃহে ও সমাজে, তাহা এখনও উৎপাটিত হয় নাই। য়ুরোপে তাহাদের অনেক কিছু, বোধ হয় সব কিছু, ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে। একটা সাধারণ নিয়ম যে, কোন বিধি-ব্যবস্থা যখন গড়িয়া ওঠে, তখন সেই ব্যবস্থা নানাদিকে তার শিকড় ছড়াইয়া দেয়। ফলে, সর্বজিনিসে একটা ছন্দ ও তাল সুসংগত ভাবে জাগিয়া ওঠে। যখন মূল শিকড় উৎপাটিত হয়, তখন সেই ছন্দের পতন হয় এবং তাল কাটিয়া যায়। য়ুরোপে সেই মূল শিকড় উৎপাটিত হইয়াছে। তাই তাহার মনের প্রকাশ-ধর্মকে যথাযথ রূপ দিতে গিয়া নূতন রসে, ছন্দে ও তালে গান বাঁধিতেছে। তাহার কাব্যে মুক্তি খুঁজিতেছে, সাহিত্যে নূতন রস খুঁজিতেছে, কারণ তাহার চলায় নূতন ছন্দ আসিয়াছে, তাহার জীবন নূতন তালে গঠিত হইয়াছে। সর্বদিকের তাল ও লয় (rhythm) ঠিক রাখিতে হইলে তাহাদের প্রকাশ-ধর্মে নূতন রসের ও ছন্দের প্রয়োজন—এই মুক্তির অন্বেষণে সেই নূতন রসদ্যোতক তাল ও লয়কে সংস্থান করিবার জন্য। আমরা পশ্চিমের সুরাতে

মাতাল হইয়া ভাবি যে, আমাদের চলার পথ নূতন রূপ ধরিয়াছে—তাই, নূতন রসের, ছন্দের ও তালের প্রয়োজন অনুভব করি। আমরা মাতাল হইয়াছি বটে, কিন্তু কিছুই ভাঙিতে পারি নাই, আমাদের গতি দুর্বল হইয়া পায়ে-পায়ে ঠোকাঠুকি লাগিতেছে বটে, কিন্তু আমাদের সংকীর্ণ রাজপথকে প্রশস্ত করিবার চেষ্টা করি নাই; আমাদের সমাজ-মন্দিরের দরজা-জানালা ভাঙিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু বিগ্রহ এখনও আছে, ভিত্তি এখনও কঠিন অবস্থাতেই বিরাজ করিতেছে; অর্থনৈতিক বিধানে যত্নের অভাবে ঘুণ ধরিলেও তার শাসনদণ্ড এখনও অপ্রতিহত আছে। এই দুলিয়া ওঠাকে ভাঙারই শামিল ভাবিয়া যাঁহারা পশ্চিমের মত কাব্যে নূতন ছন্দ ও সাহিত্যে নূতন রস পরিবেষণ করিতেছেন, তাঁহারা নিজেদেরকে প্রকাশ করিতেছেন না—কারণ সেই নূতন ছন্দে ও রসে আমাদের জীবনের ও সাহিত্যের তাল কাটিয়া যাইতেছে। অন্তরে যাহা ভাঙিয়া গিয়াছে, বাহিরে যাহা বিধ্বস্ত হইতেছে, সেই বানে যে-স্রোত প্রবাহিত, তাহাকে রূপ দিতে হইলে নূতন সুর ও নূতন রসের আবশ্যক। তাই পশ্চিম-সাহিত্যে সেই মুক্তির যুক্তধারা আসিয়া প্রাচীনের পঙ্কিলতাকে ভাসাইয়া দিয়াছে—ইহা শুধু স্বাভাবিক নয়, সর্বদিকে তাল ও লয়ের পক্ষে আবশ্যকীয়। পশ্চিমের ঢেউয়ের দোলায় চঞ্চলিত হইয়া আমরা ভাঙিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছি, কারণ সেই দোলায় এখনও ভাঙনের বেগ ও শক্তি দেখা দেয় নাই। আমরা তখন পশ্চিমের নব ভাবধারার সুরা পান করিয়া সাহিত্য-রচনায় নূতন রূপ ও নূতন রস বণ্টন করিতে লাগিলাম—ভাবিলাম না যে, রসের হাটে কাঁচা মালের ক্রেতা নাই এবং ইহাও ভাবিলাম না যে, কাব্যে সংগীত যোজনা করিতে হইলে বাহিরের ও অন্তরের সহিত, ব্যক্তির ও অন্তরের সহিত একটা লয়যুক্ত তাল থাকিবার প্রয়োজন আছে। আজ সেই rhythm-এর অভাবে আমাদের অতি-আধুনিক কাব্য-সাহিত্য খোঁড়াইয়া চলিতেছে। ছন্দহীন ও গীত, তাললয়হীন সংগীত রসলোকে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে, কারণ ছন্দোবদ্ধ গতির মাধুরী ও সুষমা সেখানে নাই। তাই যাহাকে আমরা কাব্যের মুক্তি ভাবিতেছি—প্রকৃতপক্ষে তাহাই কাব্যের বন্ধন। রচনার রীতির সহিত, রচনার রূপের সহিত, রচনার বস্তুর সহিত, রচনার পটভূমির সহিত একটা সুসঙ্গত rhythm-এর প্রয়োজন—ইহাই সাহিত্যের Expressionism। আমাদের অতি-আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের ধারা Impressionism-এর নালার দিকে চলিতেছে—সেই

নালার জল তুলিয়া স্নান করিতে হয়, অবগাহনের আনন্দ সেখানে পাওয়া যায় না। যাঁহারা শুধু প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বকফুল, বেগুনফুল ও কুমড়া ফুলের লোভে কম্পমান, তাঁহারা শিউলি বা চামেলীর প্রাণের কথা শুনিতে কান পাতিবেন কেন? আমাদের অতি-আধুনিক সাহিত্যের বাস্তবতায় যে-অবাস্তবতা * আছে, তাহাই সেই সাহিত্যকে প্রাণহীন করিয়া দিতেছে। যাঁহারা গুণী, তাঁহারা অতি-আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যের দেহের রূপে ভুলিবেন না—ভুলিলেও তাহাকে মোহের অবস্থা বলিয়া ধরিতে হইবে; কারণ প্রকৃত প্রেমের তন্ময়তার অভাব সেখানে ঘটিবে। সাহিত্যে নূতন রূপ ও রসের 'ফিউচারস্ ডিলিং' চলে না—চলিলে ঠকিতে হয়। বিদেশী ছাপ দিয়া পণ্যের বাজারে ক্রেতা জুটানো চলে, কিন্তু সাহিত্যের রসের হাটে তাহা চলে না—সেই চেষ্টাতে ব্যাবসাবুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে, রসিক চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'বড়ো সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অপূর্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন ক'রে প্রকাশ করতে পারে। এই তার কাজ। এ'কেই বলে ওরিজিন্যালিটি। যখনি সে আত্ম-গবিকে নিয়ে গলা ভেঙে, মুখ লাল ক'রে, কপালের শিরগুলোকে ফুলিয়ে তুলে, ওরিজিন্যাল হোতে চেষ্টা করে তখনি বোঝা যায়, শেষ দশায় এসেছে। জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক।……ভাষাটাকে বেঁকিয়ে

---

* রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক কাব্য' ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—'আধুনিকতার যদি কোন তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায় তবে বলতেই হবে বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ী তালঠোকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করিনে। ইনফ্লুয়েঞ্জা আজ হাজার হাজার লোককে আক্রমণ করলেও বলব না ইনফ্লুয়েঞ্জাটাই দেহের আধুনিক স্বভাব। এটা বাহ্য। ইনফ্লুয়েঞ্জাটার অন্তরালেই আছে সহজ দেহস্বভাব।' আধুনিকতার উদ্ধত অসঙ্কোচ, মোহহীন প্রকাশ, আবরণহীন নির্লজ্জতা অবশ্য রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাওয়া যায় না, কারণ সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে যে-মোহ আছে, তাকেই নানা সুরে তিনি বাজাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন যে, ইশারা-ইঙ্গিতে যে-লুকোচুরি ছিল, লজ্জার যে আবরণ সত্যের বিরুদ্ধে নয়, সত্যের আভরণ,—তাহা তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। আধুনিক দুঃশাসন জনসভায় বিশ্ব-দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করিতেছে—এই বস্ত্রহরণের দৃশ্য রবীন্দ্র-সাহিত্যে নাই, কিন্তু তাহার ইঙ্গিত আছে।

চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। চরম সন্দেহ নেই। সেই চরমের নমুনা য়ুরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজ্‌ম। এর একটিমাত্র কারণ হচ্চে এই, আলাপের শক্তি যখন চলে যায় সেই বিকারের দশায়, প্রলাপের শক্তি বেড়ে ওঠে। বাইরের দিক থেকে বিচার করতে গেলে প্রলাপের জোর আলাপের চেয়ে অনেক বেশি এ-কথা মানতেই হয়। কিন্তু তা নিয়ে শঙ্কা না করে লোকে যখন গর্ব করতে থাকে তখনি বুঝি সর্বনাশ হোলো ব'লে।' (সাহিত্যের পথে)

রবীন্দ্র-উপন্যাসের ধারা

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্য আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার উপন্যাস-সম্বন্ধীয় ধারণা আমাদের জানা প্রথম প্রয়োজন। ম্যাপ ও ছবিতে অনেক তফাত, একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন। ম্যাপে দূর-নিকটের সমান ওজন, সর্বত্রই অপক্ষপাত; কিন্তু ছবিতে অনেক জিনিস বাদ পড়ে, তাই ম্যাপের চেয়ে ছবি রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্য মনে হয়। এই অসম্পূর্ণতা, এই আভাস-রূপে সত্যকে পাওয়া, ইহাকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে বড় বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি পরলোকগত লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"এক একটা ইংরেজি নভেলে এত অতিরিক্ত বেশি কথা, বেশি ঘটনা, বেশি লোক যে, আমার মনে হয় ওটা একটা সাহিত্যের বর্বরতা। সমস্ত রাত্রি ধরে যাত্রা গান করার মতো। প্রাচীন কালেই ওটা শোভা পেত। তখন ছাপাখানা এবং প্রকাশক সম্প্রদায় ছিল না, তখন একখানা বই নিয়ে বহুকাল জাবর কাটবার সময় ছিল। —এমন কি, জর্জ এলিয়টের নভেল যদিও আমার খুব ভাল লাগে, তবু এটা আমার বরাবর মনে হয়, জিনিষগুলো বড়ো বেশি বড়ো—এত লোক, এত ঘটনা, এত কথার হিজিবিজি না থাকলে বইগুলো আরো ভালো হোত। কাঁঠাল ফল দেখে যেমন মনে হয়, প্রকৃতি একটা ফলের মধ্যে ঠেসাঠেসি ক'রে বিস্তর সারবান কোষ পুরতে চেষ্টা করে ফলটাকে আয়তনে খুব বৃহৎ এবং ওজনে খুব ভারি করেছেন বটে এবং একজন লোকের সঙ্কীর্ণ পাকযন্ত্রের পক্ষে কম দুঃসহ করেননি, কিন্তু হাতের কাজটা মাটি করেছেন। এরি একটাকে ভেঙে ত্রিশ পঁয়ত্রিশটা ফল গড়লে সেগুলো দেখতে ভালো হতো। জর্জ এলিয়টের এক একটি নভেল এক একটি সাহিত্য-কাঁঠাল বিশেষ।"

(সাহিত্যের পথে)

তাই, রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, উপন্যাসে কোন একটা বিশেষ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আগাগোড়া তর্কের প্রয়োজন নাই, মীমাংসারও প্রয়োজন নাই—শুধু গতি, নৃত্য ও আভাস দেখা যাইবে। মনের আঘাত-প্রতিঘাতে, চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে বিবিধ ঢেউ তোলা—নানাবর্ণের আলোছায়া সেখানে খেলিবে—নাটক-নভেলে তাহাই প্রয়োজন। তিনি ইংরেজি নভেল সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন—

"কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস—কেবল মানবচরিত্রকে মুচ্‌ড়ে নিংড়ে কুঁচকে মুচকে, তাকে সজোরে পাক দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিওরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা।" (ছিন্নপত্র)

উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ এই যে, তাহাতে বেশি চরিত্র, বেশি ঘটনা, বেশি আড়ম্বর থাকিবে না—বেশ সহজ, সুন্দর এবং অশ্রুবিন্দুর মত উজ্জ্বল কোমল সুগোল করুণ কিছু থাকিবে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের উপন্যাস ছিল নভেলের আদর্শ—ঘটনার সুন্দর সমাবেশ। রবীন্দ্রনাথ নূতন পথ ধরিলেন—তাঁহার উপন্যাস মনস্তত্ত্বমূলক। চিত্তলোকের সরু এবং সরীসৃপ গলি ধরিয়া তিনি তাঁহার উপন্যাসের আড়ম্বরহীন ঘটনা সহজভাবে চালাইয়া লইয়াছেন—এই চলার সৌন্দর্য দেখিয়া মানুষ খুসী হয়—সাহিত্যের পক্ষে এই সহজজ্ঞান, সরলতা ও সৌন্দর্য যে প্রধান উপকরণ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ঘটনা সামান্য, কিন্তু যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহা মনকে আশ্রয় করিয়া ঘটিতেছে। প্রথম অবস্থায় বঙ্কিমের প্রভাবের ফলে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস * রচনা করিয়াছিলেন—বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত। ইতিহাসের ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করে না—ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে যে নিভৃত রস সঞ্চিত থাকে, তাহাই রবীন্দ্রনাথের কাছে

---

* ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় যাঁহাদের সুখদুঃখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত বদ্ধ। রাজ্যের উত্থানপতন, মহাকালের সুদূর কার্যপরম্পরা যে সমুদ্র গর্জনের সহিত উঠিতে পড়িতেছে, সেই মহান্‌ কলসঙ্গীতের সুরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে, তখন রুদ্র-বীণার একটা তারে মূলরাগিণী বাজে, এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরু মোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্র গম্ভীর, একটা সুদূরবিস্তৃত ঝঙ্কার জাগ্রত করিয়া রাখে।......ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোন খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন, তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে ধনে হলুদ সর্ষের সন্ধান করেন। মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন, যিনি বাটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন, তাঁহার সঙ্গেও আমার কোন বিবাদ নাই, কারণ স্বাদই এস্থলে লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষ্য মাত্র।"

(সাহিত্য)

মূল্যবান। তাই ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্রোতের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইলেন—জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। এই বাস্তবতার দিকে ঝোঁক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ ঘটনার বিশ্লেষণে এক অভিনব রস আবিষ্কার করেন, অন্তরের কামনার সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন ও সংঘাত বর্ণনা তাঁহার উপন্যাসের প্রধান বস্তু। সেখানে রোমান্স থাকিলেও মানুষের স্বাভাবিক আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধাচরণ নাই।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নারী-শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। প্রেমের অন্তর্নিহিত শক্তিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী—তিনি জানেন যে, "সূর্যের আলো ও বৃষ্টির জল যেমন নির্বিচারে সর্বত্রই মাটির জড়তা ও দৈন্য অস্বীকার করে, মরুকে বারবার স্পর্শ করে, তাকে শ্যামলতায় পুলকিত করে তোলে, যে-ভূমি রিক্ত তার সফলতার জন্যে যেমন তাদের নিরন্তর প্রতীক্ষা, তা'র কাছেও যেমন পূর্ণতার দাবি, মানুষের সমাজে প্রেম তেমনি সব জায়গাতেই অসীম প্রত্যাশা জানিয়ে রাখে।" এই ব্যক্তিগত প্রেমের বাহন নারী, তাই নারীকে ভারতবর্ষ শক্তি বলিয়া জানিয়াছে। কিন্তু এই নারীপ্রেমের একপারে চোরাবালি, আর এক পারে ফসলের ক্ষেত। তাই স্ত্রী ও পুরুষের প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণশক্তিতে জাগ্রত করতে পারে, কিন্তু সে-প্রেম যদি শুক্লপক্ষের না হ'য়ে কৃষ্ণপক্ষের হয় তবে তার মালিন্যের তুলনা নাই। পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যায়; নারীর প্রেমে ত্যাগধর্ম সেবাধর্ম সেই তপস্যারই সুরে সুর-মেলানো; এই দু'য়ের যোগে পরস্পরের দীপ্তি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। নারীর প্রেমে আরেক সুরও বাজতে পারে, মদনধনুর জ্যায়ের টংকার, সে মুক্তির সুর, না সে বন্ধনের সংগীত। তাতে তপস্যা ভাঙে, শিবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়।·········স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের মাঝে বিধাতা একটি দূরত্ব রেখে দিয়েছেন। মুক্ত অবকাশের মধ্যে পুরুষ মুক্তি-সাধনার যে-মন্দির বহুদিনের তপস্যায় গেঁথে তুলেচে, পূজারিণী নারী সেইখানে প্রেমের প্রদীপ জ্বালবার ভার পেলো। সে-কথা যদি সে ভুলে যায়, দেবতার নৈবেদ্যকে যদি সে মাংসের হাটে বেচতে কুণ্ঠিত না হয়, তা হ'লে মর্ত্যের মর্মস্থানে যে-অমরাবতী আছে তা'র পরাভব ঘটে; পুরুষ যায় প্রমত্ততার রসাতলে, আর নারীর হৃদয়ে যে রসের পাত্র আছে তা' ভেঙে গিয়ে সে-রস ধূলাকে পঙ্কিল করে'—(যাত্রী)

দীপশিখাকে দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিলে পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা এবং আলো নিভিয়া যায়। নারীপ্রেমের শক্তি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ঘোষিত হইলেও সেই প্রেমের আলো-কে নিভাইয়া দিবার বীভৎসতাকে লেখক কোনদিন সমর্থন করেন নাই। বাস্তবতার খাতিরে রবীন্দ্রনাথ 'অমরাবতী'র নারী ও 'ভোগবতী'র নারী—দুইজনকেই আঁকিয়াছেন এবং নারীর ব্রত যে সেবায়, ক্ষমায়, সৌন্দর্যে, কল্যাণে স্ত্রী-পুরুষের দূরত্বের ফাঁককে ভরিয়া দেওয়া সে-কথা তিনি কখনও ভোলেন নাই। "দুই বোন" উপন্যাসে তিনি নারীর প্রিয়া-রূপ ও মাতা-রূপের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। * নৌকাডুবির হেমনলিনী, গোরার সুচরিতা, শেষের কবিতার লাবণ্য, যোগাযোগের কুমুদিনী পথের পাথেয় জোগাইয়া দেয়, পথকে অবরুদ্ধ করে না;—কিন্তু চোখের বালির বিনোদিনী, ঘরে-বাইরের বিমলা পুরুষকে 'ভোগবতী'র সমুদ্রে ডুবাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, সুরধুনীর জলে স্নান করিতে বাধা দিয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারীর মায়াবিনী-রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। নারী একটা বাস্তবের পিণ্ডমাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথ জানেন যে, তাহার মধ্যে কলাসৃষ্টির একটা তত্ত্ব আছে, অগোচর একটি নিয়মের বাঁধনে, ছন্দের ভঙ্গীতে সে রচিত, সে একটি অনির্বচনীয় সুসমাপ্তির মূর্তি। "বসনে ভূষণে, আড়ালে আবডালে, দ্বিধায় দ্বন্দ্বে, ভাবে ভঙ্গীতে মেয়ে তো মায়াবিনীই বটে;" নারীর মায়ার আবরণ রবীন্দ্র-সাহিত্যে স্বীকৃত।

নৌকাডুবি

নৌকাডুবি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুভাবের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নারী চিত্তের এক রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। কমলা রমেশকে ভালবাসিয়াছিল স্বামী ভাবিয়া। যখন কমলা জানিল যে, রমেশ তাহার স্বামী নয়, তাহার সমস্ত দরদ, ভালবাসা উবিয়া গেল এবং রমেশকে স্বামী জানিয়া অসঙ্কোচে তাহার সঙ্গে

---

* 'মেয়েরা দুই জাতের—এক জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া। ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষা ঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্ব লোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব। আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝঙ্কারের অপেক্ষায়, যে ঝঙ্কারে বেজে বেজে ওঠে সর্বদেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।' (দুই বোন)

চিরস্থায়ী ঘর-কন্নার সম্পর্ক পাতাইতে বসিয়াছিল বলিয়া লজ্জায় সে মরিয়া গেল। রমেশ যখন সমস্ত ঘটনা জানাইয়া কমলাকে চিঠি দিল এবং সর্বশেষে বলিল—"প্রিয়তমে, আমি তোমার হৃদয়ের দ্বারে অতিথি—আমাকে ফিরাইয়ো না"; কমলা সেই আহ্বান অস্বীকার করিল। যে ব্যক্তি তাহার স্বামী নহে, তাহারই ঘর করিতে হইবে, এই আহ্বান হিন্দু সতীস্ত্রীর কাছে প্রাণহীন। কমলা সেই চিঠিতে জানিতে পারিল যে, তাহার স্বামীর নাম নলিনাক্ষ। "এই নামটি তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন ভরিয়া তুলিল, এই নামটি যেন এক বস্তুহীন দেহ লইয়া তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল—তাহার চোখ দিয়া অবিশ্রামধারা বাহিয়া জল পড়িয়া তাহার হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিয়া দিল—মনে হইল, তাহার অসহ্য দুঃখদাহ যেন জুড়াইয়া গেল।" কমলার অন্তঃকরণ বলিতে লাগিল,

'এ তো শূন্যতা নয়, এ তো অন্ধকার নয়—আমি দেখিতেছি, সে-যে আছে, সে আমারই আছে।"

তখন কমলা প্রাণপণ বলে বলিয়া উঠিল—

"আমি যদি সতী হই, তবে এই জীবনেই আমি তাঁহার পায়ের ধূলা লইব, বিধাতা আমাকে কখনই বাধা দিতে পারিবেন না। আমি যখন আছি, তখন তিনি কখনই যান নাই, তাঁহারই সেবা করিবার জন্য ভগবান আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।'

কমলার চরিত্রকে বুঝিতে হইলে হিন্দুস্ত্রীর এই গোপন বিশ্বাসের খবর জানিতে হইবে। বিশ্বজগতের মধ্যে যখন তাহার কিছুই রহিল না, তখন তাহার না-পাওয়া না-দেখা স্বামীর মুখখানি তাহার অন্তরে ফুটিয়া রহিল—কমলা ঐ মুখের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গেল। হিন্দু রমণীর অবতারবাদী ভক্তিপ্রবণ হৃদয়—সে তাহার স্বামীর সম্বন্ধকে অনাদিকালের সম্বন্ধ, জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ বলিয়া ভাবে। কমলা একদিন হেমনলিনীকে বলিয়াছিল—

"আমি যে স্বামীকে কখনও দেখি নাই বলিলেই হয়, আমার সমস্ত মনের ভক্তি তাঁহার উদ্দেশে যে কেমন করিয়া গেল, তাহা আমি বলিতে পারি না। ভগবান আমার সেই পূজার ফল দিয়াছেন—এখন আমার স্বামী আমার মনের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন—তিনি আমাকে গ্রহণ না-ই করিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে এখন পাইয়াছি।"

কমলা তাঁহার স্বামীকে লোভের মধ্য দিয়া পায় নাই এবং তাহার সেই জোর ছিল বলিয়াই রমেশের কাতর আহ্বান অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছিল। এই

হিন্দুরমণীর আদর্শে কমলা সঞ্জীবিত না হইলে রমেশকে গ্রহণ করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইত। কমলা হেমনলিনী হইলে রমেশকে গ্রহণ করিত, প্রেমের মর্যাদা দেখাইতে পারিত। কিন্তু কমলার ভালবাসার অবলম্বন তাহার স্বামী, কোন বিশেষ ব্যক্তি নয়। সেই স্বামীর আসন যে পাইবে, কমলার অন্তরের পূজা তাহারই জন্য উৎসর্গীকৃত। এই রহস্যের সন্ধান আধুনিক জীববিদ্যা-বিজ্ঞান দিতে পারিবে না; তাই অজিতকুমার বলিয়াছেন যে, হিন্দুভাবের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ না করিলে এই রকমের জিনিস কবির হাত হইতে বাহির হইতে পারিত না। *

হেমনলিনীর অন্তরে যে আলো-ছায়া লুকোচুরি খেলা করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহা নিপুণতার সহিত আঁকিয়াছেন। এখানে অন্তরের সঙ্গে অন্তরের যোগ—কোন সংস্কারগত আদর্শের চাপ নাই। শুধু হেমনলিনীর দৃঢ়, সংযত ও আত্মসমাহিত ভাব অন্তরের প্রেমস্রোতকে উত্তাল করিয়া তোলে নাই, ফুলিয়া ফুলিয়া সে-স্রোত কিছুই ভাসাইয়া লইয়া যায় নাই। অথচ সেই প্লাবনের বেগ হেমনলিনীর অন্তরে ছিল। ইহাই হেমনলিনী-চরিত্রের বিশেষত্ব—ইহাকেই আমরা পরে সুচরিতা ও লাবণ্য-রূপে পাই।

চোখের বালি

"চোখের বালি"-উপন্যাসে নূতন সুর ধ্বনিত হইয়াছে। ইহাই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস। মানুষের মনের খেলা অনন্ত—মানবমনে যে ঘাত প্রতিঘাত নানা সমস্যা সৃজন করে, রবীন্দ্রনাথ তাহাই আঁকিয়া যান। দেহের ক্ষুধাকে ঘিরিয়া যে সংঘাত মানুষের জীবনে সৃষ্ট হয়, তাহাই লেখক চোখের বালি উপন্যাসে দেখাইয়াছেন। এই যৌনসমস্যায় তিনি ভীরুতা প্রকাশ করেন নাই, অথচ সেই দেহের লালসার জয় ঘোষণা করেন নাই। বিধবা বিনোদিনী মহেন্দ্রের সংসারে আসিল—মহেন্দ্রের উপর মায়াজাল বিস্তার করিল। মহেন্দ্রের সঙ্গে মন-দেয়া নেয়া খেলা খেলিতে গিয়া বিনোদিনী নিজের অন্তরে প্রেমের স্বাদ অনুভব করিল। যে প্রেমস্রোত মহেন্দ্রকে স্বীকার করিয়া

* ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কমলা-চরিত্রের রহস্য ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই অভিযোগ করিয়াছেন যে, নলিনাক্ষকে পাইবার আগ্রহাতিশয্যে কমলা তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছেন। এই স্বাতন্ত্র্য না হারাইলে কমলা ও হেমনলিনীর কোন মূলগত পার্থক্য থাকিত না—হিন্দুস্ত্রীর আদর্শ কবি ফুটাইতে পারিতেন না।

বিনোদিনীর অন্তরে জ্বলিয়া উঠিল, তাহা মহেন্দ্রের বন্ধু বিহারীর দিকে প্রবাহিত হইল। প্রেমের আলোকে বিনোদিনী দেখিতে পাইল যে, সে বিহারীকে না পাইলে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বিনোদিনী বিধবা হইলেও সে নারী—তাহার অন্তরে ক্ষুধা আছে, দেহে রূপ আছে, চিত্তলোকে বিহারীর প্রতি ভালবাসা জমিয়া উঠিল। বিনোদিনী বিহারীকে বলিল—

"আমি মন্দ হই যা হই, একবার আমার মত হইয়া আমার অন্তরের কথা বুঝিবার চেষ্টা কর। আমার বুকের জ্বালা লইয়া আমি মহেন্দ্রের ঘর জ্বালাইয়াছি। একবার মনে হইয়াছিল আমি মহেন্দ্রকে ভালবাসি, কিন্তু তাহা ভুল।··মহেন্দ্র আমাকে ভালবাসে বটে, কিন্তু সে নিরেট অন্ধ, আমাকে কিছুই বোঝে না।"

বিহারী বিনোদিনীকে একদিন পিশাচী ভাবিয়াছিল—সমাজের সাধারণ মানদণ্ডে হয়তো বিনোদিনী পিশাচী বলিয়া ঘোষিত হইবে। কিন্তু রমণীকে যাঁহারা বিচার করিতে চাহেন, তাঁহারা যদি সমাজের সংকীর্ণ মাপকাঠি দিয়া বিচার করেন, রমণীর মনের বিচিত্র ও অনন্ত খেলার রহস্য তাঁহারা ধরিতে পারিবেন না। বিনোদিনী বিহারীকে ভালবাসে; নিজের দয়িতের প্রতি অন্য নারীর সতর্ক ও সস্নেহ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলে নিজের অন্তরে ঈর্ষানল ধিকিধিকি করিয়া জ্বলিতে থাকে এবং রমণীর মনে ঈর্ষা জ্বলা স্বাভাবিক; বিনোদিনীর মনেও তাহা জ্বলিয়াছিল। সেই ঈর্ষার অনল বিনোদিনীর অন্তরে বিস্তৃত লাভ করিয়া মহেন্দ্রকে পোড়াইল; ইহা পিশাচীর কাণ্ড নহে। বিনোদিনী এই কথা বিহারীকে স্পষ্টভাবে বলিয়াছিল—

"যাহার ভালবাসা পাইলে আমার জীবন সার্থক হইত, তাহার কাছে এই রাত্রে ভয়, লজ্জা সমস্ত বিসর্জন দিয়া ছুটিয়া আসিলাম, সে যে কত বড় বেদনার, তাহা মনে করিয়া একটু ধৈর্য ধর। আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি যদি আশাকে ভালো না বাসিতে, তবে আমার দ্বারা আশার আজ এমন সর্বনাশ হইত না।"

ইহা শুধু বিনোদিনীর কথা নহে—ভালবাসার দংশন যে পাইয়াছে, অথচ নিজের প্রেমিক অন্য রমণীর প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ, তাহার পক্ষে বিনোদিনীর কথা প্রতিধ্বনি করাই স্বাভাবিক। যাঁহারা বিনোদিনীকে পিশাচীর কোঠায় ফেলিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতে চাহেন এবং নারীর অন্তরের জ্বালার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে কার্পণ্য প্রকাশ করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ করিয়া বোধ হয় বিনোদিনী বিহারীকে বলিয়াছিল—

"তোমার আশার ভালো হউক, মহেন্দ্রের সংসারের ভালো হউক, এই বলিয়া ইহকালে আমার সকল দাবি মুছিয়া ফেলিব, এতো ভালো আমি নই —ধর্মশাস্ত্রের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়ি নাই। আমি যাহা ছাড়িব, তাহার বদলে কী পাইব?"

বিনোদিনী বিহারীকে ভালবাসিয়াছে; তাই সে মহেন্দ্রের স্ত্রী আশার আওতা হইতে বিহারীকে রক্ষা করিতে চাহে, আশাকে আঘাত করিতে গেল মহেন্দ্রকে উজাড় করিয়া দিয়া এবং নিজেকে সার্থক করিতে চাহিল বাঞ্ছিতকে মুঠার ভিতর আনিয়া। 'যে উদ্যত চুম্বন বিহারীর মুখের কাছ হইতে সে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছে, জগতে তাহা কোথাও আর নামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, পূজার অর্ঘ্যের ন্যায় দেবতার উদ্দেশে তাহা রাত্রিদিন বহন করিয়াই রাখিয়াছে।' বিনোদিনীর হৃদয় কোন অবস্থাতেই সম্পূর্ণ হাল ছাড়িয়া দিতে জানে না, নৈরাশ্যকে সে স্বীকার করে না। তাহার মন অহরহ প্রাণপণ বলে বলিতেছে, 'আমার এ পূজা বিহারীকে গ্রহণ করিতেই হইবে'। বিনোদিনী জানে যে, মহেন্দ্রের উপর নির্ভর করিতে পারা যায় না, তাহাকে ধরিয়া থাকিলে সে ছুটিতে চায়। কিন্তু নারীর পক্ষে যে নিশ্চিন্ত, বিশ্বস্ত, নিরাপদ, নির্ভর একান্ত আবশ্যক, বিহারী তাহা দিতে পারে।

মহেন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিয়া বিনোদিনী বিহারীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল —মহেন্দ্র পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল। এই অপেক্ষার দরুণ বিহারী দুর্বল হইয়া পড়িল। বিহারীর সঙ্গে যখন শেষ দেখা হয়, তখন বিনোদিনী বলিতে পারিল—

"ঠাকুরপো, যাহা মনে করিতেছ, তাহা নহে। এ ঘরে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই।"

এই প্রেমের জোরে বিহারী মহেন্দ্রকে বলিল—"আমি বিনোদিনীকে বিবাহ করিব।"

অপেক্ষা করিতে গিয়া, প্রেমিকের জন্য অন্তরের মধ্যে পূজার আরতি দিনরাত করিতে গিয়া চিত্তে শুদ্ধতা আসিয়াছে। তাই বিনোদিনী বলিতে পারিল—

"এই আমার শেষ পুরস্কার হইয়াছে। এই যেটুকু স্বীকার করিলে, ইহার বেশি আর আমি চাই না। পাইলেও তাহা থাকিবে না, ধর্ম কখনো তাহা সহ্য করিবে না।…আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করিব। তুমি সুখী হও।"

কামময় প্রেমের এই কামগন্ধহীন দৃষ্টি রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষত্ব—ইহাতে পিশাচী বিনোদিনীকে অতর্কিতভাবে দেবী করিবার কৌশল প্রয়োগ করা হয় নাই। বিনোদিনীর দেহ নিয়া ছিনিমিনি খেলা চলিয়াছিল, তাহাই 'চোখের বালি'র প্রধান বিষয় নয়। ইহার অন্তরালে প্রেমিক-প্রেমিকার মনের যে অনন্ত ও রহস্যময় খেলা চলিয়াছে, তাহাকে উদ্ঘাটন করাই রবীন্দ্রনাথের প্রধান চেষ্টা। রবীন্দ্র-সাহিত্য মনের সংগ্রামকে বর্ণনা করে, হীন পশুবৃত্তিগুলিশুধু উপলক্ষ্য মাত্র। উহাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রধান কথা বলিয়া যাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা লেখকের প্রতি সুবিচার করিতে অক্ষম। মানবমনের এই সংগ্রাম পশ্চিম-প্রভাবপ্রসূত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

"চোখের বালি-কে উপন্যাস সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। অতি আধুনিক উপন্যাসে বাস্তবতা যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এখানেই তাহার সূত্রপাত। নৈতিক বিচার অপেক্ষা তথ্যানুসন্ধান ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ইহাতে প্রধান লক্ষ্য। চোখের বালি এই নূতন-পুরাতনের সন্ধি-স্থলে দাঁড়াইয়া এক হাতে বঙ্কিমচন্দ্র ও অপর হাতে শরৎচন্দ্রের যুগকে এক নিবিড় ঐক্য-বন্ধনে বাঁধিয়াছে।'

গোরা

"গোরা" উপন্যাসে নারীশক্তি জয়মণ্ডিত হইয়াছে। নর-নারীর সহজ ও স্বাভাবিক মিলনকে রবীন্দ্রনাথ সর্বদা প্রশংসার চোখে দেখিয়াছেন। সমাজের শাসন, শাস্ত্রের অনুশাসন, সমস্তকে অস্বীকার করিয়া প্রকৃত মিলন নর-নারীর জীবনে সাধিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বাহ্যিক মিলনকে বড় স্থান দেন নাই। তাই তাঁহার উপন্যাসে ঘটনাপুঞ্জের গতিবেগের চেয়ে ভিতরের চিন্তা, কল্পনা ও অনুভূতির একটা ক্রমবিকাশের গতিবেগ বেশী। অজিতকুমার গোরা উপন্যাস সম্বন্ধে বলেন—

"তাহার উপাখ্যান অংশটুকু এক নিশ্বাসে শেষ করা যায়। কিন্তু মানব-হৃদয়ের কি বেগবান প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাত ঐ উপন্যাসে তরঙ্গিত হইয়া চলিয়াছে—অধ্যায়ে অধ্যায়ে, এমন কি, ছত্রে ছত্রে যে ঔৎসুক্য খাড়া হইয়া জাগিয়া থাকে—এমন কোন ঘটনা-বহুল উপন্যাসে থাকে আমি তো জানি না।"

যে সকল নিগূঢ় অভিজ্ঞতা, সূক্ষ্ম অনুভাব নানাস্থানে মূর্তিলাভ করিয়াছে, তাহা এত বড় উপন্যাসকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে।

গোরা অত্যন্ত গোঁড়া; সে স্ত্রী-জাতিকে নিরর্থক, এমন কি হানিকর বলিয়া মনে করে। নারীর প্রেম তাহার কাছে হাসির বস্তু, ভারতবর্ষের যাহা কিছু, এমন কি হিন্দুয়ানীর আচারধর্ম তাহার কাছে ভাল। সেই গোরা ব্রাহ্মগৃহে-পালিতা সুচরিতার সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশই দুর্বল হইল; অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হইল। সুচরিতার সংযম, শালীনতা, সংস্কৃতি গোরার মত কঠিন লোককেও অভিভূত করিল। এই সুচরিতার সাহচর্যে আসিয়া গোরা বুঝিতে পারিল যে, শুধু সে নিজে নহে, তাহার সমস্ত কাজও যেন ঊর্ধ্বের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিতেছে—একটা আলো চাই, উজ্জ্বল আলো, সুন্দর আলো। গোরা মনে মনে স্বীকার করিল যে, কোন কোন মাহেন্দ্রক্ষণে নরনারীর প্রেমকে আশ্রয় করিয়া একটি অনির্বচনীয় অসামান্যতা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—সেই মিলনে পরিপূর্ণতা, তাহা সকল জিনিসের মূল্য বাড়াইয়া দেয়; তাহা কল্পনাকে দেহ দান করে, ও দেহকে প্রাণে পূর্ণ করিয়া তোলে। যে-গোরা কপালে তিলক কাটিয়া নিজেকে অত্যন্ত কঠিন করিতেছিল, ভারতবর্ষের কাজে, দেশের দীনতায়, সমাজের আচার-ধর্মে নিজেকে নিযুক্ত করিয়া তাহার সাধনার পথে অগ্রসর হইতেছিল, সেই গোরা অন্তরে অনুভব করিল যে, সমস্ত পৃথিবীর মাঝখানে সুচরিতা তাহার আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করিতেছে এবং তাহাকে সঙ্গে লইতে হইবে। গোরা এই প্রেমস্রোতকে কোনপ্রকারে বাধা দিয়া, আড়াল দিয়া, ক্ষীণ করিয়া নিজের অগোচরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু তাহা কূল ছাপাইয়া সুস্পষ্ট ও প্রবল মূর্তিতে দেখা দিল—গোরা সুচরিতার প্রেমকে অবৈধ বলিয়া নিন্দা করিবে, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিবে সেই শক্তি হারাইল। সুচরিতা এই পরম মুহূর্তের জন্য এতকাল অপেক্ষা করিয়াছে—ঘটনার সঙ্গে লড়াই করিয়া সে এই মুহূর্তকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে নাই, নীরবে এই মুহূর্তকে বরণ করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছে, সমস্ত দুঃখ সহ্য করিয়াছে। সহনশীলা নারীর এই মহিমা সুচরিতাকে নূতন ঐশ্বর্য দিয়াছে; সেই ঐশ্বর্যের জোরে সে গোরার কঠিন হৃদয়কে দ্রবীভূত করিল—যেন বরফ জল হইয়া নিজের মুক্তি খুঁজিয়া পাইল।

ললিতা অন্য ধরনের মেয়ে—সে সুচরিতার মত সহ্য করিতে চায় না, যদিচ সে-ও প্রেমের জোরে গ্রহণ করিতে চায়। ব্রাহ্মিকা ললিতা হিন্দু বিনয়কে ভালবাসিয়া জয় করিয়াছে, কিন্তু সেই ভালবাসা সংস্কারের বন্ধনে সৃষ্ট বা পুষ্ট নয়। বিনয় নিজের ধর্ম, বিশ্বাস ও সমাজ বিসর্জন দিয়া ললিতার সঙ্গে মিলিত হইবে, ইহা ললিতা চাহে না; সে জানে যে তাহারা মিলিয়াছে অন্তরের তাগিদে, সমাজ

বা ধর্মের আদেশে নহে। ললিতা বিনয়কে বলিল যে, নিজেকে খাটো করিয়া যেন বিনয় তাহাকে গ্রহণ করিতে না আসে এবং বিনয় ললিতাকে বলিল যে, প্রীতিদ্বারা সে যেন প্রভেদকে জয় করে। এই মিলন অন্তরের মিলন, কোন সামাজিক মিলন নয়। রবীন্দ্রনাথ ললিতা ও বিনয়ের দৃষ্টিভঙ্গি উপলক্ষ্য করিয়া কহিলেন—

"তাহারা হিন্দু কি ব্রাহ্ম একথা তাহারা ভুলিল, তাহারা যে দুই মানবাত্মা এই কথাই তাহাদের মনের মধ্যে নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মত জ্বলিতে লাগিল।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই মিলনই প্রশংসা লাভ করিয়াছে। দেশ-সেবায় দেশের সমগ্র মূর্তি রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাই গোরা যখন দেশের আংশিক মূর্তিকে পূজা করিয়াছে, গোরার সাধনা সার্থক হয় নাই। গোরা যখন জানিতে পারিল যে, সে কোন বিশেষ সমাজের নহে, সে সমস্ত দেশের, তখনই তাহার চিত্তে প্রকৃত আলো উদ্ভাসিত হইল। পরেশবাবুর কাছে গোরা তখনই মন্ত্র চাহিল—

"আপনি আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে, ব্যক্তির কাছে কোন দিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

গোরা আনন্দময়ীকে বলিল—

"তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই,—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ইহাই স্বাদেশিকতার মন্ত্র—এই মন্ত্র গোরা-উপন্যাসে ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হইয়াছে। এই মন্ত্র ভারতীয় সাধনা ও প্রতীচ্যের বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত।*

আমরা দেখিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ঘটনার বেগকে অতিক্রম

* অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন বলেন—

"In his Gora, a few traces of his impressions of (George Eliot's) Felix Holt may be found, but no more. Felix Holt is a radical, and so is Gora, but in a sense of the word other than conventional. In his burly proportions, his negligence to dress, in his attitude to Sucharita when he first meets her, Gora reminds the reader again and again of Felix Holt...... There is the faintest resemblance possible between Esther and Sucharita."

—Western Influence in Bengali Novel.

করে কল্পনা ও অনুভূতির গতিবেগ। গোরা-যুগের পর হইতে তাঁহার উপন্যাসে তথ্যসন্নিবেশ একেবারেই গৌণ হইয়া উঠিল, মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেন তথ্যসম্বল উপন্যাসের "কচ্ছপ গতিতে অসহিষ্ণু হইয়া ঔপন্যাসিকের হাত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়াছেন, তথ্যের বিরল সন্নিবেশের ফাঁকে ফাঁকে কাব্যের বাঁশি সাঙ্কেতিকতার সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে, স্থূল ঘটনার যবনিকা সরাইয়া রঙ্গমঞ্চে কবি-কল্পনা অধিষ্ঠিত হইয়াছে।" এই শেষযুগের উপন্যাস-সাহিত্য সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

"এই উপন্যাসগুলিতে উচ্চাঙ্গের কবি-কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিপরীত ধারার সমাবেশ দেখা যায়। লেখকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি প্রায় সর্বত্রই epigram-এর লক্ষণাক্রান্ত। Meredith-এর উপন্যাসের মত রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের উপন্যাস একপ্রকার তীক্ষ্ণ কঠিন বুদ্ধির চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্য (intellectual brilliance), দ্রুত অবসরহীন সংক্ষিপ্ততার মধ্যে গভীর অর্থ-গৌরবের দ্যোতন (epigram) আমাদিগকে পাতায় পাতায় চমৎকৃত ও অভিভূত করে। এইরূপ সংক্ষিপ্ত অর্থ-গৌরবপূর্ণ উক্তি প্রত্যেক উপন্যাস হইতেই প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কল্পনাময় ভাববিভোরতা ও ক্ষুরধার বুদ্ধির শাণিত চাকচিক্য—উভয় ধারাই পাশাপাশি বিদ্যমান।"

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পড়িলে এই কথা সহজেই মনে পড়ে যে, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে কবি রবীন্দ্রনাথ কখনও মুক্তি দেন নাই।

ঘরে বাইরে

"ঘরে বাইরে" উপন্যাসে নূতন সুর ও ঢং আসিয়াছে—নর-নারীর সমস্যার আধুনিক মনের বিচারপ্রসূত কাব্যময় প্রকাশ। নিখিলেশ ভারতীয় সাধনায় নিষ্ঠাবান হইলেও তাহার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতীচ্যের সংস্কৃতিতে প্রভাবান্বিত। নিখিলেশ তাহার স্ত্রী বিমলাকে বলিয়াছিল—

"আমি চাই, বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ...তোমার সঙ্গে আমার যে মিলন, সে মিলন চলার মুখে,—যতদূর পর্যন্ত এক পথে চলা গেল, ততদূর পর্যন্তই ভালো—তার চেয়ে বেশি টানাটানি কোরতে গেলেই মিলন হবে বাঁধন।"

এই আদর্শ চোখের বালি, নৌকাডুবি ও গোরা-উপন্যাসে স্থান পায় নাই।

ইহাতে কল্পনাপ্রবণ আদর্শবাদীর দৃষ্টি আছে, হিন্দু-সাধনার গার্হস্থ্যধর্মের প্রতি প্রীতি নাই। নিজের স্ত্রীকে বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে, শক্তিতে, প্রেমে পূর্ণ বিকশিত দেখিবার ইচ্ছা—এই দৃষ্টি অত্যন্ত আধুনিক। স্ত্রীকে গৃহের বাহিরে দশজনের মধ্যে যাচাই করিয়া পাওয়া—ইহাতে যথেষ্ট আদর্শবাদ আছে, যা শাস্ত্রের, লোকাচারের, সমাজের ভালোমন্দের সুরে ধ্বনিত নয়। এই দৃষ্টি সমাজগত নয়, ব্যক্তিগত। "আমার স্ত্রী, অতএব আমারই"—এই রকম যুক্তি নিখিলেশের নয়—সে সমাজের চোখরাঙানিকে ভয় করে না, সে ভয় করে নিজের মনকে। তাই নিখিলেশ বলিতে পারিল—

"বিমল যদি বলে সে আমার স্ত্রী নয়, তা হলে আমার সামাজিক স্ত্রী যেখানে থাকে থাক্। আমি বিদায় হলুম।"

কিন্তু নিখিলেশের আত্মবিশ্বাস খুব বেশি। সে যে-আদর্শকে গ্রহণ করে, সেই আদর্শকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিতে চাহে। এই আদর্শ-নিষ্ঠা নিখিলেশের বিশেষত্ব—এখানেই তাহার মধ্যে ভারতীয় তন্ময়তা লক্ষ্য করা যায়। নিখিলেশ নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে চাহে, বিচার করিতে চাহে এবং দুঃখকে গ্রহণ করিবার শক্তি অর্জন করিতে চাহে। নিখিলেশের মত আদর্শবাদী ও আত্মবিশ্বাসী লোকের পক্ষেই বলা সম্ভব হইল—

"স্বয়ংবর সভায় আজ আমার গলায় যদি মালা না পড়ে, যদি মালা সন্দীপই পায়, তবে এই উপেক্ষায় দেবতা তারই বিচার করলেন যিনি মালা দিলেন—আমার নয়।"

এই কথা কোন ভীরু বা লোভী সামাজিক ব্যক্তির বলা সম্ভব নয়—এই কথা নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ বলিতে পারিত না। নিখিলেশ জানে যে, এই বিশ্ববস্তুর পর্দার আড়ালে তাহার অনন্তকালের প্রেয়সী স্থির হইয়া বসিয়া আছে। সে জানে যে, মুক্তিই পুরুষের সাধনা এবং সে মানে যে, আদর্শের ডাক শুনিয়া পুরুষকে সম্মুখের দিকে ছুটিয়া চলিতে হইবে—যে-মেয়ে সেই অভিযানে জয়পতাকা তৈরি করিয়া দিবে, সেই পুরুষের সহধর্মিণী, আর ঘরের কোণে যে-মেয়ে মায়াজাল বুনিবে, তাহার ছদ্মবেশ ছিন্নভিন্ন করিয়া মোহমুক্ত সত্যকার পরিচয় লাভ করিতে হইবে। এই আদর্শবাদী আধুনিক যুবকের আন্তরদ্বন্দ্বের পটভূমিতে বিমলা ও সন্দীপের সংযোগ ও বিয়োগ "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নিখিলেশ তাহার স্ত্রী বিমলাকে নিজের চাপে বিকৃত করিতে চাহে নাই—তাহার প্রেমবোধ উদার। তাই নিখিলেশ বলিল—

"আমার ফরমাস একেবারে চাপা পড়ুক—তোমার মধ্যে বিধাতার যে ইচ্ছা, তারই জয় হোক্। আমার ইচ্ছা লজ্জিত হয়ে ফিরে যাক্।"

এই আদর্শবাদী প্রেমের বিপরীত হইল সন্দীপ।* সন্দীপের শক্তি আছে, চরিত্রের দৃঢ়তা নাই। তাহার প্রকৃতির মধ্যে একটা লালসার স্থূলতা আছে। সন্দীপ নবীন য়ুরোপ। সন্দীপ জানে যে, যাহারা সমস্ত মন দিয়া চাহিতে পারে, সমস্ত প্রাণ দিয়া ভোগ করিতে জানে, যাহাদের দ্বিধা নাই, তাহারাই প্রকৃতির বরপুত্র। সন্দীপের মতে, নিখিলেশ নির্জীব। সন্দীপ নিজের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নয় যে, সে স্থূল, সে প্রবৃত্তি, ক্ষুধা, নির্লজ্জ, নির্দ্দয়। সন্দীপ বলে—"আমি বস্তুতন্ত্র।" ভাবুকতার বন্দীশালায় সে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। সন্দীপ লোভী। তাই সে বিমলাকে মুঠার মধ্যে পাইয়া পিষিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল। সন্দীপের স্বদেশ-ভক্তি ও সেবার রূপ বিমলাকে টানিল; সন্দীপ সেই জালে নিজেকে জড়াইল। সে বিমলাকে স্বদেশসেবার প্রলয়ের মাঝখানে টানিয়া আনিল। "আমরা পুরুষ, আমরা রাজা, আমরা খাজনা নেবো। আমরা পৃথিবীতে এসে অবধি পৃথিবীকে লুট করেচি"—ইহাই হইল সন্দীপের আদর্শ—একেবারে নিখিলেশের বিপরীত। সন্দীপ লুট করিতে চায়—দস্যুবৃত্তিতে তাহার অসীম উৎসাহ। বিমলার কোমল হৃদয় লইয়া সে প্রলয়ের খেলা খেলিতে চাহে।

সন্দীপ বলে—

"আমি আজকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই আমার।"

নিখিলেশ বলে—

"আমি কালকের দিনের ফলটা চাই—সেই ফলটা সকলের।"

* অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁহার "Western Influence in Bengali Novel" প্রবন্ধে বলেন—

"A curious point of resemblance may be noticed between Turgenev's Rudin and Rabindranath's 'Ghare Baire'. It is not in the central story nor in the problem presented in the books. But the portrait of Rudin lives in Sandip. Rudin is a revolutionary; he dies a martyr to the holy cause of liberty. His very great friend Lezhnyov, who understood him, rightly appraised him before Alexandra Pavlovna, that he had a "cursed habit of pinning every emotion—his own and other people's—with a phrase, as one pins butterflies in a case.' With these we may add the strange power and fascination his words had on the simple girl, the girl of strong passions, Natalya. A sincere love for liberty, a strange fascination over a girlish or young heart, and an intellect clouded by craze for magic of words—these were also the distinguishing traits in Sandip's character.'

সন্দীপ ও নিখিলেশের পার্থক্য মূলগত।

সন্দীপের সংস্পর্শে আসিয়া বিমলা টলিয়া উঠিল—পুরুষের নির্লজ্জ ও নির্দয় শক্তিদ্বারা সে পরাভূত হইল। বিমলা ছিল গ্রামের একটি ছোট নদী—তখন ছিল এক ছন্দ, এক ভাষা। কিন্তু সন্দীপের আগমনে তাহার নদীতে সমুদ্রের বান ডাকিল, বাহিরের আহ্বান সে শুনিতে পাইল, তাই তাহার কূল ছাপিয়া দুলিয়া দুলিয়া সেই স্রোত ফুলিয়া উঠিল। বিমলা নারীচরিত্র সম্বন্ধে ঠিকই বলিয়াছিল—

"আমরা আমাদের অন্ধ প্রকৃতি দিয়ে প্রলয় করি। আমরা নদীর মতো, কূলের মধ্য দিয়ে যখন বয়ে যাই, তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা পালন করি, যখন কূল ছাপিয়ে বইতে থাকি, তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা বিনাশ করি।"

নারীর এই প্রলয়ঙ্করী মূর্তি আমরা পাই বিমলা চরিত্রে। সন্দীপের ক্ষুধার দৃষ্টিতে বিমলার নিহিত নারীর ক্ষুধা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সন্দীপের আগুনে সে জ্বলিয়া উঠিল কিন্তু পুড়িয়া ছারখার হইল না। বিমলা নিজেকে ফিরাইয়া আনিল—সন্দীপের তাপ সে বেশিদিন সহ্য করিতে পারিল না। তখন নারীর কল্যাণমূর্তি প্রকাশ পাইল। যে-ধ্বংসের নাচন বিমলার রক্তে জাগিয়া উঠিয়াছিল, বিমলা পদে পদে তাহাকে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বিমলা শঙ্কিত হইয়া বলিল—"এ যে কি হলো, কেমন করে হলো কিছুই বুঝতে পারচিনে।" এই সংশয়ের সন্ধিক্ষণে বিমলার বীণা সন্দীপের মিড়ে বাজিয়া উঠিল। বিমলা যে শুধু নারী, এই কথা সে স্বীকার করিল সন্দীপের স্তব শুনিয়া, এই কথা যেন সে বুঝিল সন্দীপের কামময় আরতির মধ্য দিয়া। কিন্তু সন্দীপের স্তব তাহাকে বেশিদিন ভুলাইতে পারিল না। বিমলা অনুতপ্ত হইয়া কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল—

"দেবতা নূতন সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু ভাঙা সৃষ্টিকে ফিরে গড়তে পারেন এমন সাধ্য কি তাঁর আছে?"

বিমলা আবার ফিরিতে চাহিল—সে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—

"আমাকে পূজা করতে দাও।"

সন্দীপ পরাজিত হইল, বিমলা পরাভূত হইল, নিখিলেশের জয় হইল। তার মানে, লালসা ও প্রবৃত্তি দিয়া নারীকে, স্ত্রীকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়

না—তাহাকে পাইতে হইলে ভালবাসার আলোকে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিকশিত হইতে দিতে হইবে। নর-নারীর উগ্র ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ভালবাসার দাবিতে নম্র হইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শে বিশ্বাসী—নারীর কল্যাণ-মূর্তিতে, প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে নয়।

শেষের কবিতা

"শেষের কবিতা" উপন্যাসের লাবণ্য ও অমিত ঘরে-বাইরে উপন্যাসের বিমলা সন্দীপ হইতে পৃথক—অথচ প্রথম দৃষ্টিতে একটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। লাবণ্য ও অমিত—দুই জনের পরিচয় ঘটিল আকস্মিকতার ভিতর দিয়া, কিন্তু সেই পরিচয় নিবিড়তর হইয়া দুইজনেই প্রেমের আলোতে বিকশিত হইয়া উঠিল। অমিতের দুর্লভ যুবত্ব নির্জলা যৌবনের জোরেই —একেবারে সন্দীপের মত বেহিসাবী—সমস্ত দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে, হাতে কিছুই রাখে না। অমিতের প্রিয় কবি নিবারণ চক্রবর্তী, অর্থাৎ সে নিজেই বলিয়াছে—

'অগ্নি জ্বালো,
আজিকার যাহা ভালো
কল্য যদি হয় তাহা কালো,
যদি তাহা ভস্ম হয়
বিশ্বময়,
ভস্ম হোক্।'

এই কথা সন্দীপেরও কথা—অর্থাৎ নবীন য়ুরোপের কথা। কিন্তু সন্দীপের মত অমিত অসংযত নয়। শোভনতার বেড়া ডিঙাইয়া অমিত নারীকে ছিন্নভিন্ন করিতে চাহে না; তাহার নিজস্ব সংস্কৃতি আছে—সে অপেক্ষা করিতে জানে, যদিও অপেক্ষার পক্ষে সে সায় দেয় না। সন্দীপ পলিটিকাল; অমিত কালচার-এর ভক্ত। সন্দীপ যুদ্ধ করিতে চায় ইংরেজের বিরুদ্ধে, অমিত যুদ্ধ করিতে চায় নির্জীবতার বিরুদ্ধে। অমিতের দৃষ্টি জীবনের দিকে, মরণের দিকে নয়—এখানে সে সন্দীপ, কিন্তু সন্দীপের স্থূল লালসা অমিতের নাই। সন্দীপ জয় করিতে চায় তাহার প্রবৃত্তির দ্বারা; অমিত জয় করিতে চায় নিজের বেগে, নিজের গতিতে, নিজের আত্মবিশ্বাসে। তাই অমিত বলিয়াছিল—

"পেয়ে পাওয়া ফুরোয় না, বরঞ্চ চাওয়া বেড়েই ওঠে, লাবণ্যকে বিয়ে করে এই তত্ত্ব প্রমাণ করবে বলেই অমিত রায় মর্ত্যে অবতীর্ণ।"

লাবণ্য অমিতের চরিত্রকে বিশ্লেষণ করিয়া যোগমায়াকে বলিয়াছিল—

"ওঁর নিয়ম হচ্চে, হয় উনি পেয়েও পাবেন না, নয় উনি পেয়েই হারাবেন। যেটা পাবেন, সেটা যে আবার রাখতে হবে এটা ওঁর ধাতের সঙ্গে মেলে না।"

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, শেষের কবিতা সমন্বয়-সুষমা ও কবিত্বমণ্ডিত বিশ্লেষণ শক্তির দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের দাবি করিতে পারে। তাঁহার মতে—

"সমস্ত উপন্যাসটি যেন Browning-এর অমর কবিতা Two in the Campagna'-র সুরে বাঁধা; তাহারই মর্মকথার আশ্চর্য কবিত্বপূর্ণ, উদাহরণ-সম্বলিত ব্যাখ্যা ও বিস্তৃতিকরণ; প্রেমের জল-স্থল-আকাশ-বিকীর্ণ সর্বব্যাপী ইঙ্গিত; ইহার বিদ্যুৎ-শিখার ন্যায় উজ্জ্বল আকস্মিকতা ও সুদূর-প্রসারী বিস্তার; ইহার উদ্বেলিত আনন্দ-সাগর হইতে নূতন নূতন খেয়ালী কল্পনার ঢেউ; ইহার বাস্তব-বিদ্রূপ-শীল উর্ধ্বপক্ষ আকাশ-বিহার; ইহার গভীর সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা ও মুহূর্ত-পরের ক্লান্তি অবসাদ; ইহার সূক্ষ্ম, তৃপ্তিহীন অভাব-বোধ ও মিলন-পথের অতর্কিত অন্তরায়; সর্বোপরি ইহার গূঢ়নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত, অথচ অভাবনীয় শেষ পরিণতির চমকপ্রদ অসঙ্গতি—প্রেমের এই সমস্ত রহস্যময় বৈচিত্র্যই উপন্যাসে পূর্ণভাবে আলোচিত ও প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।"

লাবণ্য চরিত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে একটি বিশেষ সৃষ্টি। লাবণ্য বিমলার মত সাধারণ মেয়ে নয়। বিমলার জীবনে সন্দীপ আসিয়া সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল—অনুতপ্ত হইয়া সে স্বামীর কাছে ফিরিয়া গেল। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, বিমলা সহজে সন্দীপের কাছে ধরা দেয় নাই—নিজের সঙ্গে অনেক লড়াই করিয়াছে। কিন্তু লাবণ্য ধরা দিবার মেয়ে নয়। অমিতের সাহচর্য লাভ করিয়া লাবণ্যের ভালবাসার শক্তি বিকশিত হইল বটে, কিন্তু অমিত তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিতে পারিল না, কারণ যে শোভন-বোধ, যে সংহতি থাকিলে নর-নারীর জীবনে প্রলয়কাণ্ড ঘটিতে পারে না, তাহা লাবণ্য দেবীর অন্তরে ও ব্যবহারে বিশেষভাবে বর্তমান ছিল। তাই লাবণ্য অমিতকে বলিতে পারিয়াছিল—

"ভালবাসার জোরে চিরদিন যেন কঠিন থাকতেই পারি, তোমাকে ভোলাতে

গিয়ে একটুও যেন ফাঁকি না দিই। তোমার রুচিতে আমাকে যতটুকু ভাল লাগে ততটুকু লাগুক, কিন্তু একটুও তুমি দায়িত্ব নিয়ো না—তাতেই আমি খুসি থাকবো।”

এ যেন ‘ঘরে-বাইরের’ নিখিলেশের শিক্ষার কথা।

লাবণ্য ‘ফিক্সড-ডিপোজিট’ একাউণ্টের মত নিজেকে অসার করিয়া পরের দাবি মিটাইতে চাহে নাই, সমাজের আচার-লণ্ঠন জ্বালাইয়া নিজের পথ চিনিয়া লইবার চেষ্টা করে নাই, অথচ প্রেমের ‘এক্সচেঞ্জ মার্কেটে’ ‘ফিউচারস্ ডিলিং’এর পক্ষপাতীও নয়। লাবণ্য শ্রদ্ধাহীন লোকচক্ষুর গোচরে নিজেকে খানখান করিয়া বিলাইয়া দেওয়াকে প্রশংসার চোখে দেখে নাই। লাবণ্য কোমল—ভালবাসার তাপে; লাবণ্য কঠিন—ভালবাসার জোরে। লাবণ্যের প্রেমের কৌটা মোহের আফিমে ভরা নয়—সে ভোলাতে চায় না। সে নিজেকে ক্ষরণ করিয়া পরকে তৃপ্তি দিতে চায়—অথচ কোন উদ্ধত যাচ্ঞাদ্বারা তার প্রেমকে কলঙ্কিত করিতে প্রস্তুত নয়। মানব-সভ্যতায় লাবণ্য দেবীরা জাগাইয়াছেন ঐশ্বর্য, সার্থক করিয়াছেন পুরুষের সাধনা। যে-বেদনা পুরুষের হৃদয়ে বরফের মত জমানো রহিয়াছে, লাবণ্য দেবীদের উত্তাপে সে-ব্যথা গলিয়া যায়। লাবণ্য দেবীর জাত “মেকি এঞ্জেলের” জাত নয়, যাহারা মুখ বাঁকাইয়া স্মিতহাস্তে উঁচু কটাক্ষে কথা বলে, যারা প্রাণহীন ইলেক্‌ট্রোপ্লেটকরা চাকচিক্যে ঝলমল করিতে থাকে।

এহেন লাবণ্যের সঙ্গে অমিত রায়ের দেখা হইল; অমিতের জীবনে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। সমাজের বাঁধা সড়কে দেখাশুনা হয় অনেকের সঙ্গে, কিন্তু চেনা-শোনা হয় না। কিন্তু অমিতের সঙ্গে লাবণ্যর চেনা-শোনার সুযোগ ঘটিল। লাবণ্যের তাপে অমিতের কথার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল—সেই কথার আলোর ভিতর দিয়া অমিত নিজের হৃদয়ে লুকানো প্রেম-মালা দেখিতে পাইল। লাবণ্যের প্রেমসাগরে অমিত ডুবিয়া গেল। বাধাহীন ব্যবস্থায় দ্বিধাহীন ব্যবহারে অমিত লাবণ্যের প্রেমের সোনার কাঠিকে ছুঁইয়া দিল—লাবণ্যের অন্তরাত্মা বলিয়া উঠিল—

“আমিও ভালবাসতে পারি—এতোদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি।”

লাবণ্যের প্রথম যৌবনে শোভনলালের কুণ্ঠিত-প্রেম তাহাকে নাড়া দিয়াছিল—আজ অমিতের স্পর্শে লাবণ্যের প্রেম-দেবতা জাগ্রত হইয়া শোভনলালের অপেক্ষায় দিন গুনিতে লাগিল। লাবণ্য নিজের জীবনে অমিতের প্রেমকে

পাইয়া শোভনলালকে চিনিতে শিখিল। এ যেন অমিতের বাতাসে লাবণ্য বিকশিত হইল শোভনলালের অর্চনায় উৎসর্গীকৃত হইবার জন্য, নারীর অন্তরের ইহা একটি বিশেষ রহস্য।

লাবণ্য অমিতের বনে মধু আহরণ করিল, কিন্তু শোভনলালের জন্য নিজেকে গোপনে সযত্নে গচ্ছিত রাখিল। কিন্তু অমিতকে সে কখন বঞ্চিত করে নাই। লাবণ্য নিজের প্রেমের নেশায় অমিতকে বলিয়াছে—

'মিতা, বৃষ্টির শব্দে সমস্ত দিন তোমার পায়ের শব্দ শুনেছি, মনে হয়েছে কত অসম্ভব দূর থেকে যে আসচো, তার ঠিক নেই। শেষকালে তো এসে পৌঁছালে আমার জীবনে।'

কিন্তু লাবণ্য বলিতে ভোলে নাই—

"যদি একদিন চলে যাবার সময় আসে, তবে তোমার পায়ে পড়ি, যেন রাগ করে চলে যেয়ো না।"

লাবণ্য অমিতকে প্রেম দিয়াছে, শোভনলালকে প্রাণ দিয়াছে—দুইজনকে ভালবাসিয়াছে, কিন্তু কোথাও সে নিজেকে সংকুচিত করে নাই, কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাই লাবণ্য অমিতের বুকে মাথা রাখিয়া বলিতে পারিয়াছিল—

"তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরের সম্বন্ধ, তা নিয়ে লেশমাত্র দায় নাই। আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন। বাইরের রেখা, বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।"

আর শোভনলালকে লাবণ্য লিখিতে পারিয়াছিল—

"তুমি আমার সকলের বড় বন্ধু। আজও তোমার যা দেবার জিনিস, তাই দিতে এসেচো কিছু দাবি না করে। চাইনে বলে ফিরিয়ে দিতে পারি, এমন শক্তি নেই আমার, এমন অহংকারও নেই।"

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, একই নারী দুইজন পুরুষকে নিবিড়ভাবে ভালবাসিতে পারে কি না। লাবণ্য এই সত্য প্রমাণ করিয়াছে যে, মানুষের অন্তরে ভালবাসার সীমানা নাই; সে সমানভাবে আলোর মত ছড়াইয়া পড়ে —তেমনি স্বচ্ছ, তেমনি শুভ্র। প্রেম কোন বেচা-কেনার প্যাক্ করা মাল নয় যে, একহাটে একজনের কাছে বিক্রি করিলে আর একজনকে নিঃস্ব হইয়া চলিয়া যাইতে হয়। অথবা কোন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নয় যে, একজনের কাছে মর্টগেজ রাখিলে অপরের দাবি চলিয়া যাইবে। রক্ত-মাংসের উত্তাপে যে-প্রেম বাড়িয়া উঠিয়াছে, সে হাওয়ায় উবিয়া যায় না, কাহারও আঘাতে

খেৎলাইয়া যায় না—তাহাকে গলাইয়া জীবনপথে সোহাগের মালা রচনা করিয়া কাহাকে উপহার দিলে প্রেমের প্রাণ-ধর্ম নষ্ট হয় না। লাবণ্যের প্রেমে ভোগ-বিলাস নাই, তাই সে-প্রেম অমলিন; লাবণ্যের প্রেম স্বতঃ-প্রণোদিত, তাই তাহা অসংগত নয়; লাবণ্যের প্রেম নিজের সসীম জীবনকে অসীমতায় ব্যাপ্ত করিবার জন্য, তাই তাহা মহৎ; লাবণ্যের প্রেম-শক্তি ঐশ্বর্যদায়িনী, তাই তাহা মহিমময়ী।

লাবণ্য ক্ষণকালের মায়ারূপে অমিতের কাছে দেখা দিল, কিন্তু সেই ক্ষণকাল তাহাদের জীবনে চিরশাশ্বত। লাবণ্য ক্ষণিকের চিরস্থায়িত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছিল—

"যতদিন পারি, না হয় ওঁর (অমিতের) সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হয়েই থাকবো। কেবল ওইটুকু দেখা চাই যে, সেইটুকু সময় যেন ব্যর্থ না হয়ে যায়।"

এই ক্ষণকালকে চিরকালের সঞ্চয় করিবার মত ঐশ্বর্য লাবণ্য দেবীর ছিল—ছিল বলিয়া তাহার প্রেমে কোন অসংগত দাবি ছিল না এবং অমিতকে সরলভাবে বলিতে পারিয়াছিল—

"একদিন একজনকে যে আংটি পরিয়েছিলে, আমাকে দিয়ে আজ সে আংটি খোলালে কেন?"

লাবণ্য যেদিন বুঝিতে পারিল যে, অমিত লাবণ্য-এপিসোডের জন্য তাহার সমাজের লোকের কাছে কুণ্ঠিত, সে যেদিন জানিতে পারিল যে অমিত যৌবনের কোন উচ্ছল মুহূর্তে কোন তরুণীর কাছে নিজের প্রেম নিবেদন করিয়াছিল, সে অকুণ্ঠিতভাবে অমিতকে ছুটি দিল, কঠিনভাবে নিজেকে কোটরে গুটাইয়া নিল—বুক তার অভিমানে রঙিন হইয়া উঠে নাই, মুখ ব্যথায় বিবর্ণ হয় নাই। জীবন-বন্ধনে যখন জট পড়ে, তখন জীবনের ভার ভয়াবহ হয় বলিয়াই লাবণ্য নিজের প্রেমে মহীয়সী হইয়া আত্মস্থ হইল—নিজের মনকে পরের হাতে দিয়া হেঁচকা টান দিতে সে লজ্জা বোধ করিল। লাবণ্য নারী-সুলভ ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে তাহার প্রেমকে কলঙ্কিত করিল না। লাবণ্য দেবীরা করেন সৃষ্টি, জীবনে তাঁরা দেন তৃপ্তি, সংসারে তাঁরা ঢালেন প্রীতি—কল্যাণময়ী তাঁরা, ঐশ্বর্যবতী তাঁরা, পুরুষের জীবনে তাঁরা করেন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, তাঁদের প্রেম-বন্যা পার্শ্বস্থ ভূমিকে উর্বর করে। এঁদের প্রেমে ধ্বংসলীলা নাই। তাই লাবণ্যের বিদায়-বাণী ছিল সুস্পষ্ট; সেখানে সে অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া

অমিতের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল শোভনলালকে নিজের জীবনে নিবিড়-ভাবে পাইবার জন্য। সেই বিদায়-বাণীতে লাবণ্য প্রস্ফুটিত, সেই বিদায়-চিঠিতে লাবণ্যের অকথিত বাণী প্রচারিত। অন্তরে তাহার ফাঁকি ছিল না বলিয়াই অমিতকে লাবণ্য দেবী লিখিতে পারিয়াছিল—

'মোর লাগি করিও না শোক,
আমার র'য়েছে কর্ম আমার র'য়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিব পূর্ণ ; এই ব্রত বহিব সদাই।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি' কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সে-ই ধন্য করিবে আমাকে।

** ** **

তোমারে যা' দিয়েছিনু তা'র
পেয়েছো নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডুষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হ'তে মম।
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা' দিয়েছিনু সে তোমারি দান ;
গ্রহণ করেছো যত, ঋণী তত ক'রেছো আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।'

লাবণ্য দেবীর নিজের কথাকে অবিশ্বাস করিবার শক্তি আমার নাই, অশ্রদ্ধা করিবার ঔদ্ধত্যও আমার নাই।

যোগাযোগ

'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুদিনী একটি অপূর্ব সৃষ্টি। কুমুদিনী প্রিয়া নয়, মাতা নয়—সে নারী। শেষের কবিতার লাবণ্যের মত কুমুদিনী উচ্চ-শিক্ষিতা নয়, ঘরে বাইরের বিমলার মত পুরুষের স্থূল আকর্ষণ তাহাকে টানে নাই, চোখের বালির বিনোদিনীর মত পুরুষের মন লইয়া খেলা করিতে

অগ্রসার হয় নাই—নৌকাডুবির কমলার সরলতা থাকিলেও কুমুদিনী তেজস্বিনী, গোরা উপন্যাসের সুচরিতার আত্মসমর্পণ থাকিলেও কুমুদিনী ভিন্ন মাল-মসলায় গঠিত। কুমুদিনী নারী—সে তাহার দাবি চায় নিজের অধিকারে, পরের অনুগ্রহে নয়। সে স্বামীকে গ্রহণ করিয়াছিল সেবা করিতে, ভক্তি করিতে, কিন্তু সেখানে ক্ষুদ্রতা দেখিয়া, সহানুভূতির অভাব দেখিয়া, বেসুরা বাজিয়া উঠিল। কুমুদিনীকে সুরে বাঁধিয়া না লইলে বড় ওস্তাদও সেই তারে সহজভাবে সংগীত তুলিতে পারিবেন না—তাল কাটিয়া যাইবে। কুমুদিনীর স্বামী পাকা লোক—সংসারক্ষেত্রে তিনি জয়ী, তাঁহাকে ভয় করে সবাই, সংসারের সব কামনা তাঁহার বশীভূত। কিন্তু কুমুদিনীকে তাহার স্বামী বশ করিতে পারিলেন না, কারণ কুমুদিনীকে প্রকৃত সুরে বাঁধিয়া লয়েন নাই। সুকণ্ঠ গায়ক যেমন ওস্তাদ বীণকারের নৈপুণ্য অর্জন করিতে চাহে না, পাছে বীণার ঝংকার তাহার কণ্ঠের মাধুর্যকে নষ্ট করিয়া দেয়, তেমনি মধুসূদন তাঁহার স্ত্রী কুমুদিনীর হৃদয়-বীণায় একান্তে নিষ্ঠাবান সেবকের মতন সশ্রদ্ধভাবে ঝংকার তুলিয়া নিজেদের জীবনে সংগীত সৃষ্টি করিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে চাহিলেন না—কারণ তাঁহার আশঙ্কা যে, তাহাতে তাঁহার পৌরুষ ও প্রভুত্ব আহত হইবে। কুমুদিনী দেখিতে সুন্দরী, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "লম্বা ছিপ্‌ছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড; চোখ বড় না হোক, একেবারে নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরী। রঙ শাঁখের মত চিকন গৌর; নিটোল দুখানি হাত; সে-হাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হয়ে গ্রহণ করতে হয়। সমস্ত মুখে একটি বেদনার সকরুণ ধৈর্যের ভাব।" কুমুদিনী নিজের জন্য সঙ্কুচিত—কারণ তাহার বংশের দুর্গতির জন্য সে নিজেকে অপরাধী মনে করে। কিন্তু কখন সে নিজেকে সংকীর্ণ করিতে প্রস্তুত নহে। তাই রাজার ঘরে বিবাহ হইল, স্বামীর কাছে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করিবে ভাবিয়া সে স্বামীর গৃহে আসিল। কিন্তু উৎসর্জন হইল না। যে-আলো ও বাতাসে কুমুদিনী বিকশিত হইতে পারে, সে-আলো বাতাসের স্বামীর গৃহে অভাব ছিল; অন্তরের যে উত্তাপে কুমুদিনী গলিয়া গলিয়া সংসারকে পূর্ণ করিতে চাহে, সেই উত্তাপ স্বামীর গৃহে কুমুদিনী পাইল না। সে দুঃখকে ভয় করে না—তাই বিরুদ্ধতা ও ক্ষুদ্রতা দেখিয়া সে নিজেকে গুটাইয়া লইল। কুমুদিনীর অন্তরের দুয়ারে মধুসূদন শিকল নাড়িলেন, আঘাত করিলেন, কিন্তু দুয়ার খুলিতে পারিলেন না। চাবির সন্ধান মধুসূদন

জানিতেন না। আঘাত করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, কিন্তু মিলিত হইতে হইলে সেই ভাঙ্গা দুয়ার দিয়া প্রবেশ করিলে প্রেমের আলো সেখানে গিয়া পৌছিতে পারে না—অন্ধকারে মিলন-ঘটা সম্ভব হয় না।

একদা কুমুর মূর্ছা যাওয়াকে ব্যঙ্গ করিয়া মধুসূদন বলিয়া উঠিলেন—

'আমি কাজের লোক, সময় কম, হিস্‌টীরিয়াওয়ালী মেয়ের খেদ্‌মদ্‌গারী করবার ফুরসৎ আমার নেই, এই স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।'

কুমু ধীরে ধীরে বলিল—

"তুমি আমাকে অপমান করতে চাও? হার মানতে হবে। তোমার অপমান মনের মধ্যে নেব না।"

মধুসূদন অবাক হইল—কুমু স্বামীকে গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়াছে, সে আঘাত দিতে আসে নাই। তাই সে বলিল—"দেখো, নিষ্ঠুর হও তো হোয়ো, কিন্তু ছোট হোয়ো না।"

নিষ্ঠুরতাকে কুমু সহ্য করিতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্রতাকে পারে না। কুমু স্বামীকে বড় বলিয়াই জানে এবং বড়ো জানিয়াই সে নিজেকে আত্মদান করিতে চায়। মধুসূদন ভাবিল, কুমু আসিয়াছে টাকার লোভে এবং সে জয় করিবে ঐশ্বর্যের জোরে। এই ভুল বুঝিয়াই মধুসূদন আঘাত দিতে আরম্ভ করিল এবং এই ভুলের উপরই সংঘাত গড়িয়া উঠিল।

যে কাঠুরিয়া গাছ কাটিতে জানে, সে গাছ পায় না, কাঠ পায় এবং যে মালী গাছকে রাখিতে জানে, সে পায় ফল, পায় ফুল। মধুসূদন কাঠুরিয়া—সে হুকুম করিতে শিখিয়াছে, আদর কবিতে নয়। কুমু হুকুম মানিতে প্রস্তুত, কিন্তু হুকুমওয়ালার কাছে ধরা দিতে রাজী নয়। কুমুদিনী নিজেকে বিকাইবে ভালবাসার কাছে; সে দাবিকে গ্রহণ করিবে, প্রভুর আদেশকে নয়। কুমু তাহার স্বাতন্ত্র্য চায়—যদি সে স্বাধীনতা না পায়, দাসী হইয়া থাকিবে, কিন্তু হৃদয়-মন্দিরের দ্বার থাকিবে রুদ্ধ। মধুসূদন ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলে—'বড় বৌ, তোমার মন কি পাথরে-গড়া?' মধুসূদন জানে না যে, কুমুর মন শাসন করিয়া পাওয়া যায় না, ভালবাসিয়া জয় করিতে হয়। মধুসূদন মাঝে মাঝে ভালবাসার ডাকের সাড়া অন্তরে পাইয়াছে, কিন্তু ব্যাবসাদারীর মন বেশিক্ষণ সেই ডাক শুনিতে পায় না—শুনিলেও সেই আহ্বানের আকর্ষণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিতে পারে নাই। কুমু জানে যে, স্বামীকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে না-পারাটা মহাপাপ; নারীদের একমাত্র লক্ষ্য হইল সতী সাবিত্রী হইয়া ওঠা।

তবুও কুমু স্বামীর কাছে ধরা দিতে পারিতেছে না, কারণ কুমু শুধু সাধারণ গৃহিণী হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে না। সে স্বামীর কাছে অনেক কিছু চায়, কারণ সে স্বামীকে অনেক কিছু দিবে। কিন্তু কুমুর মূল্য মধুসূদন বুঝিতে পারিল না এবং বুঝিতে পারিলেও সেই দাম দিতে স্বীকৃত হইল না। তাই চলিল সংঘাত। কুমুর প্রাণের কথা হইল এই—

"জানি, স্বামীকে এই যে শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে পারছিনে, এ আমার মহাপাপ। কিন্তু সে পাপেও আমার তেমন ভয় হচ্ছে না, যেমন হচ্ছে শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণের গ্লানির কথা মনে করে।"

এই শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণকে কুমু ঘৃণা করে—তাই এত সমস্যা, এত দুঃখ; এই শিক্ষা কুমু শিখিয়াছিল তাহার দাদা বিপ্রদাসের নিকট হইতে। কুমু বিপ্রদাসের কাছে শিক্ষালাভ করিয়াছে—তাহাকে ভালবাসিয়াই সে মানুষ হইয়াছে। বিপ্রদাস ও 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ—এক ধাতের মানুষ। নিখিলেশ বলিয়াছে—

"এই বিশ্ববস্তুর পর্দার আড়ালে আমার অনন্তকালের প্রেয়সী স্থির হয়ে বসে আছে। কত জন্মে, কত আয়নায় ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি দেখলুম—কত ভাঙা আয়না, বাঁকা আয়না, ধুলোয় অস্পষ্ট আয়না। যখন বলি আয়নাটা আমার করে নিই, বাক্সর ভিতর ভরে রাখি, তখন ছবি সরে যায়। থাক্ না, আমার আয়নাতেই বা কি, আর ছবিতেই বা কি। প্রেয়সী, তোমার বিশ্বাস অটুট রইল, তোমার হাসি ম্লান হবে না, তুমি আমার জন্যে সীমন্তে যে সিঁদুরের রেখা এঁকেছ, প্রতিদিনের অরুণোদয় তাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে রাখচে।"

বিপ্রদাস বলিয়াছে—

"আমি দেখতে পাচ্ছি, মেয়েদের যে অপমান, সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, সে কোন একজন মেয়ের নয়।······সহ্য করা ছাড়া মেয়েদের অন্য কোন রাস্তা একেবারেই নেই বলেই তাদের উপর কেবলি মার এসে পড়ছে। বলবার দিন এসেছে যে, সহ্য করব না।······কুমুকে যিনি গড়েছেন তিনি আগাগোড়া পরম শ্রদ্ধা করে গড়েছেন। কুমুকে অবজ্ঞা করে, এমন যোগ্যতা কারো নেই।"

বিপ্রদাস ও নিখিলেশ একই মন্ত্রের শিষ্য—সমাজের বদ্ধতাকে দুইজনেই ভাঙিতে চাহিয়াছেন। কুমু প্রাণপণ স্বামীকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে,

কারণ সে বিশ্বাস করে—"সংসারকে দুই হাতে জড়িয়ে নিতে হবে বলেই আমাদের সৃষ্টি। তাই আমরা গাছকেও আঁকড়ে ধরি, শুক্‌নো কুটোকেও। গুরুকেও মানতে আমাদের যতক্ষণ লাগে— ভণ্ডকে মানতেও ততক্ষণ। জাল-যে আমাদের নিজের ভিতরেই।"

এই কথা কুমু বিশ্বাস করিলেও নিজের সম্মান খর্ব করিয়া সে স্বামীর গৃহে যাইতে সম্মত হইল না। কুমু ভাবিল—"মস্ত এই পৃথিবী, এর মধ্যে কোন এক জায়গায় আমারো একটুখানি ঠাঁই হোতে পারবে। জীবনে অনেক যায় খসে, তবুও কিছু বাকী থাকে।" কিন্তু কুমু যেদিন জানিল যে, সে তাহার স্বামীর অনাগত বংশধরের মা, তখন বুঝিল যে, স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণ না করিলেও তাহার স্বামীর গৃহের বন্ধন স্বীকার করিতে হইবে। তাই স্বামীর গৃহে যাইবার পূর্বে কুমু তাহার দাদা বিপ্রদাসকে বলিল—

"আমাকে ওরা ইচ্ছে করে দুঃখ দিয়েছে, তা মনে করোনা। আমাকে সুখ ওরা দিতে পারে না, আমি এম্‌নি করেই তৈরী। আমিও তো ওদের পারব না সুখী করতে। সমাজের কাছ থেকে অপরাধের সমস্ত লাঞ্ছনা আমিই একলা মেনে নেব, ওদের গায়ে কোনো কলঙ্ক লাগাব না। কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব ; চলে আসবই, এ তুমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড়ো বৌ, তার কি কোন মানে আছে যদি আমি কুমু না হই?" *

---

* কুমুর দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা Ibsen-রচিত Doll's House-এর Nora-র মত। নোরার স্বামী প্রশ্ন করিল—Have you not been happy here? নোরা উত্তর দিল—No, never. I thought I was, but I never was. স্বামী শাসনের চোখে বলিল—Before all else you are wife and mother. নোরা বলিল—That I no longer believe. I believe that before all else I am a human being. Just as much as you are, or at least I should try to become one. নোরা বলিতে কুণ্ঠাবোধ করিল না—I must make up my mind which is right. Society or I. নোরার উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কুমুর না থাকিলেও সে নোরার মতই বলিয়া উঠিল যে, সে ওদের বড় বৌ, তার কি কোন মানে আছে যদি সে কুমু না হয়। নিজেকে অনুসন্ধান করিয়া কুমু নিজেকে আবিষ্কার করিবে—সমাজের চোখ রাঙানিতে নয়। ঘরে বাইরের বিমলা যাহা করিতে সাহস করিল না, যোগাযোগের কুমুদিনী তাহা করিতে অগ্রসর হইল—তাহার নারীত্বের সম্মান প্রতিষ্ঠা করা ; এ বিদ্রোহ সমাজের বিরুদ্ধে, নারীর প্রকৃতির বিরুদ্ধে বলিয়া ভাবিবার কারণ নাই। কুমুদিনীর যথার্থ প্রেম আছে বলিয়াই সে অতবড় কঠিন কথা বলিতে পারিয়াছে।

এই কয়টি কথার ভিতর কুমু পাঠকের কাছে নিজের পরিচয় দিয়াছে এবং তাহার স্বামীর পরিচয়ও দিয়াছে। সংসারে একঘাটে যখন এবংবিধ বিরুদ্ধ চরিত্রের দেখা হয়, তখন এরকম ট্রাজেডি হওয়া ব্যতীত উপায় নাই, যদিচ রবীন্দ্রনাথ ভাবী বংশধরের আগমনবার্তা জানাইয়া বিরোধকে চাপা দিয়াছেন মাত্র। কুমুর মত মেয়েকে গ্রহণ করিতে হইলে গ্রহণ করিবার যোগ্যতা অর্জন করা চাই—এই কথাটা মধুসূদনের জানা ছিল না বলিয়াই কুমুর এত বিদ্রোহ, নতুবা কুমু বিদ্রোহ করিবার মেয়ে নয়, প্রাণের সঙ্গে সমস্ত কিছু গ্রহণ করিবার জন্যই সে প্রস্তুত ছিল। প্রথমেই সুর কাটিয়া গেল, তাই কুমু প্রাণহীন পুত্তলিকার মত সংসার-মজলিসে রহিয়া গেল, তালহীন গানের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করিতে পারিল না।

দুই বোন

"দুই বোন" উপন্যাসে শর্মিলা ও ঊর্মিমালা দুই ভগ্নী। শর্মিলার অতি-লালনের আওতায় তাহার স্বামী সাংসারিক বিষয়ে হইয়াছে অসাবধান। স্ত্রীর সতর্ক যত্নে ও রক্ষণে শশাঙ্ক চাকরিতে উন্নতি লাভ করিয়া চলিল এবং তাহাতে যখন বাধা পড়িল, তখন চাকরি ছাড়িয়া ব্যাবসায়ে উন্নতি করিল। গৃহে সস্নেহ দৃষ্টি— বাহিরে ব্যাবসায়ে উন্নতি। শশাঙ্কের জীবন সহজ গতিতে চলিতে লাগিল। এমন সময় ঊর্মিমালার সঙ্গে শশাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিবার সুযোগ ঘটিল। তার চোখে ঘোর লাগিল, মন আবিল হইয়া উঠিল, শশাঙ্ক ঊর্মিকে নিকটে পাইয়া ব্যাবসা ছাড়িল। বাহিরের ঐশ্বর্য হারাইতে লাগিল, কিন্তু ঊর্মির সংস্পর্শে আসিয়া শশাঙ্কের অন্তরে নানা রঙের খেলা চলিল। যে ইট-কাঠ ছাড়া খবর রাখিত না, সেই শশাঙ্ক বাগানে সূর্যমুখী কী রকম ফুটিয়াছে, তাহা দেখাইতে গিয়া হঠাৎ ঊর্মির হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—

"তুমি নিশ্চয় জানো, তোমাকে আমি ভালবাসি। আর তোমার দিদি, তিনি তো দেবী, তাঁকে যত ভক্তি করি জীবনে আর কাউকে তেমনি করিনে। তিনি পৃথিবীর মানুষ নন, তিনি আমাদের অনেক উপরে।"

সংসারে এই দুই রকম রমণী আছে—একজন মায়া সৃষ্টি করে, আর একজন স্নেহ, ভালবাসা দান করিয়া আমাদের শ্রদ্ধা দাবি করে। মায়াবিনীর সংস্পর্শে আসিলেই মানুষের চোখে ঘোর লাগে, মানুষের ভিতরকার শিল্পী

জাগিয়া উঠে। শর্মিলা শশাঙ্কের কাছে দেবী—তাহার কাছ হইতে সে সবই পায়, কিন্তু সেই মায়ার স্পর্শ লাভ করে না। তাই স্ত্রী শর্মিলার কাছ হইতে সব পাইয়াও শশাঙ্ক বুঝিল যে, কোথায় ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। শ্যালিকা উর্মি সেই শূন্যতা ভরিয়া দিল—শর্মিলার কাছে এতদিন যাহা পাইয়াছে, তাহার মূল্য শশাঙ্ক ভুলিয়া গেল। এই শূন্যতা যে-নারী ভরিয়া দিতে পারে না, সে সব দিলেও পুরুষকে জাগাইতে পারে না। এই জাগরণ না হইলে হয়তো শশাঙ্কর কিছু ক্ষতি হইত না, কিন্তু এই জাগরণের মন্ত্র যে-নারী আয়ত্ত করিয়াছে, সে পুরুষের কাছে বিজয়িনী। পুরুষ তখন তাহার নিকট হইতে কি পাইল না, তাহার হিসাব রাখিতে পারে না—সে বেহিসাবী হইয়া ছুটিয়া যায়। বর্ষা ঋতু শুধু শুষ্কতাই দূর করে—বসন্ত ঋতুর মতন রক্তে চাঞ্চল্য আনিতে পারে না। যে-মেয়ে পুরুষের অন্তরে ঝংকার তুলিতে পারে না, তাহার সব থাকা সত্ত্বেও এবং সব দেওয়া সত্ত্বেও মনে হয়, তাহার নিকট হইতে তেমন কিছু পাওয়া যায় নাই। এই সত্যটাই 'দুই বোন' উপন্যাসে ঘোষিত হইয়াছে।

মালঞ্চ

"দুই বোন" ও "মালঞ্চ" একই সুরে বাঁধা, দুই বোন-উপন্যাসে শশাঙ্ক শর্মিলার নিকট হইতে স্ত্রীর সব কিছু পাইয়াও শর্মিলার বোন উর্মিমালার সংস্পর্শে আসিয়া নূতন আনন্দে, নূতন রসে জাগিয়া উঠিল—সেই আনন্দ, সেই রস তাহার ভিতর সুপ্ত ছিল। উর্মিমালা যখন ধীরে ধীরে শর্মিলার স্বামীকে নূতন নেশায় অভিভূত করিতে লাগিল, রোগ-শয্যায় শর্মিলা তাহার জন্য অনেক কাঁদন কাঁদিল, নিজেকে শক্তিহীন ভাবিয়া নিজের কপালে করাঘাত করিল, উর্মিমালার সমস্ত ব্যবহারকে সন্দেহের চোখে দেখিয়া নিজের বেদনা আরও বাড়াইয়া তুলিল। শশাঙ্ক তাহার স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাবান, কিন্তু উর্মিমালার আবেদনকে অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। উর্মিমালা সবই বুঝিল—শশাঙ্ককে মুক্তি দিতে চেষ্টা করিল বিলাত রওনা হইয়া।

নারী যখন নিজের উপর বিশ্বাস হারায়, যৌবনের প্রান্তে আসিয়া পৌছায়, সে তখন তাহার স্বামীকে বন্দী করিয়া রাখিতে চায়। কারণ সে জানে, যে জোরে সে স্বামীকে টানিয়া রাখিবে, তাহা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে—তাই

কৌশলের আশ্রয় লইতে হয়, অযথা সন্দেহ প্রকাশ করিতে হয় এবং স্বামীর সহজ ও স্বাধীন গতিকে নানাভাবে বেড়া দিয়া বাঁধন সৃষ্টি করিতে হয়। শর্মিলা তাহাই করিয়াছিল—কিন্তু বেড়ার বাঁধনকে মানুষের অন্তর স্বীকার করে না। মালঞ্চ-উপন্যাসে নীরজা তাহাই করিয়াছে। নীরজা আদিত্যের স্ত্রী—স্ত্রীর প্রেমে আদিত্য মুগ্ধ। মৃত-সন্তান প্রসবের পর নীরজা অসুস্থ হইল। বাড়ীতে আসিল সরলা—আদিত্যের এক দূরসম্পর্কীয় বোন। নীরজার মনটা ছ্যাক করিয়া উঠিল—রোগশয্যা হইতে সে যেন বুঝিতে পারে যে, তাহার স্বামী সরলাকে সঙ্গে লইয়া বাগানের কাজ করিতেছে। ফুলের ব্যাবসা ছিল আদিত্যের। সন্দেহের বিষে নীরজা ভরিয়া উঠিল। একদা নীরজা স্বামীকে অভিযোগের সুরে জানাইল যে, সরলা যে তাহার সংসারে এতখানি স্থান করিয়া লইয়াছে, তাহার কারণ আদিত্য সরলাকে ভালবাসে। আদিত্য সরলাকে ছাড়িতে গিয়া দেখিল যে, সে সরলাকে ভালবাসে। একথা আদিত্য বুঝিতে পারিল যে, যদি তাহার জীবনের কেন্দ্র হইতে, কর্মের ক্ষেত্র হইতে সরলাকে সরাইয়া দেয়, তাহা হইলে সেই নিঃসঙ্গতায়, সেই নীরসতায় তাহার জীবনের সমস্ত রস নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহার কাজ পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইবে। তাই আদিত্য সরলাকে বলিতে পারিল—

'সেই সহজ সম্বন্ধের তলায় গভীর ভালোবাসা ঢাকা ছিল, জানতে পারিনি, সে কি আমাদের দোষ ? ···আজ সেই কথাটা যদি যদি গোপন করি তাহোলেই মিথ্যাচরণের অপরাধ হ'বে। আমি মুখ তুলেই বলব।'

জীবনের প্রথমাবধি সরলা ও আদিত্য একত্রই লালিতপালিত হইয়াছিল। সেই সম্পর্কের অন্তরালে তাহাদের মনের মধ্যে অলক্ষ্যে গিঁট লাগিয়া গিয়াছিল—কেহই বুঝিতে পারে নাই। নীরজার অভিযোগ শুনিয়া আদিত্য যখন ঠিক করিল যে, সরলার বন্ধন ছাড়াইতে হইবে, তখন গ্রন্থি আলগা করিতে গিয়া দেখিল যে, তাহা অটুট হইয়া লাগিয়া গিয়াছে। সেই কথাটাই আদিত্য মুখ তুলিয়া বলিতে চাহে। আদিত্য বুঝিয়াছে যে, সরলা না থাকিলে তাহার জীবন ব্যর্থ হইবে। তবে কি এতকাল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে ? তাহা নয়—নীরজা তাহাকে শান্তি দিয়াছে, আনন্দ দিয়াছে, আদিত্য সমস্ত প্রাণ দিয়া ভোগ করিয়াছে। কিন্তু সরলার বন্ধনকে অস্বীকার করিতে গিয়া বন্ধনে আটক পড়িয়া গেল। তাই নীরজার অভিযোগের পর সরলার হাত চাপিয়া আদিত্য বলিল—

"উদ্ধারের পথ নেই, সে পথ আমি রাখব না, ভালবাসি তোমাকে। একথা

আজ এত সহজ করে, সত্য ক'রে বলতে পারছি এতে আমার বুক ভরে উঠেছে। তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় ফুটে উঠেছে। আমি বলছি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম।"

নীরজা সরলাকে ক্ষমা করিতে পারিল না—তাহার অন্তরে এতটা ঐশ্বর্য ছিল না যে নিজের হাতে মৃত্যুর সময় স্বামীকে সরলার হাতে নিশ্চিন্ত মনে দিয়া যাইতে পারে। মৃত্যুর সময়ও নীরজা সরলার উদ্দেশে বলিয়া উঠিল—"জায়গা হবে না তোর, রাক্ষসী, জায়গা হবে না।" আদিত্য সরলাকে অন্তরে স্থান দিল। সরলা আদিত্যকে বলিল—

'আমার হয়ে এই ব্রতটি তুমি নাও। দিদির জীবনান্তকালের শেষ ক'টা দিন দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ ক'রে। একেবারে ভুলিয়ে দাও যে, আমি এসেছিলেম ওঁর সৌভাগ্যের ভরা-ঘট ভেঙে দেবার জন্যে।'

আদিত্য বলিল—

'তুমি যা বলছ তা নেব এবং সেটা বিনা ত্রুটিতে পালন করা সম্ভব হবে যদি নিশ্চিত জানি একদিন তুমি পূর্ণ করবে আমার সমস্ত শূন্যতা।'

সরলা রাজী হইল। 'দুই বোন'-উপন্যাসে লেখকের যে-সঙ্কোচ ছিল, তাহা মালঞ্চ-উপন্যাসে ভাঙ্গিয়া গেল। 'দুই বোন'-এ শশাঙ্ক ভালবাসিয়াছিল স্ত্রীর ভগ্নী উর্মিমালাকে, জীবনকে সার্থক করিবার জন্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইল—লেখক প্রস্তুতির সংবাদ দিলেন, কিন্তু গ্রহণ করিবার পক্ষে অন্তরায় ঘটাইলেন। মালঞ্চ-উপন্যাসে আদিত্য নিজের দূর সম্পর্কীয় বোনকে ভালবাসিলেন এবং জীবনে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। এখানে লেখক গ্রহণের ব্যাপারটা ঘটাইলেন আদিত্যের স্ত্রীর মৃত্যুর পর। নারীর সংস্পর্শে পুরুষের অন্তর যখন বিকশিত হয়, তখন সংস্কার, সামাজিক বন্ধন, এমন কি স্ত্রীর ভালবাসা সবই ভাসিয়া যায়, এবং কে কাহাকে দেখিয়া জাগিয়া উঠিবে, সংসারে তাহার কোন ফর্মুলা নাই বলিয়াই জীবনের প্রতিপদক্ষেপে এত অনিশ্চয়তা, এত সংশয়, এবং এত রস; পুরুষকে এখানে ভ্রষ্ট বা দ্বৈতবাদী বলিলে ভুল হইবে। জীবন রক্তমাংসের বলিয়াই মানুষ আঁকা পথে চলে না—চলার পথে পথে এত বাঁক থাকে।

চার অধ্যায়

নারী মায়াবিনী বটে—সে পুরুষকে ভোলায়, কিন্তু সে নিজের কাছেও কম অসহায় নয়। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে এলা ভাবিল যে, সে সমাজের নয়, দেশের। এলা সুন্দরী—হাতীর দাঁতের মত গৌরবর্ণ, শরীরটি আঁটসাঁট। বহু বিবাহের প্রস্তাব আসিল—এলা প্রত্যাখ্যান করিল, কারণ সে কোন ব্যক্তি-বিশেষের নহে, দেশের মঙ্গলের জন্য সে উৎসর্গীকৃত। দেশের কাজে সে বাহির হইল। নিজের শক্তির গর্বে সে চঞ্চলতা জয় করিয়াছে, কিন্তু এই দেশসেবকের ভিড়ে আসিয়া এলার একটি যুবকের সঙ্গে পরিচয় ঘটিল। সেই যুবকের সান্নিধ্যে আসিয়া মনের চঞ্চলতা জয় করিবার গর্ব সে হারাইল। এলা আটাশ বৎসরের যৌবনের কাছে দুর্বল হইল অতীনের সন্ধান পাইয়া। যে-এলা বাংলা মঙ্গলকাব্য ও চসারের কাব্যের তুলনা করিয়া থিসিস্ লিখিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, যে এলা তাহার কাকাকে বলিয়াছিল, আমি কাজ পেয়েছি, কাজ করতেই যাব—সেই এলা দেশের কাজের প্রাঙ্গণে আসিয়া অতীনকে বলিল—

"ভুলিয়ে তুমি সেইখানে নিয়ে যাও, যেখানে তোমার আপন বিশ্ব আপন অধিকার।"

অতীন দেশের কাজে নামিয়াছিল এলার ভুজ-মৃণালের জোরে। কিন্তু তবুও সেই কাজে নামিয়া দেখিল যে, সেই পথ ক্ষুরধারের মত সংকীর্ণ, সেইখানে দুই জনে পাশাপাশি চলিবার জায়গা নাই। এলা নিজেকে সমর্পণ করিল অতীনের কাছে—অতীন ডুবিল এলার মহামায়ায়। অতীন বলে—

"কী আশ্চর্য স্বর তোমার কণ্ঠে, আমার মনের অসীম আকাশে ধ্বনির নীহারিকা সৃষ্টি করে।"

এলা ও অতীনের শেষ চুম্বন অফুরন্ত রহিল। এই চুম্বনেই এলা ও অতীন নিজেদেরকে ধরা দিল—ইহাকে এড়াইবার জন্য যত চেষ্টা ও কৌশল চলিয়াছে, তাহাই মিথ্যা। এলা ধরা দিল—অতীন ধরিতে চাহিল না, যদিও সে নিজেকে ধরা দিতে কুণ্ঠাবোধ করিল না। অতীনের ভীরুতার জন্য তাহাদের ইহলোকে মিলন হইল না। দেশ-সেবার প্রাঙ্গণে আসিয়া এই দুইটি নর-নারীর মন-দেয়া-নেয়া 'চার অধ্যায়' উপন্যাসকে সরস করিয়াছে। এলা ও শরৎচন্দ্র প্রণীত 'পথের দাবী'র ভারতী—দুইজনেই

কাঁচা—কর্মক্ষেত্রে ও প্রেমরাজ্যে। দুই জনেই দেশসেবার দুর্গম পথে বাহির হইল এবং সেই পথে চলিতে চলিতে ভালবাসার ফাঁদে পড়িল। ভালবাসাকে পরখ করিয়া লইবার সুযোগ ও ধৈর্য তাহাদের হইল না—কারণ তাহারা ভালবাসার জালে ধরা পড়িল এবং ধরা দিল। তাহারা কাঁচা বিদ্রোহিনী এবং রোমান্টিক নায়িকা, যদিও প্রথম দৃষ্টিতে তাহাদিগকে কঠিন বলিয়া মনে হয়। এলা-জাতীয় নারীরা গুপ্তসমিতি ভাঙ্গে, গড়ে না; তাহাদের সাহায্যে সভ্য জুটানো যায়, কিন্তু কাজকে পোক্ত করা যায় না। অথচ তাহারা পুরুষের জীবনে কত মূল্যবান! এলা-সম্প্রদায় যে ব্যক্তির, দেশের নয়—এই কথাটা রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করিয়াছেন 'চার অধ্যায়' গ্রন্থে।

রবীন্দ্র নাট্য-প্রবাহ

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের কাজকে দুই অংশে ভাগ করিয়াছেন—আত্মপ্রকাশ এবং বংশপ্রকাশ; গীতিকাব্যকে আত্মপ্রকাশ এবং নাট্যকাব্যকে বংশপ্রকাশ নাম দিয়াছেন।

লেখকের নিজের অন্তরে একটি মানবপ্রকৃতি আছে, লেখকের বাহিরের সমাজে একটি মানবপ্রকৃতি আছে। লেখকের আত্মপ্রকৃতি ও বাহিরের মানব-প্রকৃতি সম্মিলিত হইয়া নূতন নূতন প্রজার জন্মদান করে। ইহাই বংশপ্রকাশ। কালিদাসের দুষ্মন্ত-শকুন্তলা একান্ত কালিদাসের তাহা কালিদাসের প্রতিকৃতি নয়, কিন্তু তাহাতে কালিদাসের অন্তরজগতের প্রভাব আছে। তাই নাট্যকাব্যে আত্মপ্রকাশ না থাকিলেও আত্মীকরণের প্রচেষ্টা আছে। শেকসপীয়রের সাহিত্য-সন্তানে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও শেকসপীয়রের আত্মপ্রকৃতির অংশ সেই সব চরিত্রে আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন—"ভালো নাট্যকাব্যে লেখকের আত্ম-প্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি এমনি অবিচ্ছিন্ন ঐক্য রক্ষা ক'রে মিলিত হয় যে উভয়কে স্বতন্ত্র করা দুঃসাধ্য।"

শেকসপীয়রের নাট্যকাব্যে শেকসপীয়রকে পাওয়া যায়—"ইয়াগোর প্রতি বিদ্বেষ, ওথেলোর প্রতি অনুকম্পা, ডেসডিমোনার প্রতি প্রীতি, ফলষ্টাফের প্রতি সকৌতুক সখ্য, লিয়ারের প্রতি সসম্ভ্রম করুণা, কর্ডেলিয়ার প্রতি সুগভীর স্নেহ শেকসপীয়রের মানব-হৃদয়কে চিরদিনের জন্য ব্যক্ত ও বিকীর্ণ করেছে।" অর্থাৎ শেকসপীয়র তাঁর নাটকের পাত্রগণকে নিজের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত করিয়া-ছিলেন। শেকসপীয়রের অন্তরে যে-রস ছিল, তাহা তাঁহার নাটকের পাত্র-পাত্রীগণ পান করিয়াছিল। এই মাতৃরস পান না করিলে শেকসপীয়রের নাট্যকাব্য প্রবন্ধ হইয়া উঠিত।

রবীন্দ্রনাথের নাটক আলোচনা করিতে হইলে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি নাটককে সাহিত্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। একথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ এক শক্তিমান অভিনেতা ছিলেন এবং নাটক প্রযোজনায় তাঁহার নিপুণতা ছিল। তবুও তিনি নাটককে রঙ্গমঞ্চে সার্থক করিবার জন্য কাহিনী ও ঘটনার দ্বন্দ্বকে প্রধান স্থান দেন নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, নাটক সাহিত্যের অঙ্গ।

রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করিবার জন্য তিনি তাঁহার নাটকের সাহিত্যরসকে ক্ষুণ্ণ করেন নাই।

নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট রবীন্দ্রনাথ উপদ্রব হিসাবে দেখিয়াছেন—এই ভোলাবার চেষ্টাকে তিনি ছেলেমানুষী আখ্যা দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু; দর্শকের চিত্ত-দৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েচে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চির প্রচলিত যাত্রার পালা-গানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোন হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ বাস্তব-সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাব-সত্যকেও বাধা দেয়।"

রবীন্দ্রনাথের নাটক কাহিনী-প্রধান নয়। রঙ্গমঞ্চের পক্ষে বাহিরের ঘটনা, নানাভাবে ঘটনাদ্বারা সংঘাত প্রকাশের চেষ্টা, ঘটনাবলীর সাহায্যে চরিত্রচিত্রণের বিধান, এই সব প্রাধান্য লাভ করিলে নাটক রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় হয়। রঙ্গমঞ্চে প্রযোজক, অভিনেতা এবং দৃশ্যপট নাটক-রূপায়ণে নব নব রসসৃষ্টি করে। নাট্যকারের স্থান থাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ। অভিনয়ের নৈপুণ্যে, প্রযোজকের রূপ-দানে এবং দৃশ্যপটের সৌকুমার্যে নাট্যকার ব্যাখ্যাত হয়েন। যাঁহারা নাটক রঙ্গমঞ্চে দেখিতে চাহেন, পড়িতে চাহেন না, তাঁহারা অভিনেতা খোঁজেন, প্রযোজকের দান স্বীকার করেন এবং দৃশ্যপটকে নাটকের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের নাটক বুঝিতে হইলে রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইবে, তাঁহার নাটককে ব্যাখ্যান করিতে হইলে তাহার ভাবসত্যকে প্রকাশ করিতে হইবে। প্রযোজক বা অভিনেতা সেখানে গৌণ। রঙ্গমঞ্চে মুখ্য স্থান পায় যাহারা শ্রোতা, তাই প্রযোজক, অভিনেতা ও দৃশ্যপটের এত প্রয়োজন। নাটক রচনায় রবীন্দ্র-নাথের দৃষ্টি ছিল পাঠকের দিকে, দর্শকের দিকে নয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকে যে সংঘাত তাহা ঘটনার সংঘাত নয়, ভাবের সংঘাত। ভাবগত দ্বন্দ্ব চলে মনের ভিতর। তাই বাহিরের ঘটনা সেখানে বড় স্থান অধিকার করে না। রবীন্দ্র-নাথের নাটকে ঘটনার কোলাহল নাই, অথচ মনে মনে নানা রঙের খেলা আছে।

Bernard Shaw বলিয়াছেন—"Art is the magic mirror you make to reflect your invisible dreams in visible pictures. You use a glass-mirror to see your face; you use works of art to see your soul."

রবীন্দ্রনাথের নাটক হইল সেই "magic mirror"—ইহার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও তাঁর প্রাণের আকুতি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যে যে আলোচনা আছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র-দর্শনের ঘোষণা।

রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রধান নাটকের মূল কথা বুঝিতে হইলে রবীন্দ্র-দর্শন যে-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা স্বীকার করিতে হইবে। রক্তকরবী নাটকে রঞ্জন প্রাণ দিল, মুক্তধারা নাটকে যুবরাজ অভিজিৎ নিজেকে ঝরণার স্রোতে ভাসাইয়া দিল, তপতী নাটকে রাণী রাজাকে পাইতে বাহির হইল নিজেকে নীচু করিয়া এবং স্বকীয় অহংকে ত্যাগ করিয়া, গৃহপ্রবেশ নাটকে যতীন তার স্ত্রী মনিকে যথার্থভাবে পাইল মৃত্যুর ভিতর দিয়া। রবীন্দ্র-দর্শনকে বুঝিতে না পারিলে এই সব তত্ত্ব বা সত্য নিতান্তই অর্থহীন। অনেক সমালোচক রবীন্দ্রনাথের নাটকের মর্মকথা গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কারণ যে-সত্যের উপর দাঁড়াইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবধারাকে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সত্য সমালোচকদের কাছে ধরা দেয় নাই।

মানুষের বড় শক্তি এবং বড় সত্য হইল প্রেম। এই প্রেমের সাহায্যে যে-মিলন ঘটে, তাহা খণ্ড নহে, বিচ্ছিন্ন নহে এবং অসম্পূর্ণ নহে। এই প্রেমের সাহায্যে আমরা ভয়কে অতিক্রম করিতে পারি, বিপদকে তুচ্ছ করিতে পারি, ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারি এবং মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারি। যখন সত্য প্রেমরূপে দেখা দেয় না, সেই সত্য খণ্ডিত সত্য। তাই আমরা বল লাভ করিতে পারি না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"আমরা সত্যকে যে পরিমাণে উপলব্ধি করি, তাহার জন্য সেই পরিমাণে মূল্য দিতে পারি। সত্য প্রেমরূপে আমাদের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেই সত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। তখন বুদ্ধির দ্বিধা হইতে, মৃত্যুপীড়া হইতে, স্বার্থের বন্ধন ও ক্ষতির আশঙ্কা হইতে আমরা মুক্তি লাভ করি। তখন এই অস্থির সংসারের মাঝখানে আমাদের চিত্ত এমন একটি চরম স্থিতির আদর্শ খুঁজিয়া পায়, যাহার উপর সে আপনার সর্বস্ব সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হয়।"

জগৎ প্রেমরূপে ব্যক্ত না হইলে পূর্ণ সত্যরূপে ব্যক্ত হয় না। তাই এই

প্রেমপূর্ণ প্রকাশে প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য আছে। মানুষের প্রধান কাজ নিজেকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বের মধ্যে প্রকাশ করা। এবং সেই প্রবেশকে সার্থক করিতে হইলে প্রেমের সাহায্যে মিলন ঘটাইতে হইবে। শক্তি আমাদের গতি দেয়, কিন্তু সেই গতিকে সংহত করে প্রেম। রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রেমহীন বিরাম জড়ত্বমাত্র, কিন্তু যথার্থ বিরাম লাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণভাবে ভালবাসিয়া বিরাম অর্জন করিতে হইবে। তাই স্বার্থের খাতিরে আমরা একত্র হইতে পারি, কিন্তু এক হইতে পারি না। এই একত্ব লাভের আয়োজন প্রেমের সাহায্যেই সম্ভব।

শক্তি আপনাকে ঘোষণা করে। প্রেম মানুষকে পালন করে, লালন করে। প্রেম মৃত্যুর মধ্যে প্রগাঢ় হইয়া দেখা দেয়, জীবনের মধ্যে অন্তরালে থাকিয়া প্রতি মুহূর্তে বল প্রেরণ করে। "প্রেম যাহা দান করে, সেই দান যতই কঠিন হয়, ততই তাহার সার্থকতার আনন্দ নিবিড় হয়।" মানুষের গর্ব নিজেকে ব্যক্তি-বিশেষ বলিয়া জানা নয়, তার গর্ব নিজেকে মানুষ বলিয়া জানা। মানুষের দুর্গতি তখনই ঘটে যখন সে মুখ্য জিনিসটাকে হারায়, এবং গৌণ জিনিসকে বড় করিয়া দেখে। প্রেম মানুষকে ত্যাগ করিতে শেখায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ত্যাগ করিতেই হইবে এবং ত্যাগের দ্বারাই আমরা লাভ করি। ইহা জগতের মর্মগত সত্য। ফুলকে পাপড়ি খসাইতেই হয়, তবে ফল ধরে, ফলকে ঝরিয়া পড়িতেই হয়, তবে গাছ হয়, শরীর হইতে সমাজে, সমাজ হইতে নিখিলে, নিখিল হইতে অধ্যাত্মক্ষেত্রে মানব জন্মকে শেষ পরিণতি দান করে।"

ত্যাগ জিনিসটা শূন্যতা নয়, তাহা অধিকারের পূর্ণতা। এই ত্যাগের শক্তি আমাদের সংগ্রহ করিতে হইবে। এই ত্যাগের যজ্ঞ হইল মঙ্গলের যজ্ঞ। ত্যাগ আরম্ভ করিলে ত্যাগ ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু এই ত্যাগ করিতে হইবে সানন্দে ও সপ্রেমে। নিঃশেষে দিতে হইবে—হিসাব রাখিলে চলিবে না, রসিদ চাহিলে চলিবে না। তাই হিসাব না রাখিয়া, রসিদ না চাহিয়া রাণী সুমিত্রা নিজেকে ত্যাগ করিল তপতী নাটকে, রঞ্জন নিজেকে ত্যাগ করিল রক্তকরবী নাটকে, অভিজিৎ মুক্তি পাইল মুক্তধারা নাটকে এবং যতীন মৃত্যুকে বরণ করিল গৃহপ্রবেশ নাটকে। প্রেমেতে ত্যাগ ও লাভ একই জিনিস। যাহাকে ভালোবাসি, তাহাকে যাহা দেই, সেই দেওয়াতেই লাভ। যেখানে দেওয়া, সেখানেই পাওয়া। প্রেমের হিসাবের খাতায় জমা খরচ একই জায়গায়। মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের স্পর্শ পাই যেখানে প্রেম আছে। এই প্রেমের মধ্যে আমরা অনন্তের স্বাদ পাই।

আমরা প্রেমকে চাই। যখন বিচ্ছেদ মিলনকে নাশ করে না এবং মিলন বিচ্ছেদকে গ্রাস করে না, যখন এই বিচ্ছেদ-মিলন একসঙ্গে থাকে এবং তাদের মধ্যে বিরোধ থাকে না, সেই সামঞ্জস্যের মধ্যে প্রেমকে পাওয়া যায়। প্রেমের সঙ্গে ত্যাগের সম্বন্ধ বুঝাইতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"প্রেম ছাড়া ত্যাগ হয় না, আবার ত্যাগ ছাড়া প্রেম হতে পারে না। যা আমাদের কাছ থেকে প্রয়োজনের তাগিদে বা অত্যাচারের তাড়নায় ছিনিয়ে নেওয়া হয় সে তো ত্যাগই নয়—আমরা প্রেমে যা দিই তাই সম্পূর্ণ দিই, কিছুই তার আর রাখিনে, সেই দেওয়াতেই দানকে সার্থক মনে করি। কিন্তু এই যে প্রেম, এও ত্যাগের সাধনাতেই শেষে আমাদের কাছে ধরা দেয়। যে লোক চিরকাল কেবল আপনার দিকেই টানে, নিজের অহংকারকেই জয়ী করবার জন্যে ব্যস্ত সেই স্বার্থপর সেই দাম্ভিক ব্যক্তির মনে প্রেমের উদয় হয় না—প্রেমের সূর্য একবারে কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। স্বার্থের বন্ধন ছাড়তে হবে, অহংকারের নাগপাশ মোচন করতে হবে, যা কেবল জমাবার জন্যেই জীবনপাত করেছি প্রত্যহ তা ত্যাগ করতে বসতে হবে। তাহলেই কি যাকে মুক্তি বলে তাই পাব? হ্যাঁ, মুক্তি পাবে। মুক্তি শেষে কী পাব? মুক্তির যা চরম লক্ষ্য সেই প্রেমকে পাব।"

এই প্রেমের মধ্যে হ্রী থাকবে, ধী থাকবে এবং শ্রী থাকবে। মানুষ অমৃত চায়। যেখানে প্রেম থাকে না, সেখানে মৃত্যুর ভিতর দিয়া সমাপ্তিতে পৌঁছাই। কিন্তু অমৃত পাইতে হইলে প্রেমের ভিতর দিয়া মৃত্যুকে গ্রহণ করিতে হইবে। তখন সেই মৃত্যুতে অবসান থাকে না—তাতে থাকে মুক্তি, তাতে থাকে নতুন জাগরণ।

রবীন্দ্রনাথের বিয়োগান্ত নাটকগুলি রবীন্দ্র-সাহিত্যে অমূল্য রত্ন। মুক্তধারা, ডাকঘর, রক্তকরবী, তপতী, বিসর্জন, গৃহপ্রবেশ—এইগুলি বিয়োগান্ত নাটক। এইসব নাটকে যে দ্বন্দ্ব আছে, তাহা বিরুদ্ধ ভাবনার দ্বন্দ্ব। ইহাতে যে সত্য আখ্যাত হইয়াছে, তাহা কোন ব্যক্তিগত সত্য নহে, তাহা সার্বজনীন সত্য। রবীন্দ্রনাথের নাটক এই সার্বজনীন সত্যে সমৃদ্ধ। Shakespeare-এর দৃষ্টি ছিল ব্যক্তির উপর, তাই ঘটনা তাঁর নাটকের অবলম্বন, সেই ঘটনার সংঘাতে নাটকের চরিত্র পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। জীবনে যে নতুন দর্শনের প্রয়োজন, যে সার্বজনীন দৃষ্টি কাম্য, সেইদিকে Shakespeare ঝোঁক দেন নাই। Shakespeare-এর কোন চরিত্র বলিতে পারে নাই যেমন Henrik Ibsen এর Julion বলিয়াছিল "The old beauty is no longer beautiful, and the new truth

is no longer true." রবীন্দ্রনাথ অগ্নিশিখার আলোককে চিরকাল আহ্বান করিয়াছেন, "দুঃখে সুখে শূন্য ঘরে পুণ্য দীপ" জ্বালাইতে বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিয়োগান্ত নাটকে দেখিতে পাই মৃত্যুর ভিতর মুক্তি, মৃত্যুর পথ দিয়া প্রকৃত জীবন লাভ করা যায় এবং মৃত্যুর ভিতর মিলন। নিজেকে রিক্ত করিয়া পরকে কি করিয়া ভরিয়া দেওয়া যায়, সেই সত্য রবীন্দ্রনাথের বিয়োগান্ত নাটকে ঘোষিত হইয়াছে।

মৃত্যুকে নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যায়। কিন্তু যে-মৃত্যুতে নিজেকে নিঃশেষে দান আছে কোন বৃহৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য, সেই মৃত্যুতে নতুন জন্ম লাভ হয়। এই মৃত্যুর ভিতর পাওয়া যায় সামাজিক চেতনার নতুন উদ্দীপনা। তাই মৃত্যুহীন মৃত্যুর জয়ঘোষণা রবীন্দ্র-সাহিত্যে আমরা প্রতি পদে পাই। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন যে, মৃত্যু জীবনের বাণী বহন করে, মৃত্যুর ভিতর বর-বধূর মিলনের মধুরতা আছে এবং মৃত্যু নতুন জাগরণের সার্থকতা আনিয়া দেয়, তখন বুঝিতে হইবে এই মৃত্যু শুধু জীবনের অবসান নয়, এই মৃত্যু হইল নতুনকে জাগাইবার কৌশল মাত্র। যাহারা পাইতে চাহেন, অথচ দিতে চাহেন না, সেই সব স্বার্থ-সংকুচিত জীবন রবীন্দ্রসাহিত্যে কোনদিন বিশেষ স্থান অধিকার করে নাই। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটকের রহস্য বুঝিতে হইলে মৃত্যুর সাহায্যে ব্যক্তিগত জীবনকে এবং সমাজকে জাগাইবার প্রচেষ্টা স্বীকার করিতে হইবে। রবীন্দ্র দর্শনে প্রেমহীন প্রেম এবং প্রাণহীন প্রাণদান কোন বিশেষভাবে আখ্যাত বা প্রখ্যাত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন যে, মানুষ একদিকে প্রকৃতি, আর একদিকে আত্মা। প্রকৃতির ধর্ম বন্ধন আর আত্মার ধর্ম মুক্তি। এই বন্ধন ও মুক্তি, এই দুই বাহু দিয়া ভগবান মানুষকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। প্রেমের অভিব্যক্তিকে রবীন্দ্রনাথ বড় স্থান দিয়াছেন, প্রকৃতি হইল শক্তির ক্ষেত্র, জীবাত্মা হইল ভগবানের প্রেমের ক্ষেত্র। শক্তির ক্ষেত্রে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে পাওয়ার শেষ হয় না। প্রেম সমস্ত আত্মাকে আত্মীয় করিবার পথে চলিয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন—"স্বার্থ ও অভিমানের ঘাত প্রতিঘাতে কত আঁকাবাঁকা পথ নিয়ে, কত বিস্তারের মধ্যে দিয়ে, ছোটবড়ো কত আসক্তি অনুরক্তিকে বিদীর্ণ করে জীবাত্মার প্রেমের নদী প্রেম সমুদ্রের দিকে গিয়ে মিলেছে। প্রেমের শতদলপদ্ম অহংকারের বৃন্ত আশ্রয় করে আত্ম হতে গৃহে, গৃহ হতে সমাজে, সমাজ হতে দেশে, দেশ হতে মানবে, মানব হতে বিশ্বাত্মায় ও বিশ্বাত্মা হতে পরমাত্মায় একটি করে পাপড়ি খুলে দিয়ে বিকাশের লীলা সমাধান করছে।"

ঋতু-উৎসব

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, "কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী; জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনো মিথ্যা কথা বলিনে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।"

রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। "ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাতসন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি, এমন কি কোন স্বর্গ থেকে পেতুম?" রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন তিনি এই আকাশের, এই নদীর, এই পুরাতন শ্যামল পৃথিবীর। তাঁহার মনে হইত—

> "নাই মোর পূর্বাপর
> যেন আমি একদিনে উঠেছি ফুটিয়া
> অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল।"

রবীন্দ্রনাথ আরও বিশ্বাস করেন, "নিজের প্রবহমান জীবনকে যখন নিজের বাহিরে নিখিলের সঙ্গে যুক্ত করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই—আমি আছি, আমি চলচি, আমি হ'য়ে উঠচি এইটেকেই একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি। আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সমস্তই আছে—আমাকে ছেড়ে কোথাও একটি অণুপরমাণুও থাকতে পারে না; এই সুন্দর শরৎ-প্রভাতের সঙ্গে এই জ্যোতির্ময় শূন্যের সঙ্গে আমার অন্তরাত্মার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা-যোগ, অনন্ত জগত-প্রাণের সঙ্গে আমার এই যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধেরই প্রত্যক্ষ ভাষা এই সমস্ত বর্ণগন্ধ গীত।"

এই বর্ণগন্ধগীতপূর্ণ জগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অবিশ্রাম আদান-প্রদান। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে জড় ও প্রাণহীন ভাবে দেখেন নাই। প্রকৃতির যে একটা আত্মা আছে, একথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে আত্মার সৌন্দর্য সংযোগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনকে এতটা অভিভূত করিয়াছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে মানবহৃদয়ের একটা নিত্যমিশ্রণ আছে। প্রকৃতি মানুষের হৃদয়ে, মানুষের সুখদুঃখের চারিদিকে কী রকমভাবে প্রকাশিত হয় সাহিত্য তাই দেখায়। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে মানবত্ব আরোপ করিয়া নতুন সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিভিন্ন ঋতুর উৎসবের জন্য রবীন্দ্রনাথ নাটক লিখিয়াছেন—শেষ বর্ষণ, শারোদৎসব, বসন্ত, সুন্দর ও ফাল্গুনী। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ চলে নানা কাজে, নানা খেলায়। উৎসব সেই মিলনের সাক্ষী—উৎসবের সাঁকোর সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধময় জগতের লীলার রাজত্বে পৌছাইতে পারে। প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য চলে ফুল ফল ফসলের মধ্য দিয়া। মানুষ প্রকৃতির সহিত মিলিতে পারে যখন সে তার চিত্তদ্বার খুলিয়া দিয়া প্রকৃতির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। প্রকৃতির মধ্যে আমরা আছি, তাহাতে মিলন ঘটে না, মিলন ঘটিতে হইলে প্রকৃতিকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃতি মানুষকে ডাক দেয়, তার অন্তরকে রাঙাইয়া তোলে। মানুষ যদি সেই আহ্বানকে অস্বীকার করে, প্রকৃতির রঙে অন্তরকে না রাঙাইয়া তোলে, প্রকৃতির সহযোগে অন্তরে যদি কোন গান না জাগাইয়া উঠে, তাহা হইলে মিলন অসম্পূর্ণ হয়, মানুষ জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। এই বিচ্ছিন্নতা রবীন্দ্রনাথকে পীড়া দিত। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নহে, এই বিশাল বিশ্বে তাহার জন্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাহার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। তাহার ইন্দ্রিয়বোধের তারে তারে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের স্পন্দন নানা রূপে রসে জাগিয়া উঠিতেছে। বিশ্বপ্রকৃতির কাজ আমাদের প্রাণের মহলে আপনিই চলিতেছে। কিন্তু মানুষের প্রধান সৃজনের ক্ষেত্র তাহার চিত্তমহলে। এই মহলে যদি দ্বার খুলিয়া আমরা বিশ্বকে আহ্বান করিয়া না লই, তবে বিরাটের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ মিলন ঘটে না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিত্তের মিলনের অভাব আমাদের মানবপ্রকৃতির পক্ষে একটা প্রকাণ্ড অভাব।"

এই যে ঋতু-উৎসবের নাটকগুলি—এতে ইশারা আছে, এতে চাহিয়া দেখিবার তন্ময়তা আছে। গান তার প্রধান অবলম্বন, কারণ বাইরের প্রকৃতিকে অন্তরে ডাকিতে হইলে গানের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। গানের সাহায্যে ভিতরের দিকে চাহিবার সুবিধা হয়। আকাশের বেদনার সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল কারবার ডাক এই সব নাটকগুলিতে প্রধান। এই নাটকগুলিতে যে রস, তার ওজন আয়তনে নয়। এতে আছে মিলনের আয়োজন—প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের। এই সব নাটকে কাজের কথা নাই, শুধু ছুটির হাসি, উৎসবের আনন্দ। "এতে মূলেই অর্থ নেই, বোঝা না বোঝার কোন বালাই নাই, কেবল এতে সুর আছে। উৎসবকে ভোগ করিতে হয় নিজেকে পূর্ণ

করিয়া। জোর করিয়া ফল ফলাবার চেষ্টা নাই, তাহাতে উৎসব নষ্ট হয়।" তাই উৎসবে যোগ দিবার জন্য কবি আহ্বান করিয়াছেন—

"সব দিবি কে, সব দিবি পায়।
আয় আয় আয়।
ডাক প'ড়েছে ঐ শোনা যায়,
আয় আয় আয়।"

উৎসবের অন্তরের কথা হইল—

"জানিনে ভাই, ভাবিনে তাই কী হবে মোর দশা,
যখন আমার সারা হবে সকল ঝরা খসা।
এই কথা মোর শূন্য ডালে
বাজবে সেদিন তালে তালে,
চরম দেওয়ায় সব দিয়েছি
মধুর মধু-যামিনীরে।"

এই ঋতু-উৎসবে সুপ্ত প্রাণ জাগিয়া উঠে। তার আসা যে "সৃষ্টিছাড়া"। তাই কবি বলেন—

"হিয়ায় হিয়ায় জাগলো বাণী,
পাতায় পাতায় কানাকানি,
"ঐ এলো যে", "ঐ এলো যে,"
পরাণ দিলো সাড়া।'

ঋতু-উৎসবকে হৃদয়ে ধরিতে হইলে, রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যানকে গ্রহণ করিতে হইবে :—

প্রথম, ঋতু আসে এবং চলিয়া যায়। এতে নবীনের রূপ আছে, পুরাতনের রূপ আছে। ঋতু-উৎসবে চলে নতুন-পুরাতনের খেলা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার এক পিঠে নূতন, একপিঠে পুরাতন। যখন উল্টে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরা ফুল, আবার যখন পাল্টে নেন তখন সকাল বেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী। উনি একই মানুষ নূতন পুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।"

দ্বিতীয়, "পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে ওর আনাগোনা। বাঁধন পরা, বাঁধন খোলা, এও যেমন এক খেলা, ও-ও তেমনি এক খেলা। যথার্থ পূর্ণ হয়ে উঠলে রিক্ত-হওয়া খেলায় ভয় থাকে না।"

তৃতীয়, উৎসবে আছে আনন্দের মন্ত্র, সবচেয়ে বড় বৈরাগ্যের মন্ত্র। বাইরের যে কান্না, তাহা হইল প্রাণের কাছে প্রাণের আহ্বান। তাই চলিতে হইবে। "ডাক শুনে যদি ভিতরে সাড়া না দেয়, প্রাণ যদি না দুলে ওঠে তবে অকর্তব্য হলো বলে ভাবনা নয়, তবে ভাবনা মরেচি বলে।" উৎসবের মধ্যে প্রাণ আছে, তাই বাঁচা যায়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন, "অপর্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েচে বলেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তারা; ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা; তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে,—সৃষ্টি করে তারাই, কেননা তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র।"

চতুর্থ, বিশ্বের মধ্যে যে প্রাকৃতিক লীলা চলিতেছে, আমাদের প্রাণের মধ্যেও সেই লীলা। এই সব নাটকগুলি প্রকৃতির গীতিকাব্য থেকেই প্রাণ পাইয়াছে। যারা ফল চায় না, ফলিতে চায়, তারাই এই ঋতু-উৎসবে নিজেকে পাইতে চেষ্টা করে। রবীন্দ্রনাথ বলেন—"শিশু হঠাৎ শুনতে পায় জল স্থল-আকাশ তাকে চারিদিক থেকে বলে উঠচে—আমি আছি। তারই উত্তরে ঐ প্রাণটুকু সাড়া পেয়ে বলে ওঠে—আমি আছি। আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া।"

পঞ্চম, ঋতু-উৎসবের প্রাণ চলা। সে পথের খবর দেয়, পথিকের খবর দেয় না। উৎসবের ডাক হইল—

"চলরে সোজা, ফেলরে বোঝা,
রেখে দে তোর রাস্তা-খোঁজা,
চলার বেগে পায়ের তলায়
রাস্তা জেগেছে।"

ঋতু-উৎসবকে বুঝিতে হইলে "ফাল্গুনীর" মাঝীর কথা মনে রাখিতে হইবে—"আমার ব্যবসা হচ্চে পথ ঠিক করা—কাদের পথ, কিসের পথ, সে আমার জানবার দরকার হয় না। আমার দৌড় ঘাট পর্যন্ত—ঘর পর্যন্ত না।'

রবীন্দ্রনাথ ঋতু-উৎসবে যোগ দিবার জন্য বিশ্বকে ডাকিয়া বলিয়াছেন—

"ওরে মন, খুলে দে মন,
যা আছে তোর খুলে দে।
অন্তরে যা ডুবে আছে
আলোক-পানে তুলে দে।

আনন্দে সব বাধা টুটে
সবার সাথে ওঠরে ফুটে,
চোখের 'পরে আলস-ভরে
রাখিস নে আর আঁচল টানি।"

শারদোৎসব

শারদোৎসব ঋতু-উৎসবের নাটকের পালা। নাটকের পাত্রগণের মধ্যে লক্ষেশ্বর, রাজা ও উপনন্দ প্রধান। লক্ষেশ্বর বণিক—সে আপনার স্বার্থে মগ্ন। সে সকলকে ঈর্ষা করে, সন্দেহ করে। সে আপনার সম্পত্তি গোপন করিয়া বেড়ায়। উৎসবের আনন্দে সে অন্তরায়। লক্ষেশ্বর সন্ন্যাসীকে বলিল, "যা পেয়েছি তা অনেক দুঃখে পেয়েছি, তোমার এক কথায় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শেষকালে হায় হায় করে মরব!"

লক্ষেশ্বর তার লুকানো গজমোতি সন্ন্যাসীকে দেখাইয়া বলিল—"এই-যে গজমোতি, ও আমি তোমাকেই আজ প্রথম দেখালেম; আজ পর্যন্ত কেবল লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছি। তোমাকে দেখাতে পেরে মনটা তবু একটা হাল্কা হল। তোমাকে যে এত বিশ্বাস করলেম, তবু এ জিনিস একটিবার তোমার হাতে তুলে দিই এমন শক্তি আমার নেই। এই-যে আলোতে এটাকে তুলে ধরেছি, আমার বুকের ভিতরে যেন গুরগুর করছে। আমি এটা বেচতেও পারছি নে, রাখতেও পারছিনে, এর জন্যে আমার রাত্রে ঘুম হয় না।"

এই হইল লক্ষেশ্বর—গজমোতি মাটিতে পোঁতা থাকিবে, তা-ও ভাল, তবুও কেউ যেন সন্ধান না পায়। এবং কারো হাতে লক্ষেশ্বর দিতে পারিবে না। এই লক্ষেশ্বর উৎসবের মন্ত্র ধরিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ শারদোৎসবের মর্মব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

"শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে বসিয়া উপনন্দ তার প্রভুর ঋণ শোধ করিতেছে; রাজসন্ন্যাসী এই প্রেমঋণ-পরিশোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখিতে পাইলেন। তাঁর তখনই মনে হইল, শারোদৎসবের মূল অর্থটি এই ঋণ-শোধের সৌন্দর্য। শরতে এই-যে নদী ভরিয়া উঠিল কূলে কূলে, এই-যে খেত ভরিয়া উঠিল শস্যের ভারে, ইহার মধ্যে একটি ভাব আছে, সে এই: প্রকৃতি আপনার ভিতরে যে অমৃতশক্তি পাইয়াছে সেটাকে বাহিরে নানা রূপে

নানা রসে শোধ করিয়া দিতেছে। সেই শোধ করাটাই প্রকাশ। প্রকাশ যেখানে সম্পূর্ণ হয় সেইখানেই ভিতরের ঋণ বাহিরে ভালো করিয়া শোধ করা হয়; সেই শোধের মধ্যেই সৌন্দর্য।"

সন্ন্যাসী ও ঠাকুরদাদার কথোপকথন হইতে শারদোৎসবের মূল কথাটি বুঝিবার পক্ষে সহজ হয়—

"সন্ন্যাসী—আমি অনেক দিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন। কিছুই ভেবে পাইনি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে করছে। সেই জন্যেই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যেই এত সৌন্দর্য।

ঠাকুরদাদা—একদিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলই ঢেলে দিচ্ছেন, আর একদিকে কঠিন দুঃখে তারই শোধ চলছে। সেই দুঃখের আনন্দ এবং সৌন্দর্য যে কী সে কথা তোমার কাছে পূর্বেই শুনেছি। প্রভু, কেবল এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্ছে, মিলনটি এমন সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সন্ন্যাসী—ঠাকুর্দা, যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, যেখানেই ঋণশোধে ঢিল পড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী, সমস্তই অব্যবস্থা।

ঠাকুরদাদা—সেইখানেই যে একপক্ষে কম পড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হতে পায় না।

সন্ন্যাসী—লক্ষ্মী যখন মানবের মর্ত্যলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনীবেশেই ভগবান মুগ্ধ হয়ে আছেন; শত দুঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেছে, সে খবরটি আজ ওই উপনন্দের কাছ থেকে পেয়েছি।"

তাই সন্ন্যাসী উপনন্দকে বলিল—"তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ।

উপনন্দ ছুটির দিনে কাজ করিতে লাগিল, কারণ তার ঋণ আছে, সেই ঋণ শোধ করতেই হইবে। তাই উপনন্দ সন্ন্যাসীকে বলিল—"আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি না, তাঁর (প্রভুর) ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি

তা হলে আমার খুব আনন্দ হবে, মনে হবে, আজকের এই সুন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হল ’

এই ঋণশোধ হইল কাজকে স্বীকার করিয়া লওয়া, কাজকে প্রাণের সঙ্গে গ্রহণ করা। তাই সন্ন্যাসী উপনন্দকে বলিল—“বোঝা মাথায় তুলে নাও, কারও প্রত্যাশায় ফেলে রেখে সময় বইয়ে দিয়ো না।”

“আমার ধর্ম” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শারদোৎসবের ভিতরকার কথা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

“বিশ্বই যে এই দুঃখ তপস্যায় রত; অসীমের যে-দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে, অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করছে। প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করছে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই সে আপন অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করছে। এই যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জন, এই দুঃখই তো তার শ্রী, এই তো তার উৎসব, এতেই তো সে শরৎপ্রকৃতিকে সুন্দর করেছে, আনন্দময় করেছে।”

শারোদৎসব শুধু খেলা নয়। এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নাই—শুধু বাঁশির সুর শুনিবার ছুটি নাই। ভয়ে কিংবা আলস্যে কিম্বা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে, এই কাজের পথকে, এই ঋণ শোধ করবার চেষ্টাকে যে লোক এড়াইয়া চলিতে চায়, জগতে সে-ই আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। রাজা বাহির হইয়াছেন সকলের সঙ্গে মিলিয়া শারোদৎসব করিবার জন্য। কিন্তু উপনন্দ খেলা ছাড়িয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিল। এই উপনন্দ রাজার সত্যিকারের সাথী হইল।

বাহিরের প্রকৃতির সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের কাছে একমাত্র সত্য নয়। এই যে ছুটি, এই যে আনন্দ, এই যে রূপ-রস-গন্ধভরা ধরণীকে লইয়া মোহসৃষ্টি করিবার চেষ্টা— ইহা রবীন্দ্র-সাহিত্যের আংশিক সত্যমাত্র। রবীন্দ্রনাথ জানেন যে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে অসীমের আনন্দ প্রকাশ পাইতেছে। প্রকৃতির পথ দিয়া হৃদয়ের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, এবং সেই অন্তরজগতে চলে সীমার সঙ্গে অসীমের মিলনসাধনের পালা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

“প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন, তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে, তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া, ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর কাহারও টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।"

এই মুক্তির সাধনা "প্রকৃতির প্রতিশোধ" ও "মালিনী" নাট্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করিয়াছেন। "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নাট্যকাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে, একদিকে নরনারী প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইতেছে—অপরদিকে এক সন্ন্যাসী সমস্ত কিছু ছাড়িয়া দিয়া এক গুহার ভিতর নিজের মুক্তিসাধনায় নিযুক্ত। "প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।" রবীন্দ্রনাথ "প্রকৃতির প্রতিশোধ" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।"

যখন সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিল, জগতে সে নতুন আনন্দ পাইল। চারিদিকে দেখিল আনন্দের হিল্লোল—যে বালিকাকে প্রকৃতির গুপ্তচর ও মায়াবিনী বলিয়া আঘাত করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য নূতন আকুতি অনুভব করিল। এই অনুভূতির মধ্যে সন্ন্যাসী মুক্তি পাইল। তাই আনন্দের সঙ্গে বলিয়া উঠিল—

"কেন এরা সবে মোরে করিছে প্রণাম—
আমি তো সন্ন্যাসী নই—ওঠ ভাই ওঠ—
এস ভাই, আজ মোরা করি কোলাকুলি।
আমিও যে একজন তোমাদেরি মতো,
তোমাদেরি গৃহমাঝে নিয়ে যাও মোরে।"

"মালিনী" নাট্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বলিয়াছেন। এই নাটকের তাৎপর্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"আমি বালক বয়সে প্রকৃতির প্রতিশোধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জাহাজে অনন্তকোটি লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে। পরিণতবয়সে যখন "মালিনী" নাট্য লিখিয়াছিলাম, তখনো এইরূপ দূর হইতে নিকটে, অনির্দিষ্ট হইতে নির্দিষ্টে, কল্পনা হইতে প্রত্যক্ষের মধ্যে ধর্মকে উপলব্ধি করিবার কথা বলিয়াছি।"

তাই মালিনী নাট্যে সুপ্রিয় বলিল—

"মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্ত্যলোকে
ওই নারী মূর্তি ধরি। শাস্ত্র এত দিন
মোর কাছে ছিল অন্ধ জীবন-বিহীন ;
ওই দুটি নেত্রে জ্বলে যে উজ্জ্বল শিখা
সে আলোকে পড়িয়াছি বিশ্বশাস্ত্রে লিখা
যেথা দয়া সেথা ধর্ম, যেথা প্রেমস্নেহ,
যেথায় মানব, যেথা মানবের গেহ।"

রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিক বা পৌরাণিক ধর্মের দিকে দৃষ্টি দেন নাই। তাঁর ধর্মপ্রেরণায় পরিপূর্ণ মানব-দেবতার আবির্ভাব, যে-মানুষ মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করে। এর মর্মকথাটিই প্রধান, এর কাব্যরস হইল সেই মর্ম, সেই মহিমা প্রকাশ করিবার চেষ্টাতে। এতে ঘাতপ্রতিঘাত আছে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত সংযত ও সংহত।

মালিনী নাটিকায় কাব্যরস প্রধান, কাহিনী গৌণ। মালিনীর উপাখ্যানটি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Sanskrit Buddhist Literature of Nepal হইতে গৃহীত। মালিনীর জয়, তার দুঃখ ও মহিমা—এই নাট্যকাব্যকে বিশেষ রসে ভরিয়া দিয়াছে।

ফাল্গুনী

ফাল্গুনী একটি রূপক নাটিকা।* ফাল্গুনীর কবিশেখর বলিলেন—'সেটা নাটক, কি প্রকরণ, কি রূপ, কি ভাণ তা ঠিক বলতে পারব না।' ফাল্গুনী নাটকে গানে গানে বাজিয়াছে অন্তরের রাগিণী, কথায় কথায় উঠিয়াছে আনন্দরস। শীতের মধ্য দিয়া বসন্তের আগমন হইল, ইহাই ফাল্গুনীর উপাখ্যান-ভাগ। ইহাতে চরিত্রাঙ্কনের সুনিপুণ চেষ্টা নাই, ঘটনাসমাবেশের বা ঘাত-প্রতিঘাতের অবসর নাই। সমস্ত নাটকখানি একটি ফাল্গুনের বসন্তোৎসব—অভিনেতৃবর্গের পায়ের নূপুরের সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের নবীন আশার বাণী ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। কবিশেখর ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—

"রচনা তো অর্থ গ্রহণ করবার জন্যে নয়। সেই রচনাকেই গ্রহণ করবার জন্যে। আমি তো বলেচি আমার এ সব জিনিস বাঁশির মতো, বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে। এর মধ্যে তত্ত্বকথা কিছু নেই। রচনাটা বলচে, আমি আছি। শিশু জন্মাবামাত্র চেঁচিয়ে ওঠে। শিশু হঠাৎ শুনতে পায় জলস্থল-আকাশ তা'কে চারদিক থেকে বলে উঠেচে—"আমি আছি"—তা'রই উত্তরে ঐ প্রাণটুকু সাড়া পেয়ে বলে' ওঠে—"আমি আছি।" আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া। আমার রচনার মধ্যে প্রাণ বলে উঠেচে,—সুখে দুঃখে, কাজে বিশ্রামে, জন্মে মৃত্যুতে জয়ে-পরাজয়ে, লোক লোকান্তরে—'জয়, এই 'আমি-আছি'র জয়, জয়, এই আনন্দময় 'আমি-আছি'র জয়।' আজকের দিনে আধুনিকেরা উপার্জন করতে চায়, উপলব্ধি করতে চায় না।"

ফাল্গুনী নাটকে এই উপলব্ধির পালা—মানুষ এখানে ফল চায় না, ফলিতে চায়। এই জগতে ঋতুর পর ঋতুর খেলা অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে—তাই রূপের বিকাশ দেখিতে পাই রূপান্তরের মধ্যে। একদিকে আমরা যাহা হারাই, অপরদিকে আমরা তাহা পাই। এই পাওয়ার আরম্ভে হারানোর লীলা, অর্থাৎ হারানোর সমাপ্তিতে পাওয়ার সম্পূর্ণতা। শীত যখন আসে, সে বসন্তের

* ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ফাল্গুনীকে এক নূতন ধরনের ছলিক বলিয়াছেন: 'পূর্বে আমাদের দেশে ছলিক বলে এক রকম গীতাভিনয় হোত, সেই অভিনয়ে অভিনেতা আপন মনের কোনও গূঢ় অভিপ্রায় অভিনয় ও গানের অছিলায় প্রকাশ করত; নাচ ও গান ছিল তার প্রধান অঙ্গ, পাত্রপাত্রীর চরিত্র সমাবেশের বাহুল্য তাতে কোনও স্থান পেত না। কাব্যরসের মধ্য দিয়ে অভিনেতার কোনও ইঙ্গিত যাতে সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠ্‌তে পারে—এই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য।'

আগমনকে ঘোষণা করে ; তার মানে, বসন্তের গুপ্ত আবির্ভাবের নামই শীত। পুরানকে হারাই, নূতনকে পাই, এ দুই-ই একই সৃষ্টিনৃত্যের পদবিক্ষেপ। রূপের প্রকাশ, রূপের লয় এবং রূপান্তরের উদয়—জগতের এই লীলাপ্রবাহের মধ্যে মধ্যে সংযোগ রহিয়াছে ; কোথাও বিলয় নাই, কারণ বিলয়ের মধ্য দিয়াই বিকাশের কাজ চলিতেছে। অর্থাৎ, জন্ম ও মৃত্যু কোন স্বতন্ত্র বস্তু নয়, ইহা একই লীলার প্রকাশ—এই সত্যের প্রচারক হিসাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রসিদ্ধ। ফাল্গুনীতে সে সত্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।*

জীবন ও মৃত্যু, একই প্রাণশক্তির দুই অবস্থা। মৃত্যুই জীবনকে ক্রমাগত প্রকাশ করে, মৃত্যুতেই জীবনের প্রকৃত পরিচয়। মৃত্যুকে খুঁজিতে গেলেই জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই ফাল্গুনীর যুবকদল মৃত্যুর সন্ধানে বাহির হইয়াছে, মৃত্যুকে এড়াইতে চাহে নাই। ব্যক্তিগতভাবে দেখিতে গেলে মনে হয় যে, মৃত্যু জীবনের সমাপ্তি। কিন্তু প্রকৃতিকে ও মানবকে সমগ্রভাবে দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতিরাজ্যে যেমন শীতে সমস্ত ঝরিয়া পড়ে কিন্তু বসন্ত পূর্ণতা, ঐশ্বর্য, আনন্দ আনিয়া দেয়, মানব-জীবনও তেমনি মৃত্যুর মধ্য দিয়া নূতন যৌবন লাভ করে। ইহা রূপান্তর মাত্র, রূপের বিনাশ নয়। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিলেন—"আমাদের প্রাণকে নূতনভাবে উপলব্ধি করতে হবে বলেই আমরা মরি।" এই মৃত্যু বৃথা নয়, অসার্থক নয়—

'যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে
হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও
হয়নি হারা।'

---

* জীবন ও মরণ মানে এক মহাজীবনের মধ্যে জাগরণ ও নিদ্রা—আলোক ও অন্ধকারের পর্যায় মাত্র। মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবন আছে। বন্ধন আছে বলিয়াই যেমন মুক্তি আছে, অন্ধকার যেমন আলোককে প্রকাশ করে, রূপের ভিতর দিয়া অরূপের প্রকাশ হয়। জীবনকে সত্য বলিয়া জানিতে হইলে মৃত্যুকে চাই, মৃত্যুতেই জীবনের প্রকৃত পরিচয়। মৃত্যুকে খুঁজিতে গেলেই তবে জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই কথাই কবি তাঁহার ফাল্গুনী নাটকে বলিয়াছেন। যাহাদের মৃত্যুর সহিত মনের মিল হইয়াছে, তাহারা তাহার বাহিরের ভীষণ রূপ দেখিয়া ভয় পায় না। উপরন্তু তাহারা আরও ভাল করিয়া সেই সুন্দরকে ধরিতে চায়। জীবন ও মৃত্যু একই সূর্যের উদয়াস্তের মতন এক সোনার সিংহদ্বার হইতে অপর এক সোনার সিংহদ্বারে লইয়া যায়। এক দেহের বন্ধন হইতে মুক্তির প্রকাশই মৃত্যু।"—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'রবি-রশ্মি'।

এই জন্ম-মৃত্যুর সমস্যা ইংরেজ কবি ব্রাউনিংকেও উতলা করিয়াছিল। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, ইহজন্মে জরা, বার্ধক্য, মৃত্যু প্রভৃতি অপূর্ণতার দ্বারা আমরা ইহাই অনুমান করিতে পারি যে, পরলোকে এক পরিপূর্ণ জীবন আছে। জরা ও মৃত্যু হইল পরিপূর্ণতার সূচনা, কিন্তু সেই পূর্ণতার স্থান অজ্ঞাত স্বর্গরাজ্য। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে এতটা স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন নাই; তিনি বলিয়াছেন যে, জরার ভিতর দিয়া, মৃত্যুর ভিতর দিয়া প্রকৃতির এবং মানুষের যৌবনের নব-নব অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ ব্রাউনিংএর মত মৃত্যুর পর অমৃতকে আশা করেন নাই—তিনি মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে প্রত্যক্ষ করেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই ফাল্গুনীর প্রাণের কথা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

"শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ঐ একই···জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েচে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেচে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেচে সে মৃত্যুই নয়,—সে জীবন। যখন সাহস করে তার সামনে দাঁড়াতে পারিনে, তখন পিছন দিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে-সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দারই মৃত্যুর তোরণ দ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্চে। ফাল্গুনীর গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত উৎসব করতে বেরিয়েচে। কিন্তু এই উৎসব ত শুধু আমোদ করা নয়, এ ত অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে' তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌছন যায়। তাই যুবকেরা বললে,—আনব সেই জরা-বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃতুকে বন্দী করে। মানুষের ইতিহাসে ত এই লীলা, এই বসন্ত উৎসব বারে বারে দেখতে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন করে নির্জীব করতে চায়—তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব বসন্তের উৎসবের আয়োজন

করে। সেই আয়োজনই ত য়ুরোপে চলচে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলিখেলা আরম্ভ হয়েচে। মানুষের ইতিহাস আপন চিরনবীন অমরমূর্ত্তি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে তলব করেচে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত হয়েচে। তাই ফাল্গুনীতে বাউল বলচে—"যুগে যুগে মানুষ লড়াই করচে, আজ বসন্তের হাওয়া তারি ঢেউ। যারা মরে' অমর, বসন্তের কচিপাতায় তারা পত্র পাঠিয়েচে। দিগদিগন্তে তারা রটাচ্চে,—আমরা পথের বিচার করিনি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখিনি, আমরা ছুটে এসেচি, আমরা ফুটে বেরিয়েচি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম, তাহ'লে বসন্তের দশা কি হ'ত?" বসন্তের কচিপাতায় এই যে পত্র, এ কা'দের পত্র? যে সব পাতা ঝরে গিয়েছে—তারাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েচে। তারা যদি শাখা আঁক্‌ড়ে থাকতে পারত, তাহলে জরাই অমর হত—তাহ'লে পুরাতন পুঁথির তুলট কাগজে সমস্ত অরণ্য হল্‌দে হয়ে যেত, সেই শুক্‌নো পাতার সর্‌ সর্‌ শব্দে আকাশ শিউরে উঠ্‌ত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে—এই ত বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে, যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না; তারা জরাকে বরণ করে' জীবন্মৃত হয়ে থাকে—প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।" (সবুজপত্র, ১৩২৪ আশ্বিন—কার্ত্তিক)

একজন ফরাসী সমালোচক * বলিয়াছেন—

"আমার মনে হয় যে, ফাল্গুনীর মূলে উপনিষৎ বা ভগবদ্গীতা ততটা নেই, যত আছে A Midsummer Night's Dream। শেক্ষপীরের কল্পনা যেমন বনে রাণী Titania-রূপে প্রস্ফুটিত, এ কাব্যেও তেমনি অন্যরূপে প্রকটিত। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, বিলাতের মহানাট্যকার তাঁর ফুরফুরে কল্পনার খেলা দেখিয়ে কেবল আমাদের চিত্তবিনোদন ও চিন্তার ভার অপনোদন করতে চেয়েছিলেন। অপরপক্ষে হিন্দু মহাকবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য তাঁর ফাল্গুনীতে আমাদের একটি সার্বজনীন তত্ত্বের উপদেশ দেওয়া। তিনি পৃথিবীর চির-যৌবনের উৎসব সম্পাদনে রত; যে সকল নীতিবাগীশ কথায় যা বলেন, কাজে তার উল্টো করেন, এবং যে 'দাদা' কাটাছাঁটা চৌপদীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন, তাদের তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। তিনি ভালবাসেন সেই সর্দারকে;

* ফ্রান্সের সংবাদপত্র Les Nouvlles Litterairesতে প্রকাশিত, প্রমথ চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত, সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩।

যিনি জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করেন; সেই "চন্দ্র"কে যিনি আমাদের পৃথিবীকে ভালবাসতে শেখান; এবং সেই অন্ধ বাউলকে, যিনি চোখে দেখেন না, কিন্তু সমস্ত শরীর, সমস্ত মন ও সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে দেখেন। তিনি ভালবাসেন তরুণদের, যারা বসন্তের অগ্রদূত, যারা জানে যে, শীত হচ্চে সেই চিরকেলে বুড়ো—যে ফিরে ফিরে যুবা হয়, যে তার জীর্ণ মলিন কন্থার আড়ালে যৌবনের সকল ঐশ্বর্য লুকিয়ে রাখে। এই নব-যৌবনের দলের সঙ্গে শীতের খোঁজে বেরলে তবে অবশেষে আবিষ্কার করা যায় যে তার মায়াবী রূপের আড়ালে রয়েছে সর্দারের নবীনতর উজ্জ্বলতর রূপ।"

Dr. Thompson স্বীকার করিয়াছেন যে, রূপক-সাহিত্য তিনি ভালবাসেন না এবং বুঝিতেও পারেন না। অথচ রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্দরে প্রবেশ করিতে হইলে এই রূপকের অন্তরালে যে-সত্য আছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। Dr. Thompson তাহা করেন নাই—রবীন্দ্র-সাহিত্যের দ্বারে দাঁড়াইয়া শিকল নাড়িয়াই তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে হইয়াছে। তাই ফাল্গুনীর রস তিনি গ্রহণ করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন—

'Phalguni falls short as literature. Phalguni is incoherent and chaotic and choked with iteration.'

ফাল্গুনীর অভিনয় দেখিয়া অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন—"The conception is thin, and the execution just tolerable"—এবং তাঁহার মতকে Dr. Thompson সমর্থন করিয়াছেন। ইঁহারা সব ফাল্গুনী-নাটকের "দাদা"র দল—দাদার স্থূল দৃষ্টিতে ফাল্গুনীর উৎসব অর্থহীন বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। "দাদা" 'কবিশেখরের" কবিতা সম্বন্ধে এই আপত্তি জানাইয়া বলিয়াছেন—

"আমার কবিতা ত তোদের কবিশেখরের কল্পমঞ্জরীর মত সৌখীন কাব্যের ফুলের চাষ নয় যে, কেবল বাইরের হাওয়ায় দোল খাবে। এতে সার আছে রে, ভার আছে।"

যাঁহারা ভার চাহেন তাঁহারা ফাল্গুনের চলচঞ্চল নব পল্লবদলের মর্মবাণী কি করিয়া শুনিবেন? ফাল্গুনের গুণে পৃথিবীর ধূলামাটি পর্যন্ত যখন শিহরিয়া উঠিয়াছে, তখনও "দাদা"র গায়ে বসন্তের আমেজ লাগে নাই।

ফাল্গুনী কাব্যনাট্যে দুইটি অংশ আছে, একটি গীতিকলা, অন্যটি নাট্যকলা। একটিতে আছে প্রকৃতির কথা, অন্যটিতে আছে মানুষের কথা। প্রকৃতির কথা

ও মানুষের কথা বিশ্ববীণার একতারায় বাঁধা, অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত। কবি গীতিকলার ভিতর দিয়া প্রকৃতির মর্মকথা ব্যক্ত করিয়াছেন—বসন্তের মধ্যে শীতের পরিণতি, অর্থাৎ বিরোধ ঘটিল বলিয়াই মিলন ঘটিল। ফাল্গুনের বেণুবনে কবি বাহির হইয়া দেখিলেন যে, চিরনবীন বসন্তের সাড়া শাখায় শাখায় জানাইয়া দিল, নূতন পাতার পুলক-ছাওয়া পরশখানি বুলাইয়া দিয়া গেল; পলাশ-রাঙা রঙের শিখায় দিকে দিকে আগুন জ্বালিল, শিরীষ মৃদু হাসিল, চাঁপা গন্ধে ভরিয়া উঠিল। ডালে ডালে ফুলে ফুলে, পাতায় পাতায়, আড়ালে আড়ালে, কোণে কোণে ফাগুন লাগিল। শীত বিদায় নিল, "মাঘ মরিলো ফাগুন হয়ে, খেয়ে ফুলের মার গো।" তাই বকুল, পারুল, আমের মুকুল, শিমুল কামিনীফুল, নবীন পাতা, সবই নূতন বেশে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ফাল্গুনের এই রূপ বৃথা, যদি ইহার সঙ্গে মানুষের যোগ না থাকে। তাই এই বসন্তের দোলা প্রাণে গানের ঢেউ তুলিয়া দিল, বসন্তের ছোঁয়া লাগাতেই মানুষ তাহার সকল কথা ভুলিয়া গেল। এই বসন্তের সুরের আবীরে মানুষের মন রঙিন হইয়া উঠিল। সেই রঙিন প্রাণ বসন্তের মন্ত্রে দুরন্ত হইয়া সাথী খুঁজিতে বাহির হইল—তাহারা মরণকে মানিতে চায় না, কালের ফাঁসি অস্বীকার করিয়া ফাল্গুনের সমস্ত ধন লুট করিতে চায়। তাহারা শুনিতে পাইল যে, জলে স্থলে যাদুঘরের ভেরী বাজিয়া উঠিল। সেই ভেরীর শব্দে তাহাদের বাঁধন টুটিয়া গেল, ফাল্গুনের ফুলে ফুলে যৌবনের কূলে কূলে তাহারা দুলিয়া উঠিল, তাই সকলে মিলিয়া গাহিল—

'যা আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড় অনন্তে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।'

গানের অংশে রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন কি করিয়া শীত বিদায় গ্রহণ করিল এবং ফাল্গুনের আগমনে নানা রঙে রঙে মানুষের মনে আগুন ধরিল এবং যৌবনের গানে তাহারা অনন্তের মধ্যে বেহিসাবী হইয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িল। প্রকৃতির নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের রহস্যের খবর পাইলেন। নাট্যকলার ভিতর দিয়া কবি বলিলেন যে, মৃত্যুকে লইয়াই অমৃত এবং জীবনের উৎসব হইল আনন্দের উৎসব। ফাল্গুনীর গানের অংশ হইল নাট্যকলার চাবি—গানের চাবি দিয়াই এই নাটকের এক একটি অঙ্কের দরজা খোলা হইয়াছে—নাটকের কথাই গানে গানে ঘোষণা করা হইয়াছে। বসন্ত চিরকালের চিরনবীন—বিদায় হইল তাহার ছদ্মবেশ।

পুরাতনের ভিতর দিয়া নূতনকে পাইতে হয়—যে বসন্ত বারে বারে বিদায় লইয়া যায়, সেই আবার নূতন হইয়া ফিরিয়া আসে; কোথাও বিনাশ নাই, এই লীলাপ্রবাহ অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে।

ফাল্গুনীর নাট্যকথা চারিটি অংশে বিবৃত—সূত্রপাত, সন্ধান, সন্দেহ ও সমাপ্তি। সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথ কবিশেখরের মুখ দিয়া ফাল্গুনীকাব্যনাট্যের প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। কবিশেখর বলিয়াছেন—

"আমাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র—ইহাই সবচেয়ে বৈরাগ্যের মন্ত্র; অপর্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে যারা পেয়েছে, তারাই জয় করে—ত্যাগও তারাই করে, বাঁচতেও তারাই জানে। ওরে যৌবনের বৈরাগীদল, বেরিয়ে পড় প্রাণের সদর রাস্তায়। আমরা ডাক দিয়েচি সকলের সব সুখ দুঃখকে চলার লীলায় বয়ে নিয়ে যাবার জন্য। আপনাকে ঢেলে দিলেই আপনাকে পাওয়া যায়। যাদের দেওয়া যায়, তাদের পাওয়াও ফুরিয়ে যায়। বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে-লীলা চলচে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনেরই সেই একই লীলা।'

এই নাটকের প্রধান পাত্র চারিজন। একজন সর্দার—সে যুবকদলকে চালাইয়া লইয়া যায়। যৌবনের জীবনীশক্তি যে মানুষের মনোবৃত্তিকে নানাভাবে উৎসবময় করিয়া তোলে, সর্দারকে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ সেই কথাই মনে হয়। চন্দ্রহাস—তাহাকে আমরা ভালবাসি; আমাদের প্রাণকে সে-ই প্রিয় করিয়াছে। দাদা—প্রাণের আনন্দকে সে অনাবশ্যক মনে করে; কাজটাকেই সে প্রধান ভাবে। তাই দাদা যুবকদলের উৎসবযাত্রায় তাল রাখিতে পারে নাই। বাউল—সমস্ত প্রাণ দিয়া বিশ্বকে সে আলিঙ্গন করে; পুঁথির চোখ, তর্কের চোখ তার কাণা, সমস্ত হৃদয় দিয়া সে বিশ্বের আনন্দ খেলায় যোগ দিয়াছে—তাহার অন্তরে ও বাহিরে একই সংগীত।

ফাল্গুনী নাটকের একটি প্রধান সুর যে, জগতের প্রাণের কথা জানিতে হইলে কেবল খেলার সঙ্গে যোগ দিয়া, আনন্দের স্রোতে যোগ দিয়াই জানিতে পারা যায়—কোন কূটতর্কের দ্বারা নয়, কোন দার্শনিক তত্ত্বের সাহায্যে নয়। সর্দার যুবকদলকে বলিল, 'পুঁথির বুলি দেশে ঢুকলে যে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে যাবি, কার্তিক মাসের সাদা কুয়াশার মত, তোদের মনের মধ্যে একটুও রক্তের রং থাকবে না।'

দাদা তর্ক করিতে চায়, খেলিতে চায় না। তাই বিরক্ত হইয়া সে বলিল—'খেলা, দিনরাতই খেলা?' যুবকদল উত্তর দেয়—

'খেলা মোদের লড়াই করা,
খেলা মোদের বাঁচা মরা,
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই।'

দাদা বলে—"সময় কাজের বিত্ত, খেলা তাহে চুরি।" যুবকদল বলে—

'খেলতে খেলতে ফুটেছে ফুল,
খেলতে খেলতে ফল যে ফলে,
খেলারই ঢেউ জলে স্থলে।
ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে
খেলার আগুন যখন লাগে
ভাঙাচোরা জলে' যে হয় ছাই।'

প্রভাতকুমার তাঁহার 'রবীন্দ্র-জীবনী' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিকদের প্রতীক দাদাকে খাড়া করিয়া কবি যে কিছু ব্যঙ্গ না করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। তবে ফাল্গুনী সুরে, গানে, রঙে, গতিতে এমনি চঞ্চল যে, শ্লেষটা তেমন ভাবে গায়ে লাগে না। সেই দাদাকে অবশেষে যুবকদল উৎসবে টানিয়া আনিল, নব পল্লবের মুকুট দিয়া নব মল্লিকার মালা কণ্ঠে পরাইয়া তাহাকে সাজাইল। চন্দ্রহাস দাদাকে বলিল, "পৃথিবীতে এই আমরা ছাড়া আর কেউ তোমার আদর বুঝবে না।' উৎসবের বন্যাস্রোতে দাদার সংকোচ, দ্বিধা, সব ভাসিয়া গেল।

এই যুবকদল বিশ্বাস করে যে, "আমরাই চিরকালের", "আমরাই বারে বারে", "আমরাই ফিরে ফিরে", "আমরাই আছি, আমরাই সত্য", "আমরাই চলিগো, চলিগো, যাইগো চলে"। এই চলাই খেলা, এই খেলাতে আনন্দ, এই আনন্দই সত্য, এই সত্যের সাহায্যে এই অনন্ত লীলাপ্রবাহের উপলব্ধি। এই খেলার মূলমন্ত্র—

'আমরা চাইনে আরাম, চাইনে বিরাম,
চাইনে যে ফল, চাইনে রে নাম,
মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি,
সমান খেলি জিতে হারে,—
আমাদের ভয় কাহারে?'

তাই যুবকদলের কোন ভয় নাই—তাহাদের রাস্তা সোজা, সেথানে গলি নাই; গগনতলে পথের প্রদীপ জলে, তাই তাহারা চলে, পথের বাঁশি বাজাইয়া, চলার

হাসি ছড়াইয়া এবং রঙিন বসন উড়াইয়া। এই যুবকদল "বুড়া"র সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। এই "বুড়ো" হইল জরা ও মৃত্যু। এই বার্ধক্য ও মৃত্যুকে সকলেই ভয় করে। বাউলের উপদেশ মত চলিতে চলিতে চন্দ্রহাস মৃত্যুগুহার মধ্যে প্রবেশ করিল। যেই সে বুড়াকে ধরিয়া ফেলিল, অমনি দেখিতে পাইল যে, সে সর্দার ভিন্ন আর কেউ নয় এবং তাহাকে বালকের মত মনে হইল। পিছন হইতে যাহাকে বুড়া বলিয়া ভুল হইল, সামনে আসিয়া দেখিল সে বালক। সর্দার চলে এবং চালায় যৌবনের জীবনীশক্তিতে; এই অন্ধবাউল চলে অনুভূতির সাহায্যে। এই অনুভূতিই প্রথপ্রদর্শক—তর্ক ও বিচার দ্বারা কোন সত্যকে ধরা যায় না। চন্দ্রহাস বুড়াকে ধরিতে পারিল না, কারণ ধরিয়া আনিয়া দেখিল যে সে বালক।

তাই চন্দ্রহাস বলিল—

বুড়ো কোথায়?

সর্দার—কোথাও ত নেই।

কোথাও না?

সর্দার—না।

তবে সে কি?

সর্দার—সে স্বপ্ন।

চন্দ্রহাস—তবে তুমিই চিরকালের?

সর্দার - হাঁ।

পিছন থেকে যাঁরা তোমাকে দেখলে, তাঁরা যে তোমাকে কত লোকে কত রকম মনে করলে তা'র ঠিক নেই।

সেই ধূলোর ভিতর থেকে আমরা ত তোমাকে চিনতে পারি নি।

তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হ'ল। তারপর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্ছে যেন তুমি বালক।

যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম।

চন্দ্রহাস—এ ত বড় আশ্চর্য। তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম।

এই রূপান্তরের খেলা বিশ্বে চলিতেছে, এর শেষ নাই কারণ বিলয়ের মধ্যেই প্রকাশ; তাই বাউল গান ধরিল—

'তোমায় নূতন করে পাব ব'লে,
হারাই ক্ষণে ক্ষণে—
ও মোর ভালবাসার ধন।

দেখা দেবে বলে' তুমি
হও যে অদর্শন
ও মোর ভালবাসার ধন।
তুমি আমার নও আড়ালের,
তুমি আমার চিরকালের,
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে
হও যে নিমগন,
ও মোর ভালবাসার ধন।'

তাই যুবকদল উৎসব আরম্ভ করিল—

'আয় রে তবে, মাত রে সবে আনন্দে,
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।'

সমস্ত নাটকখানি একটি বসন্তোৎসব। যৌবনের এই অবিরাম চলার বাণী, উৎসবের এই আনন্দসংগীত, বিশ্বজগতে এই লীলাখেলার অনন্ত প্রবাহ—ফাল্গুনী নাটকে ইহারই আবাহন, ইহারই ঘোষণা, ইহারই বিজয়বার্তা পাওয়া যায়। "Phalguni is, in a special sense, the poet's own manifesto."

ডাকঘর

'ডাকঘর' একটি বিগ্রহরূপী নাটক। ইহাতে নাটকত্ব কিছুই নাই, অথচ নাটকের আবরণে রবীন্দ্রনাথ নিজের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। মানুষের অন্তরে অন্তরের ডাক আসে; তখন সে সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে চায়। অথচ তাহার চতুর্দিকে শৃঙ্খল, ইহাকে টুটিতে হইবে, নহিলে তাহার মুক্তির সম্ভাবনা নাই; চতুর্দিকের বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করিতে হইবে, তাহাকে এড়াইয়া অনন্তের সুরের ধ্বনিকে অনুগমন করা সম্ভব নহে। এই অনন্তের পিপাসা প্রবল হইলেও, ইহা যে-রসকে জাগায়, তাহার ভিতর রহস্য ও অস্পষ্টতা থাকে, এই রহস্য প্রকাশ করিতে হইলে রূপকের সাহায্য প্রয়োজন। এই রূপকের সাহায্যে অনেক কথা অকথিত থাকিলেও এমন ইঙ্গিত বা ইশারা থাকে, যাহা অনুধাবন করিয়া সেই রসলোকে পৌছানো সহজ হয়। বাঁধা সড়ক হাঁটিয়া পার হওয়া সহজ—নদীর খেয়া পার হওয়া তত সহজ নয়। রাজপথে সংকেতের প্রয়োজন হয় না, কারণ পথ পথকে দেখাইয়া নেয়। খেয়া পার হইবার

সময় ওপারের ইশারার প্রয়োজন ; যে নাবিক সেই ইঙ্গিত না ধরিতে পারে, সে পথ হারায়, নদী পার হইলেও ঠিক খেয়া ঘাটে পৌঁছিতে পারে না, তাই ইশারার প্রয়োজন এবং ইশারাকে গ্রহণ করিবার মত রসবোধ থাকাও প্রয়োজন। কবি ডাকঘর নাটিকায় ইশারার সাহায্যে মানবাত্মার মুক্তির অভিযানকে প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দু বিগ্রহ মানে ; বিগ্রহের ছল তাহার কাছে কিছু বিস্ময়কর নহে। কিন্তু বিগ্রহ মানিতে গিয়া আমরা বিগ্রহাতীত বস্তুকে আর অন্বেষণ করি না। ফলে, অরূপকে রূপের সাহায্যে পাইতে গিয়া আমরা রূপসাধনায় নিজেদেরকে ডুবাইয়া দিয়াছি। বিগ্রহের পরিসমাপ্তি যে বিগ্রহে নয়, এই বোধকে সজাগ না রাখিলে বিগ্রহরূপী নাটকের রহস্য আমাদের কাছে ধরা দিবে না। বুদ্ধির সাহায্যে রূপক নাটকের নাগাল পাওয়া যায় না বলিয়াই স্বজ্ঞার (Intuition-এর) সাহায্য লইতে হয়। তাই রূপক নাটকের ব্যাখ্যায় তেমন সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। একই নাটক নানা লোকের চিত্তে নানা রং ফলাইতে পারে ; এই সব রূপক নাটক কবির কোন বিশেষ চিন্তাধারার বাহন—তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেই রূপক নাটক সার্থক ; নাটকের ঘটনা শুধু কবির বক্তব্যকে প্রকাশ করিবার ছলমাত্র। তাই রূপক নাটিকাকে বিচার করিতে হইলে ভিন্ন মাপকাঠির প্রয়োজন—নাটক-রচনার প্রচলিত নীতি বা রীতি সেখানে পাওয়া যাইবে না। *

* অভিনয়ের দিক হইতে এবং দর্শকের চিত্তবিনোদনের জন্য এইরূপ রূপক নাটিকা লিখিত হয় নাই। ডক্টর পি. গুহ ঠাকুরতা 'ডাকঘর' নাটিকা সম্বন্ধে সেই কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"It is difficult to judge either of these two plays (Achalayatan and Dakghar) by the ordinary rules of the stage, for they do not fulfil any of the conditions required by stagecraft in its accepted sense, nor does the dramatist make any pretensions of this sort. He has conceived them aesthetically, and wants them to be understood aesthetically too. They are not dramas of circumstances. It is the permeating idea in them that matters, in such European plays of this type as Gerhart Hauptmann's 'Hannelles Himmelfahrt', August Strindberg's 'Dream Play', Maurice Maeterlinck's 'Blue Bird', and Ibsen's 'When We Dead Awaken' ....The character (Amal) is not so much a person of flesh and blood as a personification of the poet's own subjective experience. It is, as it were, a part of universal life-force, and it functions not in the grosser world of matter but in the realm of spirit." (The Bengali Drama)

গল্পের ঘটনা সহজ। অমল—সে রুগ্ন বালক। কবিরাজের আদেশে তাহাকে ঘরের ভিতর বদ্ধ থাকিতে হইবে কিন্তু সেই বালক বাহিরে যাইবার জন্য পাগল। অমল রাজার চিঠি পাইবে বলিয়া আশায় বসিয়া থাকে—দেশের মোড়ল তাহাকে বিদ্রূপ করে। রাজকবিরাজ আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, রাজা নিজেই আসিবেন। অমল ঘুমাইয়া পড়িল, অর্থাৎ তাহার মৃত্যু ঘটিল। বালিকা সুধা ফুল লইয়া আসিয়া দেখিল যে অমল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে অমলের জন্য ফুল রাখিয়া চলিয়া গেল।

সাধারণ দৃষ্টিতে ঘটনাটি সহজ ও সরল—ঘটনার ভিতর কোন সংঘাত নাই। যে-সব চরিত্র আসিয়া ভিড় করিয়াছে, তাহারা শিল্পীর সহজ টানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঘাত-প্রতিঘাতের কোন বালাই নাই। কিন্তু এই সহজ ঘটনার অন্তরালে রবীন্দ্রনাথ যে দ্বন্দ্বলীলা দেখাইয়াছেন, তাহা এই নাটিকাটিকে অপূর্বতার রূপে মণ্ডিত করিয়াছে। চিকিৎসকের ব্যবস্থায় অমল গৃহের প্রাচীরের ভিতর বন্দী—শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু তাহার পক্ষে বর্জনীয়। কিন্তু অমল বাহিরে ছুটিয়া গিয়া খেলা করিতে চায়। এই বন্ধন আমাদের মানবাত্মার বন্ধন। মানুষের গড়া সংস্কার ও লেখা শাস্ত্র, সমাজের বিধি নিষেধ চতুর্দিকে এমন বেড়াজাল সৃষ্টি করিয়াছে যে, মানুষ মুক্তির আহ্বানে পথে পথে বাধা পায়, এবং পদে পদে আহত হয়। মুক্তি আসে প্রেমের সাহায্যে, জ্ঞানের সাহায্যে নয়; এই মুক্তি আসে নিজেকে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া, প্রাচীরের ভিতর নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিয়া নয়; এই মুক্তির ডাক শুনিতে হইলে খোলা হাওয়ায় যে-সুর ভাসিয়া বেড়ায়, তাহা শিখিতে হইবে; এই মুক্তিকে পাওয়া যায় মৃত্যুর ভিতর দিয়া। মানবাত্মার মুক্তির পথের সন্ধান "ডাকঘর" নাটিকা দিয়াছে।*

* 'ডাকঘর' সম্বন্ধে Prof. V. Lesny সহজভাবে ইহার ভিতরের রহস্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—

'Amal personifies man's longing for free and natural development. This longing is fettered by external trivialities, suppressed by those around us, who do not understand, or are not favourably inclined towards it. The doctor considers it a disease and says that it must be restricted, the headman of the village is ironical about it, and Madhab does not understand it, but a plain man, like Thakurdada, a flower-girl, or the children, understands it and submits to it. Amal himself expects his liberation to come through a message 'from the king'; his messenger comes and orders everything to be opened, so that Amal can be re-born in a world of freedom'.

মাধব দত্ত যেন এই ঘর-গড়া সংসারের প্রতীক। তিনি অমলকে লক্ষ্য করিয়া কবিরাজকে বলিলেন:

"যখন ও ছিল না, তখন ছিলই না—কোন ভাবনাই ছিল না। এখন ও কোথা থেকে এসে আমার ঘর জুড়ে' বসলো; ও চ'লে গেছে আমার এ-ঘর যেন আর ঘরই থাকবে না।"

তিনি ঠাকুর্দাকে বলিলেন—

"আগে টাকা রোজগার করতুম, সে কেবল একটা নেশার মত ছিল, না ক'রে কোনো মতে থাকতে পারতুম না। কিন্তু এখন যা টাকা করচি, সব ঐ ছেলে পাবে জেনে, উপার্জনে ভারি একটা আনন্দ পাচ্চি।"

মাধব দত্ত পাকা সংসারী—তিনি অর্থোপার্জন করিয়াছেন। জীবনে তিনি গ্রহণই করিয়াছেন এতকাল—তাই চতুর্দিকে একটা রিক্ততা ছিল। অমলকে পোষ্য লইয়া, অমলকে ভালবাসিয়া তাঁহার মনের রিক্ততা ঘুচিয়াছে। আজ তাঁহার প্রাণ ভরিয়া আছে—অর্থোপার্জনে তিনি আনন্দ পাইতেছেন। এই অপ্রয়োজনের যে কতটা প্রয়োজন, এই বেহিসাবী হওয়ার ভিতর যে কতটা আনন্দ, মাধব দত্ত অমলকে পাইয়া বুঝিলেন—অমলের জন্য টাকা খরচ করা যেন টাকার পরম ভাগ্য। জীবনের শূন্যতা এইভাবে ভালবাসা দিয়াই ভরিয়া লইতে হয়—অমলের সংস্পর্শে আসিয়া মাধব দত্ত এই জীবনের শোভা ও মাধুর্যের খোঁজ পাইলেন। অমল বিশ্বে প্রেমের চিঠি বিলি করিয়া বেড়াইবে—তাহাতে সে সার্থক হইবে, যাহার দ্বারে গিয়া সে চিঠি দান করিবে সে-ও সার্থক হইবে। অমল তাই রাজার কাছে শেষ প্রার্থনা যাহা জানাইবে, তাহা হইল যে ডাকঘরের হরকরার কাজ—"আমি দেশে দেশে ঘরে ঘরে তাঁর চিঠি বিলি করব।" অমল তাই প্রথমেই মাধব দত্তকে বলিল—"আমি পণ্ডিত হ'বো না। আমি যা আছে সব দেখবো—কেবলি দেখে বেড়াবো।"

রবীন্দ্র সাহিত্যের ইহাই মূল সুর। রবীন্দ্রনাথ গতি-ধর্মে বিশ্বাস করেন, স্থাণু হইয়া বসিয়া থাকিলেই তাহার বিলয়। এই পরিবর্তনের স্রোতে কোথাও বিলয় নাই, কোথাও শেষ নাই। তাই অমল বলিল—"খুঁজে যদি না পাই তো আবার খুঁজব।" রবীন্দ্র-সাহিত্যে মানুষ এই অন্বেষণ চায়, ইহার সমাপ্তি চায় না; বিশ্বের মাঝে সে নিজে শোভা সৃষ্টি করিবে, সে সমস্ত রস গ্রহণ করিবে, আবার নিঃশেষে সে নিজেকে আত্মদান করিবে। এই সাধনা রবীন্দ্র-সাহিত্যকে ঐশ্বর্য-শালী করিয়াছে। অমল তাই বলিল—

"কত বাঁকা বাঁকা ঝরণার জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হ'তে হ'তে চ'লে যাবো—দুপুর বেলায় সবাই যখন ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে আছে, তখন আমি কোথায় কত দূরে কেবল কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাবো।"

এই চলিয়া যাওয়ার বিরতি নাই। কবি অমলের মুখ দিয়া মানবাত্মার আকাঙ্ক্ষা জানাইতেছেন। বাতায়নের ভিতর দিয়া অমল যে-বিশ্ব দেখিতে পাইল, যে বিশ্বকে অমল ভালবাসিয়া ফেলিল, সে-বিশ্বের ব্যাকুল বাঁশরি তাহাকে ডাক দিয়াছে—সে কাহাকেও অবহেলা না করিয়া সকলের তালে নিজেকে চালাইতে চায়। তাই দইওয়ালার সুর অমলকে উদাস করিল, প্রহরীকে দেখিয়া সে ভীত হইল না, মোড়লকে ভালবাসিয়া জয় করিল, বালিকা সুধার কাছে ফুল চাহিল এবং ছেলেদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। অমলের পক্ষে ঠাকুর্দা, অমলের বিরুদ্ধে মোড়ল—ঠাকুর্দা তাহাকে বিশ্বের কথা শোনায়, সেই পাখীদের দেশ, সেই নীল পাহাড়ের কথা; মোড়ল তাহাকে ভয় দেখায়, পরিহাস করে। ঠাকুর্দা একটি মুক্তপ্রাণ মানুষ, মোড়ল সংসার-জালে আবদ্ধ জীব।

ডাকঘরটা যেন আমাদের জীবন—এই ডাকঘর হইতে যে চিঠি বিলি হয়, তাহাতে সমস্ত জায়গায় ভালবাসা ছড়াইয়া পড়ে। এই ভালবাসাই আমাদের মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয়। যখন অমলের জানালার সামনেই রাজার ডাকঘর খোলা হইল, তখন হইতেই অমলের অস্বস্তি বোধ চলিয়া গেল, তাই অমল বলিল—

"আমাদের রাজার ডাকঘর দেখে অবধি এখন আমার রোজই ভালো লাগে—এই ঘরের মধ্যে ব'সে ব'সেই ভালো লাগে—একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছবে সে-কথা মনে করলেই আমি খুব খুসি হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি।

চিঠি বিলি করাই অমলের প্রিয় কাজ—কবির প্রিয় কাজ।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে জীবন ও মৃত্যু স্বতন্ত্র নয়—মৃত্যু জীবনের পরিণাম, বিনাশ নয়। তাই কবি মৃত্যুকে তাঁহার সাহিত্যে বরণ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কণ্ঠে মালা জড়াইয়াছেন, তাহাকে চুম্বনে ভূষিত করিয়াছেন এবং তাহারই প্রণয়ে সর্বদা বরণডালা লইয়া দুয়ারে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। রাজা হইল মৃত্যু বা প্রেমিক—সে স্বয়ং অমলের কাছে আসিবে, তখন আবার অমল ঘুম হইতে

জাগিবে। সুধা রাজকবিরাজকে এই কথাই বলিয়া গেল যে, অমল যখন জাগিবে তখন যেন সে জানাইয়া দিয়া বলে, 'সুধা তোমাকে ভোলেনি।' অমল মৃত্যুকে আগ্রহের সহিত বরণ করিয়া সুধার প্রেমকে পাইল। রাজকবিরাজ আসিয়া দেখিল যে, চারিদিকে সমস্তই বন্ধ, তাই সে বলিল—"খুলে দাও, খুলে দাও, যত দ্বার জানালা আছে সব খুলে দাও।" এই বন্ধন যখন টুটিয়া গেল তখন অমল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

"আমার আর কোন অসুখ নেই, কোন বেদনা নেই। আঃ, সব খুলে দিয়েছে —সব তারাগুলি দেখতে পাচ্চি—অন্ধকারের ওপারকার সব তারা।"

আমাদের জীবনে যখন রাজদূত আসিয়া আমাদের বন্ধদুয়ার ভাঙিয়া দিবে, তখন আমরাও অমলের মত বলিতে পারিব যে, "বেরতে পারলে আমি বাঁচি" এবং বাহির হইয়া সুধার ফুল আমাদের জীবনেও মিলিবে। তখনই আমাদের নূতন জাগরণ, আবার নূতন অভিযান এবং প্রেমের সাহায্যে নূতন জয়।*

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেমের মর্যাদা, প্রেমের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে। কবি চিঠি পান, তাহার লেখা বুঝিতে পারেন না, কিন্তু সেই চিঠি যে প্রেমের বার্তা ঘোষণা করিতেছে, তিনি তাহা বুঝেন। অন্তর্দৃষ্টি যাহার আছে সে এই চিঠি পড়িতে পারে—এই চিঠি প্রেমের আহ্বান-লিপি, এই চিঠি পাইয়াই তিনি মুক্তির সন্ধান পান। প্রেমের মধ্য দিয়াই সার্থকতা, অথচ এই জীবনের লয় নাই, বিনাশ নাই। এই প্রেমকে পাইতে গিয়া অমল বাধা পাইয়াছে; সমাজের বাধা, শাস্ত্রের নিষেধ, প্রতিবেশীর ঈর্ষ্যা, সমস্তই তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। হইতে পারে, যাঁহারা এই বন্ধন-শৃঙ্খল গড়িতেছিলেন, তাঁহারাও অমলের মঙ্গলই চাহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, তাঁহারা অনন্তের সুরে বিমোহিত হয়েন নাই, তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজেদের চারিপাশে কণ্টকের

* এই মৃত্যু বাসরঘরের মিলনের মত মধুর; 'গৃহ-প্রবেশ' নাটকে যতীন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া সেই মিলনের শান্তি উপলব্ধি করিয়াছেন—

যতীন—মাসি, একটা কথা গর্ব করে বলতে পারি। যা' পাইনি তা' নিয়ে কোনদিন কাড়াকাড়ি করিনি। সমস্ত জীবন হাত জোড় করে' অপেক্ষাই করলুম, মিথ্যাকে চাইনি বলেই এত সবুর ক'রতে হ'লো।............ঘুমুতে বলো না, এখন আমার আর একটু জেগে থাকবার দরকার আছে। শুনতে পাচ্ছ না? আসচে। এখনি আসবে। চোখের উপর কি রকম সব ঘোর হয়ে আসচে। গোধূলি লগ্ন, গোধূলি লগ্ন আমার। বাসরঘরের দরজা খুলবে।—

যতীন—দরজাটা কি সব খুলে গেছে?

মাসি—সব খুলেচে।

বেড়া সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহারা মৃত্যুতে বিভীষিকা দেখেন, জীবনকে আংশিক-ভাবে গ্রহণ করেন। অমলের চিত্তে অনন্তের সুর ধ্বনিত হইয়াছে; সে জানে বিশ্বের সমগ্রমূর্তি, সে তাই ডাকহরকরা হইয়া প্রেমের চিঠি বিলি করিতে চায়। কিন্তু সেই বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে হইলে, তাহার মহারাজ আসিবেন নিশীথ রাত্রে; তাহার আয়োজনে অমল ব্যস্ত; মহারাজ আসিলেই সে তাঁহার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িবে। এই মহারাজের আগমন যখন হয়, তখন বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়। অমল বুঝিতে পারিল যে, তাহার চিঠি রওনা হইয়াছে—এই চিঠি আসিলেই তাহার মুক্তি। ঠাকুর্দা জিজ্ঞাসা করিল—

"কেমন করে জানলে?"

অমল বলিল—

"তা আমি জানিনে। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই—মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেচি—সে অনেকদিন আগে—কতদিন তা মনে পড়ে না। বলব? আমি দেখতে পাচ্চি, রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলি নেমে আস্‌চে—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কতদিন কতরাত ধ'রে সে কেবলি নেমে আস্‌ছে। পাহাড়ের গায়ের কাছে ঝরণার পথ যেখানে ফুরিয়েছে, সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধ'রে সে কেবলি চ'লে আস্‌চে—নদীর ধারে জোয়ারির ক্ষেত; তারি সরু গলির ভিতর দিয়ে সে কেবলি আস্‌চে—তা'র পরে আখের ক্ষেত—সেই আখের ক্ষেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলি চ'লে আস্‌চে—রাতদিন একলাটি চ'লে আস্‌চে; ক্ষেতের মধ্যে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকচে—নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই, কেবল কাদা-খোঁচা ল্যাজ দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্চে—আমি সমস্ত দেখতে পাচ্চি। যতই সে আস্‌চে দেখচি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুসি হ'য়ে হ'য়ে উঠ্‌চে।"

এই চিঠি মৃত্যু-বারতা লইয়া আসিতেছে না, ইহা প্রেমিকের আহ্বান-লিপি; এই প্রেম সমস্ত সম্বন্ধকে সমস্ত বৈচিত্র্যকে, সমস্ত পথকে স্বীকার করিয়া আসে—তাহার আগমন-ঘোষণায় মন খুসী হইয়া ওঠে, তাহার স্পর্শে মুক্তিলাভ ঘটে, তাহারই জোরে সুধার ফুল লাভ করা যায়।

যে ডাকহরকরার কাজ অমল রাজার কাছে প্রার্থনা করিবে, রবীন্দ্রনাথেরও সেই কাজ—"শূন্য কাগজে অক্ষর পড়িয়া দেওয়াই তো কবির কাজ।" এই নাটিকার ভিতর রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল সুরগুলি স্থান পাইয়াছে—তাহাতে যে-

সংগীত বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহা "ডাকঘর"কে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। অজিত-কুমার বলিয়াছেন—

"রবীন্দ্রনাথের এইখানেই আশ্চর্য কৃতিত্ব যে, তিনি তাঁহার সমস্ত জীবননাট্যের নানা অঙ্কের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলিকে এমন সরল একটি সূত্রের মধ্যে ভরিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা, সৌন্দর্যব্যাকুলতা, আধ্যাত্মিক বেদনা, সংশয়, দ্বন্দ্ব, অপেক্ষা, শান্তি, সমস্তই এই নাটিকায় কোথাও হয়ত একটি ছত্রে বা আধখানি পংক্তিতে তিনি ছুঁইয়া ছুঁইয়া গিয়াছেন,—কোথাও কোথাও সোজা পথ ছাড়িয়া গলিতে ঘুঁজিতে এমন সব রহস্য ছড়াইয়াছেন যে, বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়।"

ডাঃ থম্প্সন * রবীন্দ্রনাথের রূপক সাহিত্যের মর্মোদ্ঘাটনে অসমর্থ হইলেও 'ডাকঘর' নাট্টিকার রসসৌন্দর্য সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন—

"The Post-Office is a moving piece of work. It is full of feeling and the handling is extraordinarily delicate. The language is of an unsurpassable naturalness, the speech of the streets purged of all its grossness, yet robbed of not one drop of raciness. The dialogue flows in even, unhurried stream. We understand and sympathise as every one falls in love with Amal. The talk is such as every Indian village knows, the characters walk every Indian bazar···It is beautiful, touching, of one texture of simplicity throughout, and within its limits an almost perfect piece of art. It does successfully what both Shakespeare and Kalidas failed to do, brings on to the stage a child who neither 'shows off' nor is silly." (Rabindranath Tagore)

---

* 'ডাকঘর'-এর মর্মকথার চাবির সন্ধান Dr. Thompson পান নাই; যদি পাইতেন, তাহা হইলে অর্ধরাত্রে রাজার আগমন সংবাদ উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতে পারিতেন না—"We tire of these mysterious Kings, who always come at midnight." এই সব রহস্য বুঝিতে পারেন না বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন—'I frankly admit that it is literature of a kind that makes small appeal to me, though I believe I can see its merits in an objective and entirely intellectual fashion.' এই সব সমালোচককে আশঙ্কা করিয়াই অজিতকুমার চক্রবর্তী বলিয়াছিলেন যে, বুদ্ধির দৃষ্টি খণ্ডিত দৃষ্টি; আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সমগ্রতার রূপ পাওয়া যায়। এই দৃষ্টি লইয়াই রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধি মানুষের শেষ সম্বল নয়, তাহার সঙ্গে কেবল বহির্বিষয়মাত্রের যোগ—মানুষের অধ্যাত্মপ্রকৃতির গভীরতা মাপ করিতে বুদ্ধি অক্ষম।

অচলায়তন

ধর্মসাধনায় যে-দিকটা রসের, রবীন্দ্রনাথ সেই দিকটাকে প্রাধান্য দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের "রসের ধর্ম" না বুঝিতে পারিলে, অচলায়তনের মূল কথাটি পাঠকের কাছে ব্যক্ত হইবে না। এই নাটিকাটি হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলশ্রেণীর ভিতর এক তীব্র আন্দোলন আনিয়াছিল। তাঁহারা আহত হইয়াছিলেন, তাই বিরুদ্ধতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। নাটিকাটি ভাব-প্রধান, কাহিনী-প্রধান নয়। রবীন্দ্র-দর্শনের মাহাত্ম্যে অচলায়তন সমুজ্জ্বল, তাই অচলায়তনকে বুঝিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিকে জানিতে হইবে।

ধর্মের কাজ মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলাইয়া দেওয়া। ধর্ম বন্ধনকে ছেদন করে। ধর্মের মধ্যে যে রসমূর্তি আছে, সে বাঁধন ভাঙে এবং সকল মানুষকে এক জায়গায় ডাক দেয়। তাই ধর্মে কঠোর তত্ত্ব থাকিলেও তাহা ভক্তিরসে ও প্রেমরসে সুনম্র হইয়া উঠে। এই রসভাব মানুষের চিত্তকে জাগ্রত করে, প্রসারিত করে এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘুচাইয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের মতে, "ধর্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় ক'রে কঠিন হয়ে ওঠে, তখন সে মানুষকে রিক্ত করে দেয়, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির পথকে অবরুদ্ধ করে। মানুষ যখনি সত্যভাবে গভীরভাবে মিলেছে তখন কোন-একটি বিপুল রসের আবির্ভাবেই মিলেছে, প্রয়োজনে মেলেনি, তত্ত্বজ্ঞানে মেলে নি, আচারের শুষ্ক শাসনে মেলেনি।"

মানুষ জড়পিণ্ড, যখন তার মধ্যে রসের আবির্ভাব থাকে না। নীরস অবস্থাতে মানুষের অন্তরে নিশ্চলতা আসে, এবং সেই অন্তরের নিশ্চলতা বাহিরে নিশ্চলতা বিস্তার করে। মানুষের মন যখন গতিহীন, তখন বাহিরেও সে আবদ্ধভাবে থাকিতে ভালবাসে। সেই অবস্থায়, যত আচার বিচার, যত শাস্ত্র শাসন, যত পুনরাবৃত্তি চলিতে থাকে। রসের আবির্ভাবে মানুষের জড়ত্ব ঘুচিয়া যায়, এবং মানুষ তাহার গতিতেই ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য ও মুক্তি লাভ করে। নিয়মপালনের মধ্যে কাঠিন্য আছে কিন্তু রস নাই, তাহার মধ্যে অন্তহীন পুনরাবৃত্তি আছে কিন্তু সতেজ গতি নাই, দুঃখকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস আছে কিন্তু দুঃখকে স্বীকার করিয়া নিজেকে প্রেমে পরিপূর্ণ করিয়া সার্থক করিবার আনন্দ নাই। হিন্দু সমাজের মধ্যে বিভাগের অন্ত নাই। নিয়মের বেড়াজালে হিন্দুসমাজ আবদ্ধ—বাহিরের লোক হইতে সে বিচ্ছিন্ন, নিজের লোকের মধ্যে সে প্রাচীর

গড়িয়া তুলিয়াছে। তার শ্রী নাই। যেখানে শ্রী আছে, সেখানে বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য, মাধুর্য ও নিত্য চলনশীল প্রাণের লীলা আছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"শুষ্কতায় অনম্রতায় তার (অর্থাৎ ধর্ম সাধনার) সৌন্দর্যকে লোপ করে, তার সচলতাকে রোধ করে, তার বেদনাবোধকে অসাড় করে দেয়। ধর্মসাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং অক্ষুণ্ণ মাধুর্যের নিত্যবিকাশ। কঠোরতা যেমন স্বভাবতই আপনাকে স্বতন্ত্র রাখে, রস তেমনি স্বভাবতই অন্যের দিকে যায়। রসের ঐশ্বর্যে যে-লোক ধনী নম্রতাই তার প্রাচুর্যের লক্ষণ।"

হিন্দু-সমাজে সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ, তার ঘরের লোকের পক্ষে কেবলি বেড়া ও প্রাচীর, এই হিন্দু-সমাজকে রবীন্দ্রনাথ "অচলায়তন" আখ্যা দিয়াছেন। এই অচলায়তন শুষ্ক, কঠিন, রসহীন এবং গতিহীন। এতে মাধুর্য নাই, বন্ধনকে পাকা করিবার নিরন্তর চেষ্টা আছে। এতে মিলনতত্ত্ব নাই, শুধু গণ্ডি আঁকিবার প্রবৃত্তি আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় হিন্দু-সমাজকে "বরফের পিণ্ড" বলা যায়। "বরফের পিণ্ডের নিজের মধ্যে গতিতত্ত্ব নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবেই সে চলে। সুতরাং চলাটাই তার বন্ধনের পরিচয়। এই জন্যে বাইরে থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে চালনা করে নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙে যায়, তার ক্ষয় হতে থাকে—এইজন্য চলা ও আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে থাকাই তার স্বাভাবিক অবস্থা।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সমাজে ঝরণার গতি চাহেন, কারণ "ঝরণার যে-গতি সে তার নিজেরি গতি,—সেইজন্যে এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি, তার সৌন্দর্য। এইজন্য গতিপথে সে যত আঘাত পায় ততই তাকে বৈচিত্র্য দান করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।"

অচলায়তনে দুই ভাই—মহাপঞ্চক ও পঞ্চক। মহাপঞ্চক মন্ত্রতন্ত্র আচার আচমন ইত্যাদি পালন করেন, এবং সেই সব প্রাচীন বিধানে বিশ্বাস করেন। পঞ্চক গান ভালবাসেন, চলিতে চান, বদ্ধতা ভাঙিতে প্রস্তুত। অচলায়তনের আচার্য অচলায়তনের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বলিলেন—

"এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত—এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায়—তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শান্তি। গুরু, তুমি যখন আসবে, কিছু সরিয়ো না, কিছু আঘাত করো না—চারিদিকেই আমাদের শান্তি, সেই বুঝে

পা ফেলো। আমাদের পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের আর চলবার শক্তি নাই। অনেক বৎসর অনেক যুগ যে এমনি করেই কেটে গেল—প্রাচীন, প্রাচীন, সমস্ত প্রাচীন হয়ে গেছে—আজ হঠাৎ বোলো না যে নতুনকে চাই।'

এই অচলায়তন—এখানে সমস্ত প্রাচীন, সমস্ত সমাধান আছে, সমস্ত শিক্ষার অবসান হইয়া গেছে। কিন্তু পঞ্চক নতুনকে চায়। সে বলে—"যে নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না।" আচার ও নিয়ম তার কাছে শেষ কথা নয়। তাই সুভদ্র যখন অনুতপ্তভাবে বলিল "আমি জানালা খুলে বাইরে চেয়েছিলুম"—অচলায়তনে আরম্ভ হইল প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। কারণ মহাপঞ্চক বলিলেন—"আমরা এখন সকলেই অশুচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।" আচার্য বিচলিত হইলেন, মহাপঞ্চক উত্তেজিত হইলেন। আচার্য বলিয়া উঠিলেন—"সুভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্বাদ করে তার—।" মহাপঞ্চক চিন্তিত হইলেন—"আমরা অশুচি হয়ে রইলুম, আমাদের যাগ যজ্ঞ ব্রত উপবাস সমস্তই পণ্ড হতে থাকল, এ তো সহ্য করা শক্ত।"

পঞ্চক বলে—"খাঁচায় যে পাখীটার জন্ম, সে আকাশকেই সবচেয়ে ডরায়, সে লোহার শলাগুলোর মধ্যে দুঃখ পায় তবু দরজাটা খুলে দিলে তার বুক দুরদুর করে। ভাবে, বদ্ধ না থাকলে বাঁচব কী করে? আপনাকে সে নির্ভয়ে ছেড়ে দিতে শেখেনি। এইটেই আমাদের চিরকালের অভ্যাস।"

দাদাঠাকুর গুরুবেশে অচলায়তনে প্রবেশ করিলেন। তাঁর মূল কথা বুঝিতে পারিলে অচলায়তনের ভাঙার কৈফিয়ত পাওয়া যাইবে। দাদাঠাকুর বলেন—

(ক) "যখন সমস্ত পাই তখনি আসল জিনিসকে পাই। সেই জন্যে ঘরে আমি দরজা দিতে পারিনে—দিনরাত্রি সব খুলে রেখে দিই।"

(খ) "যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোন জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যে ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।"

প্রাণকে প্রাণ দিয়া জাগাইতে হয়। শুধু বাইরের প্রাচীর ভাঙিলে চলিবে না, ভিতরের লোহার দরজাও ভাঙিতে হইবে। এবং ভাঙার খেলাতে সার্থকতা থাকে না, যদি লড়িবার প্রয়াস না থাকে। তাই দাদাঠাকুর বলিলেন—

"কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে।"

দাদাঠাকুর পঞ্চককে বলিলেন—"অচলায়তনে আর সেই শাস্তি দেখতে পাবে না। তার দ্বার ফুটো করে দিয়ে আমি তার মধ্যেই লড়াইয়ের ঝোড়ো হাওয়া এনে দিয়েছি। নিজের নাসাগ্রভাগের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকবার দিন এখন চিরকালের মতো ঘুচিয়ে দিয়েছি।"

পঞ্চককে দাদাঠাকুর কাজ দিলেন—"যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চক বলিল—"সবাইকে কি কুলোবে?"

দাদাঠাকুর বলিলেন—"না যদি কুলোয় তাহলে এমনি করে দেয়াল আবার আর একদিন ভাঙতে হবে, সেই বুঝে গেঁথো, আমার আর কাজ বাড়িয়ো না।"

এই হইল অচলায়তন নাটিকার প্রাণের কথা। দাদাঠাকুর সবাইকে বলিলেন —"আমাদের পঞ্চক দাদার সঙ্গে মিলে ভাঙা ভিতের উপর আবার গাঁথতে লেগে যেতে হবে। নূতন সৌধের শাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও; মেল' তোমরা দুই দলে, লাগো তোমাদের কাজে।"

অচলায়তনে রুদ্ধচিত্তের বেদনা এবং নিশ্চল প্রাণহীন আচারের কদর্যতা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বাহ্যিকতা, নিরর্থক অনুষ্ঠান অন্তরের ক্ষুধা মিটায় না। যাঁহারা অভ্যাসের প্রতি আসক্ত, প্রাণহীন অনুষ্ঠানের সাহায্যে মুক্তির পথ খুঁজিয়া বেড়ান, সংস্কারের জড়তাকে ও আচারের শৃঙ্খলকে সহজ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা অচলায়তনের কাব্যরসে আহত হইয়াছিলেন। মন্ত্র যেখানে মননের সহায়, সেখানে মন্ত্র নিন্দনীয় নয়। ভাব রূপকে কামনা করে, কিন্তু রূপ যখন সেই ভাবকে পিষিয়া ফেলে, তখন সে মানুষের মনকে শুষ্ক করিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ সমালোচক-বর্গের কাছে নিবেদন করিয়াছিলেন—

"আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্ত হয় নাই—এই পাষাণ-প্রাচীরের চারি দিকেই তাহার মাথা ঠেকিয়া সে কোনো আশার পথ দেখিতেছে না। মনে করিবেন না অচলায়তনে আমি গালি দিয়াছি বা উপদেশ দিয়াছি। আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় শিকল নাড়া দিয়াছি, সে শিকল আমার, এবং সে শিকল সকলের। নাড়া দিলে হয়তো পায়ে বাজে। শিকল সে শিকলই সেই কথাটা যেমন করিয়া হউক জানাতেই হইবে।......যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহারা মানুষকে এই দুর্গতি হইতেই উদ্ধার করিতে আসেন। তাই অচলায়তনে এই আশার কথাই বলা হইয়াছে যে, যিনি গুরু তিনি সমস্ত আশ্রয়

ভাঙিয়া চুরিয়া দিয়া একটা শূন্যতা বিস্তার করিবার জন্য আসিতেছেন না; তিনি স্বভাবকে জাগাইবেন, অভাবকে ঘুচাইবেন, বিরুদ্ধকে মিলাইবেন; যেখানে আভাসমাত্র আছে সেখানে লক্ষ্যকে উপস্থিত করিবেন, এবং যেখানে তপ্ত বালু বিছানো খাদ পড়িয়া আছে মাত্র সেখানে প্রাণপরিপূর্ণ রসের ধারাকে বহাইয়া দিবেন।"

এডওয়ার্ড টমসন বলেন—"Its fable was probably suggested by "The Princess", and, more remotely, "The Castle of Indolence" and the "Faerie Queen."

রবীন্দ্রনাথ উক্ত মন্তব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"Castle of Indolence এবং Faerie Queen আমি পড়িনি—Princess-এর সঙ্গে অচলায়তনের সুদূরতম সাদৃশ্য আছে বলে আমার বোধ হয় না। আমাদের নিজেদের দেশে মঠ-মন্দিরের অভাব নেই—আকৃতি ও প্রকৃতিতে অচলায়তনের সঙ্গে তাদেরই মিল আছে।"

অচলায়তনের সত্য সকল দেশের সকল মানুষের সত্য। অচলায়তন নাটিকায় সেই সার্বজনীন সত্য ভারতবর্ষীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। দেশের মধ্যে যে আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে, যে আচার বুদ্ধিশক্তিকে আবদ্ধ করিয়াছে, যে শাস্ত্র ও মন্ত্র গতির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, ধর্মের নামে মানুষের মনে এবং সমাজ ব্যবস্থায় যে বন্ধন ও বিকৃতি আনিয়াছে, অচলায়তনে সেই বেদনার কথা রূপ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন—"যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে।" তাই পাপের বিরুদ্ধে, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করিবার এত প্রয়োজন আছে।

"তাসের দেশ" প্রহসনে সেই অচলায়তনের রূপকেই রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপ করিয়াছেন। "তাসের দেশ" দেশনেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গীকৃত হয়। এই অচলায়তনে প্রাণ সঞ্চার করিবার ব্রত সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাসের দেশে শুধু নিয়ম। সেখানে চলনটা প্রশংসনীয় নহে, কারণ চলাতে বিপদ বিস্তর। তাসের দেশে রাজপুত্র বিদেশী। "সে বলিল—যা চলবে না তাকেই আমরা চালাই।

ছক্কা বলিয়া উঠিল—কিন্তু নিয়ম।

রাজপুত্র—বেড়ার নিয়ম ভাঙলেই পথের নিয়ম আপনিই বেরিয়ে পড়ে, নইলে এগোবে কী করে।

পঞ্জা—ওরে ভাই, কী বলে এরা। এগোবে। অম্লান মুখে বলে বসল, এগোব।

• রাজপুত্র—নইলে চলা কিসের জন্যে।

ছক্কা—চলা। চলবে কেন তুমি। চলবে নিয়ম।”

তাসের দেশে চলে বেড়ার নিয়ম। তাই তাদের সঙ্গীতে সনাতন ছন্দ। তারা চলিবে সমান পথে সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া। তাসের দেশের লোকেরা প্রাণহীন পুতুল। “এ যে জীবন্মৃতের খাঁচা, নিয়মের জারকরসে জীর্ণ এদের মন।” তাসের দেশে শুধু নিয়ম, কোন চাঞ্চল্য নাই।

এক বিদেশী রাজপুত্র ও সদাগর তাসের দেশে নতুন চাঞ্চল্য আনিল। তাসের লোক মরাকে বলে বাঁচা। মানুষ আসিয়া তাসের দেশের বাঁধ ভাঙিয়া দিল —নতুন গান জাগিয়া উঠিল—

“বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও,
বাঁধ ভেঙে দাও।
বন্দী প্রাণমন হোক উধাও,
শুকনো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক
ভাঙনের জয়গান গাও।
জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক
যাক ভেসে থাক, যাক ভেসে যাক
আমরা শুনেছি ঐ
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
কোন নূতনেরি ডাক।”

অচলায়তন ও তাসের দেশ দু-ই বন্দীশালা। সেই বন্দীশালায় প্রাণ যখন জাগিয়া উঠিল, বদ্ধতা তখন বিদূরিত হইল। বন্দীশালায় পথের নিয়ম প্রবর্তিত হইল। তাই রবীন্দ্রনাথ বারবার এবং নানা ভাবে বলিয়াছেন যে, রাস্তাই ভাল এবং পথ চলাতেই আনন্দ। এই চলাকে বন্ধ করাই জগতের সবচেয়ে বড় অকল্যাণ।

রক্তকরবী

রক্তকরবীর নাট্যব্যাপার যে শহরকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহার নাম যক্ষপুরী। যক্ষপুরী এক জটিল আবরণে বাস করে। রাজমহলের বাহিরি দেয়ালে একটি জালের জানলা আছে—সেই জালের আড়াল থেকে রাজা মানুষের সঙ্গে দেখাশোনা করেন। শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে ব্যস্ত। এই রাজ্যের সর্দারগণ রাজার অন্তরঙ্গ পার্ষদ। খোদাইকরদের কাজের মধ্যে ফাঁক নাই। এই যক্ষপুরীতে আছে নন্দিনী—সে মানবী। তার প্রাণ আছে, প্রেম আছে। সে এই যক্ষপুরীর বন্ধনজালকে ভাঙিতে প্রবৃত্ত হইল।

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, রক্তকরবীর পালাটি রূপক নাট্য নয়। কিন্তু মানুষের যে চিরকালের সমস্যা, তাহা রূপ পাইয়াছে রক্তকরবী নাটকে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবলশক্তির প্রকাশ আছে। সেই শক্তির সাহায্যে মাটির তলা হইতে সোনার সংগ্রহ চলিতেছে। এই নিষ্ঠুর সংগ্রহের মধ্যে, লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য ব্যাহত হইয়াছে। সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। নন্দিনী লইয়া আসিল রসময় প্রাণের প্রবাহ, প্রেমের আনন্দ, নারীর মাধুর্য, যক্ষপুরে মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল বিশ্ব হইতে, ভুলিয়াছিল আনন্দকে। নন্দিনী আনন্দকে দাম দেয় বেশি। সে জানে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নাই, মানুষকে দাস করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে মানুষ নিজেকেই বন্দী করে। পীড়নের ভিতর দিয়া নন্দিনীর আত্ম-প্রকাশ। নারীশক্তির প্রবর্তনায় পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভাঙিয়া ফেলিয়া প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবীর প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন—

"আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন।"

যক্ষপুরীর সম্বন্ধে রক্তকরবীর অধ্যাপক বলেন—"আমরা যে সেই মরা ধনের শব সাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তাল-বেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে।"

নন্দিনী অধ্যাপককে বলিল—"আমি জালের বাধা মানিনে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে।"

ঘরে যাবার পথ বন্ধ। নন্দিনী জিজ্ঞাসা করে রাজাকে—"আচ্ছা রাজা, পৃথিবীর এই মরা ধন দিনরাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না?"

নেপথ্যে—কেন, ভয় কিসের ?

নন্দিনী—পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনি খুশি হয়ে দেয়। কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য বলে ছিনিয়ে নিয়ে আস, তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস। দেখছ না, এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিম্বা সন্দেহ করছে, কিম্বা ভয় পাচ্ছে।

নেপথ্যে—অভিসম্পাত ?

নন্দিনী—হাঁ, খুনোখুনি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত।

নেপথ্যে—শাপের কথা জানিনে। এ জানি যে আমরা শক্তি নিয়ে আসি। আমার শক্তিতে তুমি খুশী হও, নন্দিনী ?

নন্দিনী—ভারি খুশী লাগে। তাই তো বলছি আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশী হয়ে উঠুক।"

রাজা নন্দিনীকে বলে—"আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি। আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটুখানি দুর্বা ঘাসের মধ্যে যে-প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।"

নন্দিনী রাজাকে বলে—"তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ করে রেখে বঞ্চিত করেছ; সহজ হয়ে ধরা দাও না কেন।"

নন্দিনী জানে যে রঞ্জন আসিবে। নন্দিনী সেই মিলনের অপেক্ষায় আছে। নন্দিনী বলে—"আমার রঞ্জনের জোর তোমাদের শঙ্খিনী নদীর মতো। ওই নদীর মতোই সে যেমন হাসতেও পারে তেমনি ভাঙতেও পারে।"

রাজা নিজের শক্তির প্রমত্ততায় নিজেকে জালে বাঁধিয়াছে—এবং তারপর ছটফট করিতেছে। যক্ষপুরী নিজে আস্ত নয়, তাই কাহাকেও আস্ত রাখিতে চায় না, রাজা খণ্ডভাবে ধরিতে চায়, তাই সবাই তাহার কাছ হইতে পলাইয়া যায়। সমগ্রভাবে ধরিবার কৌশল রাজা আয়ত্ত করে নাই।

রাজা—সঙ্গীহীন। সে নিজের শক্তির গর্বে চলিতে চায়। রাজা বলে—"আমি হয় পাব, নয় নষ্ট করব। যাকে পাইনে তাকে দয়া করতে পারিনে। তাকে ভেঙে ফেলাও খুব একরকম ক'রে পাওয়া।"

নন্দিনী রাজাকে বলে—"মনে হয়, যে-জিনিসটাকে মন দিয়ে জানা যায় না, প্রাণ দিয়ে বোঝা যায়, তার 'পরে তোমার দরদ নেই।"

রাজা শ্রান্ত, তাহার ঘুমাইতে ভয় করে। সে যাদুকে বিদ্রূপ করে, সে সব

জিনিস ছিনাইয়া লইতে চায়। সে হুকুম করিতে জানে। রঞ্জন হুকুম মানিয়া কাজ করে না। প্রাণের আবেগে প্রেমের সঙ্গে পাইতে চায়। তাই রাজা ও নন্দিনীতে সংগ্রাম অর্থাৎ রাক্ষস ও মানবের দ্বন্দ্ব।

নন্দিনী প্রশ্ন করে—"জালের আড়ালে মানুষ চিরদিনই কি জালে বাঁধা থাকবে?"

রাজার দ্বার যেদিন খুলিল, নন্দিনী দেখিল যে রঞ্জনকে রাজা মারিয়া ফেলিয়াছে।

নন্দিনী বলিয়া উঠিল—"আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।"

রাজা—"আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি, তোমাকে যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি।"

নন্দিনী—"তার পর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।"

রাজা হার মানিল। রাজা বলিল—"চলো আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথী করো, নন্দিনী।"

নন্দিনী—"কোথায় যাব?"

রাজা—"আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারি হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছ না? সেই লড়াই শুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড; তুমি ছিঁড়ে ফেল ওর কেতন। আমারি হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক, তাতেই আমার মুক্তি।"

নন্দিনী যাইতে স্বীকৃত হইল, সে জানে—"রঞ্জন বেঁচে উঠবে—ও কখনো মরতে পারে না।"

রাজা প্রাণের সন্ধান পাইল—নন্দিনীর ডাকে জাগিয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"নাটকের মধ্যে কবি আভাস দিয়েছে যে, মাটি খুঁড়ে যে-পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়,—মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের, যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।"

রক্তকরবীতে যে-আভাস, যে-ইশারা, যে-ভাবধারা আছে, তাহাকে বুঝিতে হইলে রবীন্দ্র-দর্শনের তত্ত্বকথা জানিতে হইবে। মানুষের ধর্ম পথিকধর্ম—

চলাতেই তাহার আনন্দ, সে অনন্ত চেষ্টার কথা বলে, অনন্ত লাভের কথা বলে না। শক্তির ঐশ্বর্য মানুষকে থামিতে দেয় না। কিন্তু যে মানুষ পথিকধর্ম ত্যাগ করিয়া সঞ্চয়ীর ধর্ম গ্রহণ করে, সে শক্তির ঐশ্বর্য হারায়। মানুষ যখন ভাবে, আমি বলী, আমি জয়ী, আমি প্রতিষ্ঠিত, সে তখন সঞ্চয় করিতে চায়, সঞ্চিত ধনকে রক্ষা করিতে চায়। তখন সে সম্মুখের দিকে তাকায় না, যাহা পাইয়াছে, তাহাকে সযত্নে রক্ষা করিতে চায়। এই প্রবাহকে উপেক্ষা করিয়া যে থামিতে চায়, সে ডুবিয়া যায়। একদিকে থাকিবে স্থিতিহীন গতি, অন্যদিকে চলিবে পাওয়ার চেষ্টা। সেই পাওয়ার পথ বাহিরে নয়, প্রকৃতিতে নয়, শক্তিতে নয়। সেই পাওয়া প্রেমের ক্ষেত্রে। শক্তির ক্ষেত্রে যে পাওয়া তাতে আপনাকে বড় করিয়া, সফল করিয়া পাইতে হয়। প্রেমের ক্ষেত্রে যে পাওয়া, তাহা আপনাকে ত্যাগ করিয়া পাইতে হয়। শক্তির ঐশ্বর্যে ও প্রেমের আনন্দে যে ধনী সেই সার্থক। একদিকে অর্জন, অন্যদিকে বিসর্জন।

তাই প্রাকৃতিক ক্ষেত্র ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করা যায় না। পশ্চিম প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে জয় লাভ করিবার জন্য উন্মত্ত। ভারতবর্ষ আজ শ্রীভ্রষ্ট কারণ প্রকৃতির দিকে তার ঝোঁক অল্প। মানুষের সাধনা এই প্রকৃতি ও প্রাণের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপন করা। খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে আমাদের ভিতরকার প্রকৃতি ও আত্মার মধ্যে লড়াই বাধিয়া যায়। অচলায়তন, রক্তকরবী ও মুক্তধারা—এই নাটকগুলিতে সেই দ্বন্দ্বের কথাই আছে।

কর্ম দুই রকমের—এক প্রয়োজন থেকে, অন্য আনন্দ থেকে হয়। প্রয়োজনের তাগিদে যে কর্ম, তাহাতে বন্ধন আছে। আনন্দ থেকে যে কর্ম হয়, সেই কর্মেই মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ বলেন—"কর্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মুক্তি কর্মে। সমস্ত কর্মের লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং আনন্দের লক্ষ্য কর্মের দিকে।"

আমাদের কর্ম যখন স্বার্থের সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, বহুর দিকে প্রসারিত হয় না, তখন সেই কর্ম আনন্দ দেয় না। অতএব, "কর্মকে স্বার্থের দিক থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে যাওয়াই মুক্তি—কর্মত্যাগ করা মুক্তি নয়।" মানুষের মধ্যে একটা দিক আছে স্বার্থের দিক—আর একদিক আছে মানবত্বের দিক। এই মানবত্বকে জাগাইতে হইলে কর্মের দ্বারা নিজেকে দান করিয়া নিজের বদ্ধতাকে ঘুচাইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের মতে, এই মানবত্বের ভিতরেই "বিশ্বমানব" বিরাজ করিতেছে।

একথা ঠিক নয় যে, রবীন্দ্রনাথ একমাত্র অন্তর-জগৎকে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বাহিরকে অস্বীকার করেন নাই। আমাদের জীবনের ওজন নষ্ট হইয়া যায় যদি আমরা নিজেদের সমস্ত শক্তিকে বাহিরের বা অন্তরের কাজে নিঃশেষ করিয়া দেই। তিনি বলেন—"অন্তরে বাহিরে নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইবে। বাহিরের লোকালয়ের মধ্যে থাকিয়াও অন্তরের নিভৃত নিকেতনের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।"

মানুষের মধ্যে দুই কক্ষ আছে—বাহিরের (অর্থাৎ সংসারের) এবং অন্তরের। যে জিনিসটা বাহিরের তাহা বাহিরেই রাখিতে হইবে। সমস্যা তখনই ওঠে যখন বাহিরের জিনিস অন্তরের জগতে গিয়া বিকারের সৃষ্টি করে। যাহা স্থায়ী নয়, তাহাকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিলেই বিপদ ঘটে। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে, "যা অনিত্য, বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনে বিশেষ স্থানে যার প্রয়োগ এবং তার পরে যার শান্তি, তাকেই আমাদের অন্তরের নিত্যনিকেতনে নিয়ে বাঁধিয়ে রাখা এবং প্রত্যহই তার অনাবশ্যক খাদ্য জোগানোর জন্য ঘুরে মরা এইটেই হচ্ছে পাপ।" তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"অন্তরকে বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচাও। দুইকে মিশিয়ে এক করে দেখো না। সমস্তটাকেই কেবলমাত্র সংসারের অন্তর্গত করে জেনো না। তা যদি কর তবে সংসার সংকট থেকে উদ্ধার পাবার কোনো রাস্তা খুঁজে পাবে না।"

বাহিরে আমরা রূপকে দেখি, অন্তরে আমরা আনন্দ পাই। এই আনন্দকে পাওয়াতে মুক্তি। এই মুক্তি প্রেমের মুক্তি—"ত্যাগের মুক্তি নয়, যোগের মুক্তি; লয়ের মুক্তি নয়, প্রকাশের মুক্তি।" কারণ, "আমার মধ্যে যদি প্রেম না জাগে, আনন্দ না থাকে, তবে বিশ্ব আমার পক্ষে কারাগার। সেই কারাগার থেকে পালাবার চেষ্টা মিথ্যা, প্রেমকে জাগিয়ে তোলাই মুক্তি।"

মানুষ যেখানে সকলকে পায় সেখানেই তার মানবত্ব। মানুষ অর্জন করে, সঞ্চয় করে, আবিষ্কার করে, কিন্তু এই জন্যেই মানুষ বড় নয়। মানুষ বড় হয়, যখন তার বিশ্ববোধ জাগ্রত হয়। শুভবুদ্ধি দ্বারা মানুষের সঙ্গে যুক্ত হইতে হইবে। ভারতবর্ষের হৃদয় তাই মৈত্রেয়ীর ভাষণে ধরা দিল—"যেনাহং নামৃতা-স্যাম কিমহং তেন কুর্যাম?" সমস্তকে পাইতে হইলে আপনাকে দিতে হয়। আপনাকে ত্যাগ করিলে সমস্তকে লাভ করা যায়। মানুষের অনুভূতিকে বৃহত্তর করিতে হইবে। এই সর্বানুভূতির ভিতর মানুষের মানবত্ব লুকানো আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "এমনি করে অনুভু হয়েই মানুষ বড়ো হয়ে

উঠেছে, প্রভু হয়ে নয়। মানুষ যতই অনুভূ হবে প্রভুত্বের বাসনা ততই তার খর্ব হতে থাকবে। জায়গা জুড়ে থেকে মানুষ অধিকার করে না, যে পর্যন্ত মানুষের অনুভূতি সেই পর্যন্তই সে সত্য, সেই পর্যন্তই তার অধিকার।"

ভারতবর্ষে সাধনার মন্ত্র ছিল "আত্মানং বিদ্ধি।" আপনাকে জানিতে হইবে, আপনাকে পাইতে হইবে। এই আপনাকে পাইলে সমস্তকে পাওয়া যায়। আত্মোপলব্ধির লক্ষণ হইল আপনার সত্যের দ্বারা সকল সত্যের সঙ্গে যুক্ত হইয়া একটি সমগ্র হইয়া ওঠা। বিচ্ছিন্নরূপে রাখিলে নিজেকে পাওয়া যায় না। এই আত্মবোধ হইতে বিশ্ববোধ জাগিয়া ওঠে। সেই বিশ্ববোধ হইতে কর্মযোগের আনন্দ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, "আমাদের জীবনের প্রার্থনা হোক—

অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়।

(জড়তা হইতে আমাদের সত্যে লইয়া যাও, মূঢ়তা হইতে আমাদের জ্ঞানে লইয়া যাও, মৃত্যুর খণ্ডতা হইতে আমাদের অমৃতে লইয়া যাও)।"

মানুষের মধ্যে এক ক্ষুদ্র আমি আছে, আর এক বিশ্ব-আমি আছে। এই ক্ষুদ্র-আমির সঙ্গে বিশ্ব-আমির সংযোগে নূতন চৈতন্য, নূতন জাগরণ হয়। এই আমি-টুকুর মধ্যে অনন্ত দ্বন্দ্ব—যেদিকে সে পৃথক, সেই দিকে তার দুঃখ, তার পাপ, তার অহংকার, আর যেদিকে সে মিলিত, সেই দিকে তার আনন্দ, তার মাধুর্য, তার প্রেম। রবীন্দ্রনাথ বলেন—"মানুষের এই আমির একদিকে ভেদ এবং আর একদিকে অভেদ আছে বলেই মানুষের সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা হচ্ছে দ্বন্দ্ব সমাধানের প্রার্থনা।"

মুক্তধারা

মুক্তধারা নাটকে রাজসভার যন্ত্ররাজ বিভূতি বহুবৎসরের চেষ্টায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ গড়িয়া মুক্তধারা ঝরণাকে বাঁধিয়াছে। যন্ত্রী হইল বিভূতি, মন্ত্রী হইল ধনঞ্জয়, আর মানুষ হইল যুবরাজ অভিজিৎ। মুক্তধারা নাটকের মূল কথা হইল —যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করিয়াছে, এবং প্রাণ দিয়া যন্ত্রকে ভাঙিতে হইবে। যুবরাজ অভিজিৎ যন্ত্রের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে প্রাণ দিল।

বিভূতি মুক্তধারার ঝরণাকে বাঁধিল। সে যন্ত্ররাজ। সে যন্ত্রশক্তির মহিমার কথা জানে। তার লড়াই দৈবশক্তির সঙ্গে, মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে

না। কত মজুর প্রাণ দিয়াছে, কত চাষীর ক্ষেত নষ্ট হইয়াছে—এই সব ভাবনা তাকে পীড়া দেয় না, তার অহংকার যে, এই বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করিয়া মানুষের বুদ্ধি জয়ী হইয়াছে।

যুবরাজ অভিজিৎ বলিলেন—"মানুষের ভিতরকার রহস্য বিধাতা বাইরের কোথাও না কোথাও লিখে রেখে দেন। আমার অন্তরের কথা আছে ওই মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝতে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবন-স্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েছি তারই পথ খুলে দেবার জন্যে।"

অভিজিৎ এই কঠিনের সাধনায় নিজেকে ডুবাইয়া দিলেন। তিনি কাউকে আহ্বান করিলেন না। তিনি বলেন—"নিজের পথ তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার পিছনে যদি চল তাহলে আমিই তোমার পথকে আড়াল করব।"

অভিজিৎকে চিনিতে হইলে অভিজিৎ-এর আদর্শকে বুঝিতে হইবে। অভিজিৎ বলেন—

"স্রোতের পথ আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন করব।···সময় এখনই এসেছে এই কথাই জানি, কিন্তু সময় আবার আসবে কি না সে কথা কেউ জানে না। ······সকলের এক কাজ নয়, আমার উপর যে কাজ পড়েছে সে একলা আমারই ···যে ডাক আমি শুনেছি সে ডাক যদি তারাও শুনত তবে আমার জন্যে অপেক্ষা করত না। আমার ডাকে তারা পথ ভুলবে।"

যুবরাজ অভিজিৎ বাঁধের ত্রুটির সন্ধান পাইয়াছিলেন। সেইখানে তিনি যন্ত্রাসুরকে আঘাত করিলেন—সেই মুক্তধারার মুক্তিতে যুবরাজ স্বয়ং মুক্তি পাইলেন। অর্থাৎ প্রাণ দিয়া তিনি সবার প্রাণ জাগাইলেন, যন্ত্রকে ভাঙিলেন। উত্তরকূটের লোকেরা যুবরাজকে হারাইয়া চিরকালের জন্য তাঁহাকে পাইল। বাঁধ বাঁধিবার উৎসব বাঁধ-ভাঙার উৎসবে পরিণত হইল। এই হইল রবীন্দ্র-দর্শনের প্রাণ দিয়া প্রাণ পাওয়া—মৃত্যুর ভিতর অমৃতরূপে পৌছানো।

যন্ত্র দিয়া যাহারা মনুষ্যত্বকে আঘাত করে, তাহারাও সেই আঘাতে আহত হয়। একদল আছে যারা মারে। আর একদল আছে যারা মার খায়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, "যুবরাজ অভিজিৎ মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ, আর ধনঞ্জয় মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ।" অভিজিৎ মুক্ত হইবার জন্য প্রাণ দিল। কারণ প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইবে, মুক্তি দিতে হইবে।

মন্ত্রী বলে—"মার লাগিয়ে জয়ী হব।" ইহা বিভূতির কথা। মন্ত্রী বলে—"মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও।" ইহা হইল ধনঞ্জয়ের কথা। যে আঘাত করে, দুঃখ তারই। যারা আহত হয়, তারা আঘাতের অতীত হইয়া জয়ী হইতে পারে। তাই ধনঞ্জয় বলেন—"তোরা যে মনে মনে মরতে চাস তাই ভয় করিস, আমি মরতে চাইনে তাই ভয় করিনে। যার হিংসা আছে ভয় তাকে কামড়ে লেগে থাকে।"

ধনঞ্জয় প্রজাদের বলিলেন যে, আঘাতকে জয় করিতে হইবে, আঘাত করিয়া নয়, আঘাতের অতীত হইয়া। প্রায়শ্চিত্ত নাটকেও ধনঞ্জয় এই শিক্ষা দিতে বাহির হইয়াছিলেন। ধনঞ্জয় বৈরাগী—তিনি মারনেওয়ালাদের প্রতিনিধি হইয়া বলিতেছেন—

"আমি মারের সাগর পাড়ি দেব
বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে।
মা ভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে
ছেঁড়া পালে বুক ফুলিয়ে
তোমার ওই পারেতেই যাবে তরী
ছায়াবটের ছায়ে।"

মার খাওয়া হইতে বাঁচিতে হইলে আঘাত করিয়া জেতা যাইবে না, সহ্য করিয়াও মার খাওয়া বন্ধ করা যাইবে না। নিজের ভয়কে ভাঙিতে হইবে—মাথা তুলিয়া বলিতে হইবে যে আঘাত কোনভাবেই আঘাত করিতেছে না। ধনঞ্জয় প্রজাদের শিখাইলেন—

(ক) "ঢেউকে বাড়ি মারলে ঢেউ থামে না, হালটাকে স্থির করে রাখলে ঢেউ জয় করা যায়।"

(খ) "আসল মানুষটি যে তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে মরে।"

(গ) "মার এড়াবার জন্যেই তোরা হয় মরতে, নয় পালাতে থাকিস, দুটো একই কথা। দুটোতেই পশুর দলে ভেড়ায়, পশুপতির দেখা মেলে না।"

মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনে যে বাণী প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই অসহযোগতত্ত্বের মর্মকথা অসহযোগ আন্দোলনের বহুপূর্বে

প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভাষণে ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন।* আঘাতকে জয় করিতে হইলে হিংসাকে ত্যাগ করিতে হইবে, মানুষের ভিতরকার মনুষ্যত্বকে স্বীকার করিতে হইবে, ভয় ভাঙিতে হইবে, মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে হইবে এই কথাই সব কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের ধনঞ্জয় বলেন—"যে কথাটা পাকা, সেটাকে ভিতর থেকে পাকা করে না যদি বুঝিস তো মজবি।" অর্থাৎ, শুধু গুরুকে মানিলে চলিবে না, গুরুর কথাকে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়া বুঝিতে হইবে। রবীন্দ্র দর্শনে মনের অন্ধতা কোনদিন বড় স্থান পায় নাই। তাই যে-মন শুধু আঁকড়াইয়া ধরিতে জানে, বিচার করিতে জানে না, নিজের শক্তি সম্বন্ধে অচেতন, তাকে তিনি প্রশংসার চোখে দেখেন নাই। তাই ধনঞ্জয় প্রজাদের বলিলেন—"তোরা আমাকে যত জড়িয়ে ধরছিস তোদের সাঁতার শেখা ততই পিছিয়ে যাচ্ছে। আমারও পার হওয়া দায় হল।"

প্রজারা যখন বলে—"তোমাকেই আমরা বুঝি, কথা তোমার নাই বা বুঝলুম।" ধনঞ্জয় তখন বলেন—"তাহলেই সর্বনাশ হয়েছে।" প্রজারা বলে—"কথা বুঝতে সময় লাগে, সে তর সয় না। তোমাকে বুঝে নিয়েছি, তাতেই সকাল-সকাল তরে যাব।" ধনঞ্জয় বলেন—"তারপর পরে বিকেল যখনি হবে, তখনি দেখবি কূলের কাছে তরী এসে ডুবেছে।"

ধনঞ্জয় রাজাকে সুস্পষ্টভাবে বলিলেন—"লোভ করে যা রাখতে চাই সে হল চোরাই মাল, সে টিকবে না। রাজা, ভুল করছ এই যে, ভাবছ জগৎটাকে কেড়ে নিলেই জগৎ তোমার হল। ছেড়ে রাখলেই যাকে পাও, মুঠোর মধ্যে চাপতে গেলেই দেখবে সে ফসকে গেছে।" তাই ধনঞ্জয় প্রজাদের খাজনা দিতে বারণ করিলেন। ধনঞ্জয় রাজাকে বলিলেন—"আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।" কিন্তু প্রজাদের বার বার বলিলেন যে, "আমাকে পেয়ে আপনাকে হারাসনে।" প্রজারা ধনঞ্জয়কে দেবতা বলিয়া জানে, তাদের বলবুদ্ধির আশ্রয় বলিয়া জানে। এই জানা ধনঞ্জয়কে আঘাত করিল সবচেয়ে বেশি। ধনঞ্জয় দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিলেন যে, তাঁর কর্তব্য তফাতে থাকা। ধনঞ্জয় অনুতপ্ত ভাবে বলিলেন—"আমাকে পূজো দিয়ে ওরা অন্তরে অন্তরে দেউলে হতে চলল, সে দেনার দায় যে আমারও ঘাড়ে পড়বে, দেবতা ছাড়বেন না। আমি যদি পাকা করে ওদের মনের বাঁধ বেঁধে থাকি, তাহলে তোমার বিভূতিকে আর আমাকে ভৈরব যেন একসঙ্গেই তাড়া লাগান।"

* প্রায়শ্চিত্ত ১৩১৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

মুক্তধারার ঝরণাকে বন্ধন এবং মানুষের মনের ঝরণাকে বন্ধন—এই দুই বন্ধনের মুক্তির সন্ধান রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারা নাটকে দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দুই বন্ধনই পীড়াদায়ক—যন্ত্রের বন্ধন বা মন্ত্রের বন্ধন। ধনঞ্জয় বলিল, "জগৎটা বাণীময়, তার যে দিকটাতে শোনা বন্ধ করবি, সেইদিক থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে।" এই কথাই মুক্তধারা নাটকে ঘোষিত হইয়াছে।

তপতী

"রাজা ও রাণী" নাটক রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের রচনা। ইহা রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক লিখিবার চেষ্টা, এই নাটকের ত্রুটি পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথকে পীড়া দিয়াছিল। তাই তিনি "তপতী" লিখিলেন। এই নাটক নূতন করিয়া লেখা—পুরানো অসম্পূর্ণ রাজা ও রাণীর সংশোধন নহে।

তপতীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে—সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হলো, এইটেই রাজা ও রাণীর মূল কথা।"

রাজা ও রাণীর ত্রুটির কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন। প্রথম, কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়াছে। দ্বিতীয়, নাটকের শেষ অংশে কুমার অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তৃতীয়, এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য পরিণাম নয়, ইহাতে চমক উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে।

রাজ বিক্রম ও সুমিত্রার বিরোধকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য তপতী নাটক রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন। এই বিরোধ মানুষের মিলনের অন্তরায়, এই বিরোধের সমাধান আত্মশুদ্ধি ও আত্মবিসর্জন। সুমিত্রা বিক্রমকে গ্রহণ করিল দেশের জন্য, দশের জন্য। সুমিত্রা তাই বিক্রমকে বলিল—"মহারাজ, তোমার বিলাসে আমি সঙ্গিনী, তোমার রাজধর্মে আমি কেউ নই, এ-কথা মনে রেখে আমার সুখ নেই।" বিক্রম বলিল—"দেখো প্রিয়ে, রাজার হৃদয়েই তোমার অধিকার, রাজার কর্তব্যে নয়, এই কথা মনে রেখো।"

এইখানেই বিরোধের ইঙ্গিত। সুমিত্রা বুঝাইতে চেষ্টা করে যে "মহিষীকে

যদি গ্রহণ করো সেবিকাকেও পাইবে, নইলে শুধু দাসী, সে আমি নই।" তিনি অন্যায়ের হাত হইতে প্রজাদের রক্ষা করিতে চাহেন, তিনি রাণীর পদ প্রার্থনা করেন। কাশ্মীর হইতে যে লুব্রের দল জলান্ধরে আসিয়াছে, সুমিত্রা কাশ্মীর-কন্যা হইয়াও এই "বিদেশী অমাত্যদের" কাশ্মীরে পাঠাইয়া দিবার জন্য বিক্রমের কাছে আবেদন জানাইলেন। বিক্রমের ক্ষমার আশ্রয়ে প্রজাদের পীড়ন চলিবে বিদেশী অমাত্য দ্বারা, তাহা সুমিত্রাকে পীড়ন করিল। বিক্রম সেই কাশ্মীর-বন্ধুদের ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন, কারণ কাশ্মীর বিজয়ে তাহারা বিক্রমকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

বিক্রম বলে "সুমিত্রা তুমি জানো। আপনাকে প্রকাশ করো—দেখা দাও, ধরা দাও।"

সুমিত্রা বলে, "আমি তোমার সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাচ্চিনে—তোমার শক্তিকে অন্ধকারে ঢেকে রাখলে। তুমি জাগোনি।"

সুমিত্রা চায় রাণীর পদ। বিক্রম দিতে চায় নিজেকে সুমিত্রার পায়ে বিসর্জন। বিক্রম সুমিত্রাকে সব দিতে পারে, হৃদয়ের সর্বোচ্চ শিখরে আসন দিয়াছে। সুমিত্রা অভিযোগের সুরে বলে—"আমাকে কেন তুলে নিয়ে যাওনা তোমার সিংহাসনের পাশে?"

সুমিত্রা কাশ্মীরের কন্যা। কাশ্মীরের রক্ষার জন্য তিনি বিক্রমকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কাশ্মীরের প্রতি তাঁহার কর্তব্য স্মরণ করিয়া তিনি একটি মাত্র কথা মনে রাখিতে চাহিলেন যে, তিনি জলান্ধরের রাণী, তিনি বিক্রমকে ভালবাসেন। কিন্তু প্রজা রক্ষার করুণায় কাশ্মীরের অসম্মান স্বীকার করিয়া তিনি বিক্রমের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তখন কৈলাসনাথের মন্দিরে এই বরই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে "আমার বিবাহ যেন ভোগের না হয়।" সুমিত্রা জানে যে লোভ করিলেই অপমান তাকে স্পর্শ করিবে। সুমিত্রা বিক্রমের কাছে অজস্র পাইয়াছেন। তিনি বিক্রমকে অবজ্ঞা করিতে পারেন না—তাঁহার শক্তি আছে, অথচ তুচ্ছতা নাই, ক্ষুদ্রতা নাই। কিন্তু বিক্রমের উল্লাসের উদ্দামতা তাঁহাকে পীড়ন করে, বিক্রম সুমিত্রাকে চায় নিজের পাশে, সিংহাসনের পাশে নয়।

সুমিত্রা শিলাদিত্যের বিচার চাহিলেন। শিলাদিত্য সতীতীর্থদ্বারে কর স্থাপন করিয়াছে। দরিদ্র মেয়েদের পক্ষে সেই কর দেওয়া দুঃসাধ্য, সুন্দরী মেয়েদের পক্ষে অনেক বিপদ। সুমিত্রা আহত হইলেন—মহারাজা বিক্রমের সম্মতি আছে জানিয়া আরও ব্যথিত হইলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"অন্যায়-

কারীকে ক্ষুদ্র বলেই জানতে হবে—অতি ক্ষুদ্র—তার হাতে যত বড় একটা দণ্ড থাক। তাকে যদি ভয় করি তবে তার চেয়েও ক্ষুদ্র হতে হবে।”

এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুমিত্রা দাঁড়াইলেন। সুমিত্রা দেবদত্তকে বলিলেন, “বিধাতা যাদের অবজ্ঞা করেন তাদের দয়া করেন না তাও কি এরা জানে না? দ্বার ভেঙে ফেলুক না। বিচার ভয়ে ভয়ে চায় বলেই তো ওরা বিচার পায় না। রাজা যত বড়ো জোরের সঙ্গে ওদের কাছে কর দাবি করে, তত বড়ো জোরের সঙ্গেই ওদের বিচার চা'বার অধিকার আছে। ধর্মের বিধান মানুষের অনুগ্রহের দান নয়। আমাকে নিয়ে চলো, ঠাকুর, ওদের মাঝখানে।”

সুমিত্রা রাজাকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—“আমার স্থিতি তোমার প্রজাদের কল্যাণ-লক্ষ্মীর দ্বারে—সেখানকার ধুলির পরেও যদি আসন দিতে, আমার লজ্জা দূর হতো। যখন চারদিকেই সবাই বঞ্চিত তখন আমাকে যত বড়ো সম্পদই দাও, তাতে আমার রুচি হয় না।”

কিন্তু বিক্রম রাজকার্যের কর্ম ও ধর্ম সুমিত্রার সঙ্গে আলোচনা করিতে চাহিলেন না। বিক্রম সুমিত্রাকে বলিলেন—“এ সব কথা তোমার সঙ্গেও নয় এবং আজও নয়।” রাজার কার্যে অনধিকার হস্তক্ষেপ করাকে বিক্রম প্রশংসা করিতে পারিলেন না। তিনি সুমিত্রাকে বলিলেন—“আমার প্রেম, এ প্রকাণ্ড, এ প্রচণ্ড, এতে আছে আমার শৌর্য—আমার রাজপ্রতাপের চেয়ে এ ছোট নয়। তুমি যদি এর মহিমাকে স্বীকার করতে পারতে তাহলে সব সহজ হতো।”

সুমিত্রা সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, “তোমার চিত্ত-সমুদ্রে যে তুফান উঠেছে তাতে পাড়ি দেবার মতো আমার এ তরী নয়—উন্মত্ত হয়ে যদি ভাসিয়ে দিই তবে মুহূর্তে এ যাবে তলিয়ে।”

যখন বিক্রম জানিলেন যে মহারাণী রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া উত্তরের পথে চলিয়া গিয়াছেন, বিক্রম উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—“ফিরিয়ে নিয়ে এসো, ধ'রে নিয়ে এসো, বেঁধে নিয়ে এসো শৃঙ্খল দিয়ে, স্বৈরিণী।”

বিক্রম অরেও বলিলেন—“আমার পরিচয় পান নি। নিষ্ঠুর হবার প্রচণ্ড শক্তি আমার আছে। আমাকে ভয় করতে হবে—এইবার তা বুঝবেন।”

সুমিত্রা যে পত্র পাঠাইলেন, তাতে লেখা ছিল—“রূপ দিয়ে তোমাকে তৃপ্ত করতে পারিনি, শুভ কামনা দিয়ে তোমার রাজ্যের অকল্যাণ দূর করতে পারলুম না। আমাকে কামনা করো না, এই তোমার কাছে আমার শেষ নিবেদন। আমাকে ত্যাগ করো, তোমাদের শান্তি হোক।”

সুমিত্রার এই কাশ্মীরের দিকে চলিয়া যাওয়াকে ব্যাখ্যা করিয়া বিপাশা বলিল—"শিকল পরাতে পারেনি, খাঁচায় রেখেছিলো। পাখা বাঁধিয়ে দিয়েছিলো সোনা দিয়ে, ধরতে গিয়ে তাকে হারালো। এই হারানোর কী অপূর্ব মহিমা।"*

মহারাজ বিক্রম সুমিত্রাকে আনিতে গেলেন। সুমিত্রা এক দেবালয়ে আশ্রয় নিয়াছিলেন, এবং তিনি সেই দেবালয়ের পুরোহিতকে বলিলেন—"খুলে দাও, সমস্ত দ্বার খুলে দাও, আসবার দ্বার এবং যাবার দ্বার, যাও যাও, ভার্গব, তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনো।"

বিপাশাকে বলিলেন "আজ সময় হয়েছে, আনন্দ করো, জ্বলুক শিখা, বিলম্ব করো না।"

অগ্নিশয্যা জ্বলিয়া উঠিল। সুমিত্রা নিজে মৃত্যু বরণ করিলেন বিক্রমের মধ্যে অমৃতরূপ জাগাইতে। বিক্রম আসিয়া দেখিল বিরোধের সমাধান হইয়াছে। মৃত্যুর ভিতর দিয়া মৃত্যুহীন মিলন ঘটিল। বিক্রম মুঠার মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া সুমিত্রাকে পায় নাই—সুমিত্রাকে পাইলেন যখন নিজের উন্মত্ততা থামিল। সুমিত্রা তাই কুমারকে বলিয়াছিলেন—"আসুন এখানেই, নইলে তাঁর (অর্থাৎ মহারাজ বিক্রমের) মুক্তি কিছুতেই হবে না। আমার এই শেষ কাজ, তাঁকে বাঁচাতে হবে—তাঁর মোহগ্রন্থি ছিন্ন করে দিয়ে চলে যাবো।" সুমিত্রা মহারাজকে বাঁচাইতে গিয়া নিজে অগ্নিশয্যায় ঝাঁপ দিলেন। সুমিত্রার মৃত্যুতে রাজার আসক্তি শেষ হইল, সুমিত্রাকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পাইলেন। কামনা দিয়া, আসক্তি দিয়া সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না—পাওয়া তখনই সার্থক হয় যখন মানুষ নিজেকে জানে, পরকে বুঝিতে পারে এবং দ্বন্দ্বের সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হয়। শুভকামনার যেখানে অভাব সেখানে মিলন বিরোধেরই রূপান্তর মাত্র।

অরূপ রতন

"রাজা" নাটক ১৩১৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। "অরূপ রতন" নাট্য রূপকটি রাজা নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত। যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করিয়া রাজা নাটক রচিত হইয়াছিল তাহারই আভাসে "শাপমোচন" কথিকাটি হইয়াছিল। ১৩২৬ সালে অরূপ রতন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

অরূপ রতনের যিনি রাজা, তিনি নেপথ্যে থাকেন। এই রাজাকে রাজকন্যা সুদর্শনা বরণ করিতে চায়, সেই রাজা সুন্দর, সেই রাজা ভয়ংকর। সুরঙ্গমা সুদর্শনাকে রাজার পরিচয় দিতে গিয়া বলিল—"তাকে বলি তুমি ঝড়, তাকে বলি তুমি দুঃখ, তাকে বলি তুমি মরণ, সব শেষে বলি—তুমি আনন্দ।"

সুদর্শনা রাজাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল—নিজের গর্বে। সুদর্শনা রাজাকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত কিন্তু রাজা লুকাইয়া থাকিতে পারিবেন না, এই বিশ্বাস সুদর্শনার আছে। সুদর্শনার সঙ্গে রাজার প্রথম মিলন হইল অন্ধকারে। সুদর্শনা রাজাকে বরণ করিতে চাহিল, কিন্তু তাহার দ্বিধা উপস্থিত হইল যে, না দেখিয়া কিভাবে বরণ করা সম্ভব হইবে। রাজা নেপথ্যে উত্তর দিলেন—"চোখে দেখতে গেলে ভুল দেখবে—অন্তরে দেখো মন শুদ্ধ করে।" কিন্তু সুদর্শনার মন সায় দিল না। সুদর্শনার বিশ্বাস যে, অন্ধকারে মিলন হইবে না। সে চোখের জগতে রাজাকে দেখিতে চাহিল—কারণ সেইখানেই যে সুদর্শনা বাস করে। কিন্তু এই চোখের জগৎ রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় বড় জিনিস নয়। রাজা নেপথ্যে বলিল—"তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে।"

রাজা জানাইলেন যে, বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে রাজার সঙ্গে সুদর্শনার চোখের দেখা হইবে। রাজা সুদর্শনাকে বলিলেন—"বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসবে সকল লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা করো।"

রবীন্দ্রনাথের বাউল রাজার কথাকে স্পষ্ট করিয়া গানের সুরে প্রচার করিল—

"আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।"

বসন্ত-উৎসবের দিনে সুদর্শনা যাহাকে রাজা বলিয়া ভাবিল সে মিথ্যা-রাজা। সুদর্শনার অহংকার ছিল, তাই সে সত্যিকারের রাজাকে চিনিতে পারিল না। সুরঙ্গমার অহংকার ছিল না, তাই সে সত্যিকারের রাজাকে চিনিত।

সুদর্শনা বুঝিল যে, তার মালা ভুলপথে গিয়াছে। তাই সে বসন্তের গান শুনিয়া বলিল—"তোমাদের এই গান শুনে চোখে জল ভরে আসছে—আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই—তাকে হাতে পাবার দরকার নেই।"

বসন্ত-উৎসবের দিনে চারিদিকে আগুন ধরিল, যে মিথ্যা-রাজা, সে স্বীকার করিল—"আমি ভণ্ড। আমার ছলনা ধূলিসাৎ হোক।" সুদর্শনা আঁতকাইয়া

উঠিল। সুরঙ্গমা আসিয়া বলিল—"রাজা আছেন এই আগুনের মধ্যে। তিনি সোনাকে পুড়িয়ে নেবেন।"

এই আগুনের মধ্যে মিথ্যা ও অহংকার পুড়িয়া গেল। এই আগুনের মধ্যে সুদর্শনা রাজাকে দেখিতে পাইল। সুরঙ্গমা গান ধরিল—

"আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,
ভালবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।"

সুদর্শনার তখনও অহংকারের ঘোর কাটে নাই। সুদর্শনা অভিযোগের সুরে বলিল—"আমাকে জোর করে তিনি ধরে রাখতে পারতেন কিন্তু রাখলেন না। আমাকে বাঁধলেন না—আমি চললুম।"

সুদর্শনা ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল। তবুও তার অভিমান রহিল—"আমি পথে বেরোলুম, সঙ্গে সে এল না।"

সুরঙ্গমা বলিল—"সমস্ত পথ জুড়ে আছেন তিনি।"

সুদর্শনা পথে বাহির হইল বটে, কিন্তু ঘুরিয়া-ফিরিয়া সে এক জায়গায় আসিয়া পড়ে। আকাশ ধূলায় অন্ধকার হইল। সে বুঝিল যে তাহার চারিদিকে যুদ্ধ চলিতেছে। এই ব্যূহ হইতে বাহির হইবার পথ সে জানিতে চাহিল। সুরঙ্গমা বলিল—"তুমি যে কেবল চলে যেতেই চাচ্ছ, ফিরতে চাচ্ছ না, সেইজন্য কোথাও পৌঁছাতে পাচ্ছ না।" সুরঙ্গমা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিল—"আমি বলে রাখছি, যে-পথ তাঁর কাছে না নিয়ে যাবে সে-পথের অন্ত পাব না কোথাও।"

যখন সুদর্শনা তাহার অহংভাব ত্যাগ করিল, তাহার অভিমান বর্জন করিল, তাহার অভিযোগ বন্ধ করিল, নিজেকে নত করিতে শিখিল, তখন রাজার সঙ্গে মিলন হইল। তাই সুদর্শনা বলিতে পারিল—বেঁচেছি, বেঁচেছি, সুরঙ্গমা। হার মেনে তবে বেঁচেছি। আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে—আমিই তার কাছে যাব, এই কথা কোনোমতেই মনকে বলাতে পারছিলুম না।"

তাই সুদর্শনা সানন্দে বলিতে পারিল—"পথে বের করলে তবে ছাড়লে। মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমি এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করিনি। বলব চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি—কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ গর্ব ছাড়ব না।"

সুদর্শনার সঙ্গে রাজার মিলন ঘটিল। অন্ধকার শেষ হইল। সুদর্শনা

রাজাকে পাইল যখন সে দাসীর বেশে সকলের নীচে নিজেকে অবনত করিল। পথের ধূলা সুদর্শনার অঙ্গরাগ হইল সেই অভিসারে। তখন তার মিথ্যা মান ঘুচিয়া গিয়াছে। তাই সুদর্শনা বলিতে পারিল—"আমার প্রমোদ বনে আমার রাণীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম—সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে—তুমি সুন্দর নও, প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।"

সুদর্শনা রাজাকে খুঁজিয়াছিল চোখের-দেখা জগতে। অহংকারের জোরে সে রাজাকে পাইবে ভাবিয়াছিল কিন্তু পাইল না। রূপের মোহে মুগ্ধ হইয়া সুদর্শনা মিথ্যা-রাজার গলায় মালা দিল। তাই চারিদিকে আগুন ধরিল। অন্তরের রাজার সঙ্গে মিথ্যা-রাজার বিরোধ শুরু হইল। সেই আগুনে সুদর্শনার ভিতরে যাহা কিছু মিথ্যা ছিল তাহা পুড়িয়া গেল। সুদর্শনা প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া নিজেকে নত করিয়া রাজার সঙ্গ লাভ করিল। অর্থাৎ প্রলয়ের মধ্যে সৃষ্টির পথ আছে, বিরোধের শেষে মিলন ঘটে, দুঃখের ভিতর দিয়া নিজেকে চেনা যায় এবং সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। প্রলয় ঘটে যখন ভুল জমিয়া ওঠে এবং পাপ সঞ্চিত হয়। এই প্রলয়ের সাহায্যে অন্তর জাগ্রত হয়। তাই দুঃখে, বেদনায় এত সৌন্দর্য, এত আনন্দ। মিলন অসম্পূর্ণ হয়, যখন প্রেম নিজেকে অভিসারের জন্য প্রস্তুত না করে। রবীন্দ্রনাথ অরূপ রতনের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"যে প্রভু কোনো বিশেষরূপে বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে সকল কালে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাহাকে উপলব্ধি করা যায়, এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।"

গৃহ-প্রবেশ

"গৃহ-প্রবেশ" ১৩৩২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইহা "শেষের রাত্রি" গল্পের নাট্য রূপান্তর। কলিকাতা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়োপলক্ষ্যে এই নাটকে অনেক বর্জন ও পরিবর্তন করা হয়। সেই নূতন রূপ মুদ্রিত হয় নাই। গৃহ-প্রবেশ নাটকে আছে যতীন ও মণির মধ্যে বিরোধের কথা। যতীন অর্থের দিক হইতে দেউলিয়া, কিন্তু মনের ঐশ্বর্যে ভরপুর। তার কামনা যে, সে তার স্ত্রীর মনের মধ্যে নিজেকে পাইবে। সে জোর করিয়া কিছু চাহে না। সে অপেক্ষা করিতে সংকোচ বোধ করে না, তবুও নিজের স্বামিত্বের অধিকার খাটাইয়া মণির কাছ

হইতে কিছুই পাইতে চাহে না। সংসারে অনেক মেয়ে আছে যারা দিতে পারে না, অথচ আদায় করিতে চাহে। যতীনের প্রেম আছে বলিয়া সে অপেক্ষা করিতে সম্মত। প্রেমের যে-দিকটাতে আত্মবলিদান আছে, মণি সেই প্রেমে বলবতী নয়। মণি পুতুল—সে আদর চায়। আদর না পাইলে শুকাইয়া যায়, কিন্তু নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া স্বামীকে বরণ করিতে অগ্রসর হইল না।

যতীন অসুস্থ। দিনে দিনে তার আয়ু নিঃশেষ হইতেছে। অথচ সে দিকে মণির দৃষ্টি নাই, মণি মাসিকে বলিল—"মাসি, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। আমি দিন-রাত এই সব রোগের কাজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারব না।"

মাসি আহত হইল। মাসি বুঝিল যে ভগবান মণির বাইরের দিকটা বহু যত্নে গড়িতে গিয়া ভিতরের দিকটা শেষ করিবার সময় পান নাই, অর্থাৎ মণির দেহে রূপ আছে, কিন্তু অন্তরে ঐশ্বর্য নাই। মণি মৃত্যু দেখিলে ভয় পায়, ঔষধের গন্ধ পাইলে তার মন বিষাদে ভরিয়া ওঠে। মণি মাসিকে বলিল—"কেবলি ইচ্ছে করচে, ছাড়া পাই, কোথাও চলে যাই।" মণির এই মেজাজ মাসির কাছে ভাল লাগিল না। তবুও মণি বলিল—"আমাকে তোমাদের বাগানের মালী করে দাওনা—সে আমি ঠিক পারব।"

যতীন বাড়ী আরম্ভ করিয়াছিল অনেক ঘটা করিয়া। কিন্তু বাইরের মহল শেষ হইতে না হইতেই দেউলিয়া হইয়া গেল। ভিতরের মহল আর শেষ হইল না। যতীনের কামনা ও ভাবনা এই বাড়ীর সঙ্গে মিশিয়া আছে। সে ইহাকে সম্পূর্ণ করিবে, এই বাড়ীর নাম "মণি-সৌধ" দিবে এবং গৃহ-প্রবেশের আয়োজনের ভিতর দিয়া মণিকে সে আরও নিকটে পাইবে। এই সব কামনা মিটিল না। তবুও মিটাইবার জন্য প্রাণের কি আকুতি।

মাসি যতীনকে বলিল যে বাড়ীর সব কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। যতীন অসুস্থ, তাই নিজে গিয়া দেখিতে পারে না। মাসির কাছে সংবাদ শুনিয়া খুশী হইল। যতীন মাসিকে বলিল—"আমার কত কালের ঘর বাঁধা সারা হল, আমার কত দিনের স্বপ্ন।"

বাড়ীর বাইরের কাজ শেষ হইয়াছে, অথচ যতীন জানে যে, ভিতরের কাজ শেষ হয় নাই, কোনোকালে শেষ হইবে না। যতীন বাড়ীর নাম দিল মণি-সৌধ। এই সৌধের মধ্যে সুধা আছে—যতীনের মনের সুধা।

যতীনের মনে চলিল নূতন কল্পনা-দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ গৃহ-প্রবেশ। যতীন মণিকে ভালবাসিয়াছিল নিবিড়ভাবে। সে মণির ভাল লাগার ভিতর

দিয়া এই পৃথিবী ভোগ করিতে চাহিল। তাই সে মণিকে মুক্তি দিতে চায়, মণির ভাল-লাগাকে সার্থক করিতে চায়। যতীন একদিন মাসিকে বলিল—"আমি তো বন্দী। অসুখের জাল দিয়ে জড়ানো, দেয়াল দিয়ে ঘেরা—সঙ্গে সঙ্গে মণিকে কেন এমন বেঁধে রাখি?" যতীন মণিকে মুক্তি দিবার জন্য বলিল। যতীন ভাবে যে, মণির স্রোতে নবীন জোয়ার—ঔষধের শিশি আর রুগীর পথ্যের বাঁধ সেই জোয়ারকে বন্ধ করিলে অন্যায় হইবে।

মাসি এই বন্ধনের ভিতর অন্যায় দেখিল না। মাসি বলিল—"কিছু অন্যায় না, একটুও অন্যায় না। যার প্রাণ আছে, সেই তো প্রাণ দিতে পারে।"

মাসি যতীনকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়া বলিত যে, মণি যতীনের জন্য কত পরিশ্রম করে, যতীনের দুঃখে মর্মাহত এবং যতীনকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে জানিলে কাঁদিয়া অস্থির হয়। যতীনের ভাল লাগে। মণি যতীনের জন্য কাঁদে, এই কথা ভাবিতে যতীনের চোখে জল দেখা দেয়। এই আনন্দাশ্রু যতীনের পরম ধন। যতীন মাসিকে একদিন বলিল—"যখন থেকে শুনেছি, মণি কেঁদেছে, তখন থেকেই বুঝেছি, ওর মন জেগেছে।"

কিন্তু মণির মন তখন জাগে নাই। মণির মন জাগে নাই বলিয়াই মাসির বারণ অগ্রাহ্য করিয়া অসুস্থ যতীনের কথা না ভাবিয়া তার মার কাছে মণি চলিয়া গেল। যতীন মণির জন্য অপেক্ষা করিয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। জীবন শেষ হইতেছে বলিয়া যতীনের দুঃখ নাই। মৃত্যু যতীনের কাছে মধুর মনে হইল। যতীন উইল করিয়া মণিকে তার সব সম্পত্তি দিয়া গেল। ব্যাবসায়ের পাকে যতীন সবই হারাইয়াছে। যতীন তাহা জানিয়াও মানিল না। সে তার সম্পত্তি মণিকে দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল। যে-বিশ্বাসে যতীন শক্তিমান সেই বিশ্বাস গর্বের সঙ্গে মাসির কাছে যতীন একদিন বলিল—"যা পাইনি তা নিয়ে কোনোদিন কাড়াকাড়ি করিনি। সমস্ত জীবন হাত জোড় করে অপেক্ষাই করলুম। মিথ্যাকে চাইনি বলেই এত সবুর করতে হলো। সত্য হয়তো এবার দয়া করবেন।"

সত্য দয়া করিল। যতীন মণিকে পাইল মৃত্যুর ভিতর দিয়া। যতীনের জীবন-দীপ নিবিবার আগে মণি যতীনের পায়ের কাছে আসিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। মণির এই আত্ম-সমর্পণ যতীনের জীবনে ঘটিল না। মৃত্যুর ওপারে গিয়া মণির প্রেম অমৃতরূপে যতীনের কাছে পৌঁছিল। যতীনের অপেক্ষা সার্থক হইল। পরিপূর্ণ প্রেমের আবেগে যতীন নিজের জীবন ত্যাগ করিয়া মণির

প্রেম লাভ করিল। প্রেমেতে ত্যাগও আছে, লাভও আছে। তাই যতীন মৃত্যুর পূর্বক্ষণে মাসিকে বলিল—"ঘুমোতে বোলো না, এখনো আমার আর একটু জেগে থাকবার দরকার আছে। শুনতে পাচ্চনা? আসচে। এখনি আসবে। চোখের উপর কিরকম সব ঘোর হয়ে আসচে। গোধূলি লগ্ন, গোধূলি লগ্ন আমার। বাসর ঘরের দরজা খুলবে।"

সেই গোধূলি লগ্নে যতীনের সঙ্গে মণির আবার মিলন হইল। বাসর ঘরের দরজা খুলিল। যতীন মিথ্যাকে চাহে নাই—তাই কাড়াকাড়ি করিয়া মণিকে পাইতে চেষ্টা করে নাই। মণিকে মুক্তি দিয়া তার মনকে জাগাইয়া যতীন মণিকে পাইতে চেষ্টা করিল। মণির আত্ম-সমর্পণ ঘটাইতে যতীনের আত্ম-বিসর্জন করিতে হইল। এই আত্ম-সমর্পণ ও আত্ম-বিসর্জন সম্ভব হয় যখন মন পরিপূর্ণ প্রেমে বলীয়ান হয়।

রবীন্দ্রনাথ নিজে শোকের ভিতর দিয়া জীবন ও মৃত্যুর গভীরতর পরিচয় লাভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"আমি ক্রমে বুঝতে পারলুম, জীবনকে মৃত্যুর জানালার ভিতর থেকে না দেখলে সত্যরূপে দেখা যায় না। মৃত্যুর আকাশে জীবনের যে বিরাট মুক্তরূপ প্রকাশ পায় প্রথমে তা বড়ো দুঃসহ। কিন্তু তারপরে তার ঔদার্য মনকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ অনন্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে হালকা হয়ে দেখা দেয়।"

বিসর্জন

"বিসর্জন" নাটকখানি রবীন্দ্রনাথের ২৮।৩০ বৎসর বয়সের লেখা। ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। এই নাটকের গল্পাংশ "রাজর্ষি" উপন্যাস হইতে গৃহীত। নাটকের পাত্র ও পাত্রীগণের মধ্যে মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য, মহারাণী গুণবতী ও যুবরাজ নক্ষত্ররায় ঐতিহাসিক ব্যক্তি। মুর্শিদাবাদের নবাবের সাহায্যে যুবরাজ নক্ষত্র-রায়ের ছত্রমাণিক্য নামে ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার ও গোবিন্দমাণিক্যের স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ ঐতিহাসিক ঘটনা।

রাজর্ষি রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নলব্ধ গল্প। দেওঘর হইতে ফিরিবার সময় ট্রেনে তিনি যখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, কোন এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—বাবা, এ কি? এ যে রক্ত! বালিকার

পিতা প্রশ্নটাকে কোনমতে চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের ইতিহাস মিশাইয়া রাজর্ষি উপন্যাস লিখিত হইল। গোবিন্দমাণিক্য, নক্ষত্র রায়, রঘুপতি, জয়সিংহ, হাসি ও তাতা—এই কয়জনের কথা রাজর্ষি উপন্যাসে আছে। গুণবতী, অপর্ণা, নয়নরায়, চাঁদপাল বিসর্জন নাটকে নূতন সৃষ্টি। বিসর্জনের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ইংরাজী ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে।

বিসর্জন নাটকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, প্রেমহীন প্রথা সত্য নহে, প্রেমের সাহায্যে সত্যকে লাভ করা যায় এবং নারীর প্রেম মানুষকে সত্যদৃষ্টি দেয়। জয়সিংহ অপর্ণার ভিতরে যে দ্বন্দ্ব, তাদের মধ্যে যে হৃদয়ের বিনিময়, ইহা বিসর্জন নাটককে একটি বিশিষ্ট রূপ দিয়াছে। বাহিরের দিক হইতে দ্বন্দ্ব চলিতেছে গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতির মধ্যে, ভিতরের দিক হইতে সমন্বয়ের চেষ্টা চলিতেছে জয়সিংহ ও অপর্ণার সাহায্যে।

হাসি বালিকা। সে মন্দিরের সোপানে রক্ত দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত রক্ত কেন?" এই প্রশ্ন মহারাজাকে অস্থির করিল। তিনি এই প্রশ্নের সমাধান নিজেই খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তিনি বলিলেন যে, যেখানে প্রেম আছে, সেখানে এই রক্ত, এত ব্যথা ঘটিতে পারে না। মহারাজা আদেশ করিলেন পূজার বলি বন্ধ করিতে। এই আদেশ গোবিন্দমাণিক্যের জীবনে নূতন সংঘাত সৃষ্টি করিল। রাণী গুণবতী সন্তান পাইবার লোভে রঘুপতির কাছে পণ করিলেন—

"এ বৎসর
পূজার বলির পশু আমি নিজে দিব।
করিনু মানৎ, মা যদি সন্তান দেন
বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে একশ মহিষ,
তিন শত ছাগ।"

রঘুপতি মন্দিরের পুরোহিত। সে বলি-নিষেধের আজ্ঞা স্বীকার করিল না। সে ভাবিল, এই আজ্ঞা শাস্ত্রের অপমান, প্রথার অপমান এবং ব্রাহ্মণত্বের অপমান। সে রোষভরে বলিল—

"দেবতা না যদি থাকে ব্রাহ্মণ রয়েছে।
ব্রাহ্মণের রোষযজ্ঞে দণ্ড-সিংহাসন
হবিকাষ্ঠ হবে।"

রঘুপতির মনে সংগ্রাম চলিল যে, কিভাবে এই বলি-নিষেধের আদেশ তিনি ব্যর্থ করিবেন। রাণী গুণবতীর মনে সংগ্রাম চলিল যে, কি করিয়া তিনি তাঁর বলি দিবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন। গোবিন্দমাণিক্যের মনে কোন সংশয় নাই। তিনি জানেন যে, জীবরক্তপাতে দেবী প্রসন্ন হইতে পারেন না। রাণী গুণবতী মহারাজাকে আবেদন জানাইলেন—

"ব্রাহ্মণ ফিরিয়া পাক নিজ অধিকার,
দেবী নিজ পূজা, রাজদণ্ড ফিরে যাক
নিজ অপ্রমত্ত মর্ত্য-অধিকার মাঝে।"

গোবিন্দমাণিক্য অবিচলিতভাবে উত্তর দিলেন—

"ধর্মহানি ব্রাহ্মণের নহে অধিকার।
অসহায় জীবরক্ত নহে জননীর
পূজা। দেবতার আজ্ঞা পালন করিতে
রাজা বিপ্র সকলেরি আছে অধিকার।

দেবতার নামে যারা মনুষ্যত্ব হারায়, গোবিন্দমাণিক্য তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। রাণীর অপ্রসন্নতা, রঘুপতির রোষ, চারিদিকের ষড়যন্ত্র, সমস্ত কিছুই তিনি অগ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি দেবীর পায়ে ভক্তি আনিয়াছেন, হিংসা আনেন নাই। তিনি জানেন—

"এজগতে দুর্বলেরা বড়ো অসহায়
মা জননী, বাহুবল বড়ই নিষ্ঠুর,
স্বার্থ বড়ো ক্রূর, লোভ বড়ো নিদারুণ,
অজ্ঞান একান্ত অন্ধ, গর্ব চলে যায়
অকাতরে ক্ষুদ্রেরে দলিয়া পদতলে।
হেথা স্নেহ প্রেম অতি ক্ষীণবৃন্তে থাকে ;
পলকে খসিয়া পড়ে স্বার্থের পরশে।"

তাই গোবিন্দমাণিক্য রাণী গুণবতীকে বলিতে পারিলেন—

"প্রিয়তমে, আজি শুভদিন মোর।
রাজ্য গেল তোমারে পেলেম ফিরে। এসো
প্রিয়ে, যাই দোঁহে দেবীর মন্দিরে, শুধু
প্রেম নিয়ে, শুধু পুষ্প নিয়ে, মিলনের

অশ্রু নিয়ে, বিদায়ের বিশুদ্ধ বিষাদ
নিয়ে, আজ রক্ত নয়, হিংসা নয়।"

রাণী গুণবতী রঘুপতিকে অনুসরণ করিতে গিয়া মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের মনে অঘাত দিতেও সংকোচ করেন নাই। কিন্তু সেই হিংসার পথে তিনি দেবীকে পাইলেন না, তাঁর পূজা দেওয়া বর্থ হইল—মহারাজার পথে মহারাজাকে খুঁজিতে গেলেন। প্রেমের জোরে গোবিন্দমাণিক্য গুণবতীকে ফিরিয়া পাইলেন। যে-পথে মানুষ মনুষ্যত্ব হারায় সেই পথে প্রেম পাওয়া যায় না।

রাণী গুণবতী চেষ্টা করিযাছিলেন মহারাজাকে হিংসার পথে, পাপের পথে টানিয়া আনিতে। তিনি বিফল হইলেন। অপর্ণা চেষ্টা করিল জয়সিংহকে প্রেমহীন মন্দির হইতে টানিয়া আনিয়া প্রেমপূর্ণ জগতে লইয়া যাইবার জন্য। অপর্ণা জিতিল। প্রথম দিন যখন অপর্ণা জয়সিংহকে দেখিল, সে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল। তাই অপর্ণা বলিল 'এ মন্দির ছেড়ে এসো।' অপর্ণার এই আহ্বান জয়সিংহকে পাগল করিল। কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে, গুরুদক্ষিণা দিবার চেষ্টায় জয়সিংহ রঘুপতিকে ছাড়িতে স্বীকৃত হইল না। তবুও অপর্ণার ডাক কোন দিন ক্ষান্ত হয় নাই—'এ মন্দির ছেড়ে এসো।'

জয়সিংহ একান্ত একা। মন্দিরের দেবীর কাছে সে কিছু পায় নাই, রঘুপতির কাছে প্রাণ ভরিবার কোন সামগ্রী পায় নাই। তাই অপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"জানো কি একেলা কারে বলে ?"

অপর্ণা উত্তর দিল—"জানি। যবে বসে আছি ভরা মনে
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই।"

অপর্ণা লইবার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু রঘুপতির ভয়ে জয়সিংহ দিতে পারিল না। সত্য-মিথ্যার সন্দেহ-জালে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। সে শুধু ইহাই জানে যে, "এ প্রাণ থাকিতে অসম্পূর্ণ নাহি র'বে জননীর পূজা।" জয়সিংহ অপর্ণার ডাক শুনিতে পাইল না—কারণ তাহার কাজ পাড়িয়া আছে, সংগ্রাম করিতে হইবে। জয়সিংহ সংগ্রাম করিবার মাদকতায় মাতিয়া উঠিল। অপর্ণার দিকে তার মন, রঘুপতির দিকে তার কঠিন কর্তব্য। তবু তার সংশয় আসে। জয়সিংহ সংশয়ের দোলায় দুলিতে দুলিতে দেবীকে জিজ্ঞাসা করে—

"প্রেম মিথ্যা,
স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর সব,
সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা ?"

জয়সিংহ স্বপ্নঘোরে বলিল—

"ওই তো সম্মুখে পথ চলেছে সরল—
চলে যাবো ভিক্ষাপাত্র হাতে, সঙ্গে লয়ে—
ভিখারিণী সখী মোর।"

পরক্ষণেই স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া যায়। রঘুপতিকে আশ্বাস দিয়া বলে—

"ভুলি নাই কী করিতে হইবে।"

রঘুপতি কঠিন আদেশ দেয়—"দূর করে দাও ওই বালিকারে মন্দির হইতে।" জয়সিংহ সেই আদেশ দিল—অপর্ণাকে বলিল—"বন্দী আমি সত্য-কারাগারে।"

অপর্ণা শুধু সেই আহ্বান জানাইল—"তুমি চলে এসো জয়সিংহ, এ মন্দির ছেড়ে, দুইজনে চলে যাই।"

অপর্ণা রঘুপতিকে অভিশাপ দিয়া গেল—

"আমি ক্ষুদ্র নারী
অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে, এ বন্ধনে
জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে।"

অপর্ণার অভিশাপ সত্য হইল। জয়সিংহ রঘুপতির কাছে প্রতিজ্ঞা করিল—"আমি এনে দিব রাজরক্ত শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।"

জয়সিংহ নিজের রক্ত দিয়া তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল। জয়সিংহ রাজপুত, পূর্ব-পিতামহ রাজা ছিল, মাতামহ-বংশ রাজত্ব করিতেছে। তার দেহে রাজরক্ত আছে—সেই রাজরক্ত দেবীর চরণে দিল। জয়সিংহের এই ত্যাগ রঘুপতিকে শুদ্ধ করিল। অপর্ণার ডাকের মাহাত্ম্য সে বুঝিতে পারিল। রঘুপতি অপর্ণার ডাক শুনিল—পাষাণ দেবী ছাড়িয়া অমৃতময়ী অপর্ণার ডাকে সাড়া দিয়া নিজেকে বিসর্জন দিয়া অপর্ণাকে পাইল, রঘুপতি জয়সিংহকে পাইল আপনার ভিতর। বিসর্জন নাটকে অপর্ণার প্রেমের জয় ঘোষণা। পরিপূর্ণভাবে পাইতে হইলে প্রেমের পথই একমাত্র পথ। তাই রঘুপতি বলিতে পারিল—"জয়সিংহ নিবায়েছে নিজ রক্ত দিয়ে হিংসা রক্ত-শিখা।" রাণী গুণবতী মহারাজাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে পারিলেন, "আজ দেবী নাই, তুমি মোর একমাত্র রয়েছো দেবতা।" গোবিন্দমাণিক্য গুণবতীকে বলিলেন—"গেছে পাপ। দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া আমার দেবীর মাঝে।

পাষাণ-প্রতিমা ভাঙিয়া গেল—প্রত্যক্ষ প্রতিমা অপর্ণার ভিতর, গুণবতীর ভিতর পরিস্ফুট হইল।

—সমাপ্ত—